তিন গোয়েন্দা
ভলিউম ১০
রকিব হাসান
সেবা
প্রকাশনী
কিশোর থ্রিলার

ভলিউম ১০

তিন গোয়েন্দা

৪০, ৪১, ৪২

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী
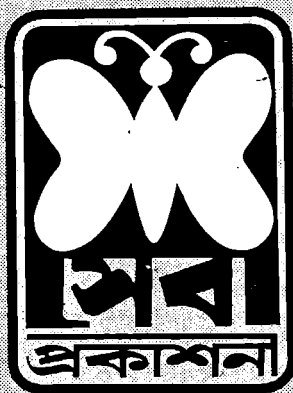
ISBN 984-16-1242-9
প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা), ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯২
রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে
প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
আসাদুজ্জামান
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা), ঢাকা ১০০০
হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা), ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
e-mail: sebaprok@citechco.net
Website: www.Boi-Mela.com
একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা), ঢাকা ১০০০
শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩
Volume-10
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hassan

চুয়ান্ন টাকা
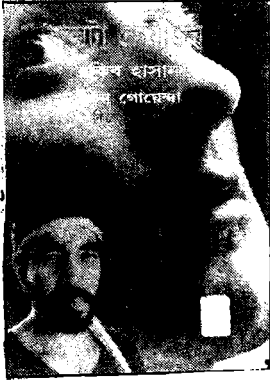
বাক্সটা প্রয়োজন

প্রথম প্রকাশঃ মে, ১৯৯০

'বাবারে!' বলে উঠল রবিন মিলফোর্ড। একেবারে আসল মালয়ী কিরিচ!'

কিশোর পাশা আর মুসা আমানকে জিনিসটা দেখাল সে। চোখ চকচক করছে। বাড়ি থেকে মাইল কয়েক দূরের এক রোড সাইড মিউজিয়মে রয়েছে ওরা। আঙুল দিয়ে কিরিচের ধার পরখ করল মুসা।

বিজ্ঞের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'প্রাচীন আমলে ঈস্ট ইণ্ডিজ থেকে অনেক জাহাজ আসত ক্যালিফোর্নিয়ায়,' বলল সে। 'এই মিউজিয়মের বহু জিনিস এসেছে প্রাচ্য থেকে।' নীরবে তার লেকচার শুনতে লাগল দুই সহকারী।

'এই, কি বকবক শুরু করেছিস ওখানে?' ঘরের আরেক প্রান্ত থেকে ধমক লাগালেন মেরিচাচী। 'সুযোগ পেলেই বক্তৃতা...আয়, এখানে আয়। ট্রাকে মাল তুলতে হবে না?'

'আসছি,' বলে দুই সহকারীর মুচকি হাসি উপেক্ষা করে এগিয়ে গেল কিশোর।

বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে মিউজিয়মটা। জিনিসপত্র সব বিক্রি করে দিচ্ছে। সেগুলোই কিনতে এসেছেন মেরিচাচী। সাহায্য করার জন্যে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন তিন গোয়েন্দাকে। বড়দিনের ছুটির এই প্রথম দিনেই এরকম বিপদে পড়বে, ভাবতে পারেনি ওরা। তাহলে দূরে দূরে থাকত। অন্তত সকালবেলাটা মেরিচাচীর সামনে না পড়লেই চলত।

কি আর করবে? দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাজে হাত লাগাল ওরা। এক এক করে জিনিস বয়ে নিয়ে গিয়ে দিতে লাগল ইয়ার্ডের কর্মচারী, বিশালদেহী ব্যাভারিয়ান বোরিসকে। সে ওগুলো ট্রাকে তুলতে লাগল। ছেলেদের মনের অবস্থা বুঝে আপন-মনেই হাসল সে, মৃদু শিস দিতে শুরু করল।

জিনিসপত্র বুঝে নিতে গেলেন মেরিচাচী, মিউজিয়মের মালিক মিস্টার ব্যানারের কাছে।

ওখানকার কাজ শেষ করে আবার আগের জায়গায় ফিরে এলেন মেরিচাচী,

ছেলেদের কাজ তদারক করতে। কয়েকটা বাক্স বাঁধায় হাত লাগালেন। মিস্টার ব্যানার গেলেন সামনের হলে, একজন লোকের সঙ্গে কথা বলার জন্যে, এইমাত্র এসেছে লোকটা।

খানিক পরেই মেরিচাচী আর ছেলেদের কানে এল একটা উত্তেজিত কণ্ঠ, 'কাকে কি কথা দিয়েছেন সে-পরোয়া আমি থোড়াই করি!'

শান্তকণ্ঠে বললেন মিস্টার ব্যানার, 'দেখুন···।'

তাকে কথা শেষ করতে দিল না লোকটা। 'দেখাদেখির কিছু নেই! ওটা এখুনি চাই আমার।'

মিউজিয়মের জিনিস নিয়েই কথা কাটাকাটি হচ্ছে, বুঝতে পারলেন মেরিচাচী। তাড়াতাড়ি এগোলেন হলের দিকে। পেছনে চলল তিন গোয়েন্দা।

ব্যানার বলছেন, 'সরি, মিস্টার, সব বিক্রি হয়ে গেছে। এখন আর কিছু করার নেই।'

সেগুন কাঠের একটা বাক্সের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। তামার কারুকাজ করা বাক্স। ওটার অন্যপাশে দাঁড়িয়ে আছে খাটো একজন মানুষ। মুখে কালো চাপদাড়ি। রোদেপোড়া কুঁচকানো চামড়া। কোটরে বসা ঘন কালো চোখ। গালে দুটো গভীর কাটা দাগ ঢুকে গেছে দাড়ির ভেতরে। পোশাক দেখে অনুমান করতে কষ্ট হয় না, লোকটা সদাগরী জাহাজের নাবিক।

জ্বলন্ত চোখে মিস্টার ব্যানারের দিকে চেয়ে প্রায় গর্জে উঠল সে, 'দেখুন, এই বাক্স আমার। আমি এটা ফেরত চাই। হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি···'

ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল মিউজিয়ম-মালিকের। 'শুনুন মিস্টার, আমি···।'

'মিস্টার মিস্টার করছেন কেন? আমার একটা নাম আছে। টিক বানাউ। লোকে নাম রেখেছে পানির পোকা,' লোকটা জানাল গর্বের সঙ্গেই। 'অনেক পথ বয়ে এনেছি ওই বাক্স। ওটাতে বিপদ আছে, বুঝেছেন, বিপদ,' ছেলেদের দিকে চোখ পড়তে বিড়বিড় করে কি বলল টিক, কে জানে, বোধহয় গালই দিল। ধমকে উঠল, 'এই, তোমাদের এখানে কি? সর, যাও, ভাগ। এই বেটি, তুমিও যাও?'

চট করে মেরিচাচীর দিকে তাকাল একবার কিশোর। হাসি চাপতে কষ্ট হল।

রাগে টকটকে লাল হয়ে গেল মেরিচাচীর মুখ। 'কি, দাড়িওলা ছাগল!' ভদ্রতা ভুলে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। 'আমি বেটি, না! দেখাচ্ছি মজা! এই কিশোর, বোরিসকে ডাক তো···!' কথা আটকে গেল তাঁর।

মহিলা এত রেগে যাবেন, কল্পনাও করেনি নাবিক। তাছাড়া কাজের পোশাক পরে এসেছেন মেরিচাচী, টিক মনে করেছে, কাজের লোক—টোকই হবে। এখন বুঝল, ভুল করে ফেলেছে।

'ভুল করেছেন আপনি, মিস্টার পানির পোকা,' লোকটার ব্যবহারে ব্যানারও রেগেছেন। 'একজন ভদ্রমহিলাকে অপমান করেছেন। জানেন উনি কে? রকি বীচের সব চেয়ে বড় স্যালভিজ ইয়ার্ডের মালিক। এখানকার সমস্ত জিনিসপত্র, ওই বাক্স, সবই কিনেছেন।'

চোখ মিটমিট করল নাবিক। 'আমি···আমি দুঃখিত, ম্যাডাম। মেজাজ ঠিক রাখতে পারিনি। পানিতে পানিতে থাকি তো, ভদ্রতা আর কোথায় শিখব, বলুন? তাছাড়া অনেক দিন ধরে এই বাক্সটা খুঁজছি, আজ হঠাৎ পেয়ে গিয়ে মাথার ঠিক ছিল না।'

লোকটা নরম হয়ে মাপ চাইতে মেরিচাচীও লজ্জিত হলেন। ছেলেরা বাক্সটা ঘিরে দাঁড়িয়েছে। হাত বুলিয়ে দেখছে। বললেন, 'এটা আপনার হলে এখানে এল কিভাবে?'

'চুরি গিয়েছিল, ম্যাডাম। এক হারামজাদা চুরি করেছিল আমার জাহাজ থেকে। হপ্তা দুই আগে স্যান ফ্র্যান্সিসকোয় ভিড়েছিল, তখন। নিয়ে গিয়ে বেচে দেয় সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মাল বেচে ওরকম এক দোকানির কাছে। দোকানি সোজা পাঠিয়ে দিয়েছে এখানে। খোঁজ করতে করতে আমিও চলে এসেছি।'

'কিন্তু···।'

মেরিচাচীর কথার মাঝখানে বলে উঠল রবিন, 'এই নামটা কার?' ডালা তুলে ফেলেছে ওরা। ভেতরের দিকে লেখা 'লিটল মারমেইড' নামটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার জাহাজের, মিস্টার বানাউ?'

'না, খোকা,' টিক বলল। 'অনেক পুরানো বাক্স এটা। আমার হাতে পড়ার আগে কম করে হলেও পঞ্চাশ জনের হাত ঘুরে এসেছে। সিঙ্গাপুরে যখন বাক্সটা কিনলাম, তখনই ওই নাম দেখেছি।'

ব্যানার জানালেন, 'গতকাল পেয়েছি এটা, মিসেস পাশা। মরিস ডিলম্যানকে বলে রেখেছিলাম, মিউজিয়মে রাখার মত জিনিস পেলেই যেন পাঠায়। পাঠিয়ে দিয়েছে। ব্যবসা যে ছেড়ে দিচ্ছি, একথা আর জানানো হয়নি ওকে।'

'ন্যায্য দাম দিতে রাজি আছি আমি,' টিক বানাউ বলল।

'বেশ,' বললেন মেরিচাচী। 'ধরে নিলাম, জিনিসটা আপনার। মিস্টার ব্যানার কিনেছেন, তারপর আমার কাছে···।'

কথা শেষ করতে পারলেন না এবারেও।

বিচিত্র খড়খড় শব্দ হল।

'কী···?' বলতে গিয়ে থেমে গেল রবিন।

কট করে আরেকটা শব্দ হয়েছে।

ঝিক করে উঠল জিনিসটা। ডালার ওপর ঝুঁকে ছিল কিশোর, তার কানের পাশ দিয়ে শাঁ করে গিয়ে দেয়ালে বিঁধল একটা ছুরি।

দুই

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত পাথর হয়ে রইল যেন সবাই। দেয়ালে থিরথির করে কাঁপছে ছুরির হাতল।

কিশোরের কাছে ছুটে গেলেন মেরিচাচী। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রায় ককিয়ে উঠলেন, 'এই, লাগেনি তো কোথাও! কিশোর?'

মাথা নাড়ল কিশোর। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না যেন, ধপ করে গিয়ে বসে পড়ল একটা পুরানো বেঞ্চে। বড় বাঁচা বেঁচেছে। অল্পের জন্যে চোখে লাগেনি ছুরিটা।

'কে ছুঁড়ল?' পাগলের মত এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন ব্যানার।

'আ-আমার দিকে তাকাচ্ছেন কেন?' এক পা পিছিয়ে গেল টিক।

'কে-কে-কেউ ছুঁড়েনি!' তোতলাতে শুরু করল রবিন। 'বাক্স থেকে বেরিয়েছে।'

কাছে এসে ভেতরে তাকালেন ব্যানার। 'গঅড! ভেতরে গোপন খোপ···খুলে গেছে! নিশ্চয় কোথাও হাত দিয়ে ফেলেছিলে,' রবিনকে বলল। 'কোন গোপন সুইচ-টুইচে।'

'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়,' বলল রবিন। 'গোপন খোপেই ছিল ছুরিটা। খোপের ঢাকনা খুলতেই স্প্রিং ছুটে গেছে। বুবি ট্র্যাপ!'

'খাইছে!' মুসা বলল। 'খোপ যে খুলবে···।'

শাসানোর ভঙ্গিতে টিক বানাউয়ের দিকে এগোলেন মেরিচাচী। 'যদি এটা আপনার কাজ হয়ে থাকে···।'

'বুবি ট্র্যাপ কাকে বলে তা-ই জানি না আমি!' আবার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল নাবিকের।

'না, আপনি করেননি একাজ!' কিশোর বলল। মুখে রঙ ফিরতে শুরু করেছে ওর। উঠে গিয়ে দেয়াল থেকে খুলে নিল ছুরিটা। 'প্রাচ্যের জিনিস এটা। যতদূর মনে হয়, পূর্ব ভারতীয়। বাজি রেখে বলতে পারি, শত বছর আগে ওই ফাঁদ পেতে রেখেছিল কোন জলদস্যু!'

'খাইছে!'

'জলদস্যু?' রবিন বলল।

কিশোরের চোখ চকচক করছে। ছুরিটা নিয়ে বাক্সের কাছে ফিরে এল সে। গোপন খোপটা পরীক্ষা করতে লাগল। মাথা ঝাঁকাল সন্তুষ্ট হয়ে। 'বললাম না? স্প্রিং, হুড়কো, সব হাতে বানানো। মরচে পড়েছে। অনেক পুরানো। দামি জিনিস চোর-ডাকাতের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে এরকম ফাঁদ পাতা হত সেকালে। জাভা আর মালয়ের জলদস্যুরা এসব কাজে ওস্তাদ ছিল।'

সবার চোখ ঘুরে গেল টিক বানাউয়ের দিকে।

'না-না-না,' তাড়াতাড়ি দু'হাত নাড়ল পানির পোকা। 'আমি ওসব দেশের লোক নই। তবে জাভায় ছিলাম অনেকদিন। কোন জলদস্যুর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।'

গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'জাভা জায়গাটা যে কোথায়, তা-ই আমি জানি না।'

'ইন্দোনেশিয়ার একটা বড় দ্বীপ,' বলল কিশোর। 'কাছাকাছি আরও দ্বীপ আছে। সুমাত্রা, নিউ গিনি, বোর্নিও, সেলিবিস, এবং আরও হাজারও ছোট-বড় দ্বীপ। এখন ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন, কিন্তু আগে ওলন্দাজ কলোনি ছিল ওখানে। ছোট ছোট শত শত রাজ্য ছিল, ওগুলোকে বলা হত সালতানাত, শাসনকারীদের বলা হত সুলতান। বেশির ভাগই ডাকাত ছিল ওরা।'

'ব্ল্যাকবিয়ার্ডের মত?' জানতে চাইল মুসা। 'পাল তোলা জাহাজ, ভারি কামান, কালো পতাকায় মানুষের খুলি আর হাড়ের ছবি...'

'না, ঠিক ওরকম নয়। এসব ছিল পশ্চিমা জলদস্যুদের নিশানা। ব্ল্যাকবিয়ার্ড ছিল ইংরেজ। ঈস্ট ইনডিয়ান জলদস্যুদের বড় জাহাজ ছিল না, জলি রজার পতাকা ছিল না, কামানও ছিল খুব কম। ছোট দ্বীপগুলোতে থাকত ওরা। ইউরোপিয়ান কিংবা আমেরিকান জাহাজ দেখলেই তেড়ে এসে চড়াও হত।

'পশ্চিমা জাহাজগুলো তখন ওসব অঞ্চলে যেত মশলা, টিন, চা আর চীন থেকে সিল্ক আনার জন্যে। নানারকম চমকপ্রদ জিনিস নিয়ে যেত ব্যবসা করার জন্যে, আর নিত ব্যাগভর্তি সোনা-রূপা। অস্ত্রশস্ত্রও নিত। সেসব ছিনিয়ে নেয়ার জন্যেই হামলা চালাত জলদস্যুরা। তবে সব সময়ই হেরে আসত না পশ্চিমারা। পাল্টা হামলা চালাত। অনেক সময় তো ঘরে ঢুকে গিয়ে শেষ করে দিয়ে আসত জলদস্যুদের।'

'তারমানে এদেশীরাও কম ডাকাত ছিল না,' হেসে বলল রবিন। 'তো, তোমার কি ধারণা? ওই অঞ্চল থেকেই এসেছে এই বুবি ট্র্যাপ?'

'ধারণা নয়, আমি শিওর,' চিন্তিত ভঙ্গিতে গাল চুলকাল কিশোর। 'শোনা যায়, এখনও নাকি কিছু জলদস্যু আছে কোন কোন দ্বীপে।'

'কিশোর, দেখ!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। বাক্সের ভেতর ছোট একটা জিনিস

পেয়ে তুলে দেখাল, 'আঙটি! খোপটাতে ছিল।'

'আর কিছু আছে?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

ঠেলে মুসাকে সরিয়ে বাক্সের ওপর ঝুঁকল টিক। 'দেখি তো। ঘোড়ার ডিম আর কিচ্ছু নেই।'

মুসার হাত থেকে আঙটিটা নিল কিশোর। নিখুঁত, সূক্ষ্ম খোদাই। সোনারং হতে পারে, কিংবা তামার, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মাঝখানে লাল একটা পাথর বসানো।

'খাঁটি, কিশোর?' মুসা জানতে চাইল।

'বুঝতে পারছি না। হতে পারে। খাঁটি সোনার অলঙ্কার যেমন পরত ওখানকার লোকে, মেকিও পরত। সোনার রঙ করা, কিন্তু সোনা নয়। ওসব দিয়ে ইউরোপিয়ানরাই বেশি ঠকাত দেশী লোকদের।'

আঙটির জন্যে হাত বাড়াল টিক। 'আসলই হোক আর নকলই হোক, ওটা আমার জিনিস, খোকা। বাক্সটা যেহেতু আমার, ভেতরের সব কিছুই আমার। দাম বল। আমার বাক্স আমি নিয়ে যাই।'

'দেখি আগে, কি কি আছে,' মেরিচাচী বললেন। 'তারপর বলছি...'

বাধা দিল কিশোর, 'চাচী, বাক্সটা কার, কিভাবে জানছি আমরা। নাম তো আর লেখা নেই। ওরকম গপ্পো যে-কেউ এসে শোনাতে পারে।'

'আমাকে মিথ্যুক বলছ, ছেলে?' খেপা ষাঁড়ের মত গোঁ গোঁ করে উঠল টিক।

'বেশ, প্রমাণ করুন যে আপনি সত্যি বলছেন। কাগজ-টাগজ দেখান। কার কাছ থেকে কিনেছেন, লিখিত আছে? নইলে এমন কাউকে গিয়ে নিয়ে আসুন, যে সাক্ষী দেবে এটা আপনার। বলবে, জাহাজে আপনার কাছে ছিল।'

'সবাই বলবে। আমার সঙ্গে যেসব নাবিক আছে, সব্বাই। এখন আমার জিনিস...'

'ঠিক আছে,' কিশোর বলল। 'বাক্সটা আমরা রেখে দেব। কারও কাছে বেচব না। আপনি গিয়ে লোক নিয়ে আসুন। এক হপ্তা রেখে দেব আমরা। বাক্স ছাড়া ওই কটা দিন নিশ্চয় আপনার অসুবিধে হবে না?'

'হ্যাঁ, ভাল কথা বলেছ,' মিস্টার ব্যানার বললেন।

টিক বানাউয়ের চোখ জ্বলছে। 'যথেষ্ট হয়েছে। এত ভাল কথা লাগবে না আমার। যা দরকার, সেটা নিয়ে তবেই যাব এখান থেকে, কেউ ঠেকাতে পারবে না।' কিশোরের দিকে এগোল। 'দাও দিখি আঙটিটা।'

দরজার দিকে পিছাতে শুরু করল কিশোর।

'এই, শুনুন,' বাধা দিতে চাইলেন মেরিচাচী।

'চুপ!' বলে তাকে থামিয়ে দিল নাবিক।

বিশাল ছায়া পড়ল দরজায়। ঘরে ঢুকল ব্যাভারিয়ান। 'এই, কাকে ধমক দিলে?' শান্তকণ্ঠে বলল সে। 'ম্যাডামকে? যাও, পায়ে ধরে মাপ চাও।'

'জোর করে বাক্সটা নিয়ে যেতে চাইছে!' চেঁচিয়ে জানাল রবিন।

'তাই নাকি?'

'ধরুন ওকে, বোরিস ভাই,' কিশোর বলল।

'ধরছি।'

বোরিসকে দেখেই থমকে গিয়েছিল টিক। এগোতে দেখে মিস্টার ব্যানারের আড়ালে চলে গেল। শেষে বিপদ বুঝে এক ধাক্কায় মিউজিয়ম-মালিককে বোরিসের গায়ের ওপর ফেলে দরজার দিকে দিল দৌড়।

'ধরুন, ধরুন!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

চিত হয়ে পড়ে গেছে বোরিস। তার গায়ের ওপর পড়েছেন বেচারা ব্যানার। জট ছাড়িয়ে দু'জনে যখন উঠে দাঁড়াল, বেরিয়ে গেছে টিক। মিউজিয়মের পেছনে গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ হল। ছুটে বাইরে বেরোল ছেলেরা। দেখল, ধুলো উড়িয়ে চলে যাচ্ছে একটা গাড়ি। কোস্ট হাইওয়ে ধরে ছুটে হারিয়ে গেল পাহাড়ের মোড়ে।

'ঝামেলা গেল,' হাত ঝাড়লেন মেরিচাচী। 'কাজ সেরে ফেলা দরকার। দাঁড়িয়ে থেক না। মালগুলো তুলে ফেল।'

'বুঝতে পারছি না,' রবিন বলল। 'বাক্সটার কী প্রয়োজন তার? এত আগ্রহ কেন?'

'সুন্দর দেখেছে তো,' মেরিচাচী বললেন। 'ফাঁকি দিয়ে নিতে চেয়েছিল আরকি। যাও যাও, কাজ সেরে ফেল। একবারে শেষ হবে না মাল, আবার আসতে হবে।'

ঘন্টাখানেক পর মালের ছোটখাটো একটা পাহাড় তৈরি হল ট্রাকের পেছনে। সামনে উঠে বসলেন মেরিচাচী আর বোরিস। পেছনে ছেলেদেরকে উঠতে সাহায্য করলেন ব্যানার।

'মিস্টার ব্যানার,' ভুরু কুঁচকে রেখেছে কিশোর। 'আপনি বললেন স্যান ফ্র্যান্সিসকোর মরিস ডিলম্যান বাক্সটা পাঠিয়েছে আপনার কাছে?'

'হ্যাঁ। স্থানীয় লোকের আগ্রহ রয়েছে জাহাজটার ওপর। একশো বছর আগে রকি বীচের কাছেই ডুবেছিল লিটল মারমেইড। মাঝে মাঝেই ওটার জিনিসপত্র বেরিয়ে আসে লোকের হাতে, আমার সামনে পড়লে কিনি···মানে, কিনতাম। এখন আর কিনব না।'

'নিশ্চয়। এখন আর কি দরকার,' কিশোর বলল। 'হ্যাঁ, একশো নয়, কিছু

কম। আঠারশো চুরানব্বই সালে ডুবেছিল জাহাজটা।'

ছুটে চলেছে ট্রাক। ভাবনায় ডুবে আছে কিশোর। রবিন আর কিশোর কথা বলছে, দু'পাশের দৃশ্য দেখছে।

ইয়ার্ডে পৌঁছল ট্রাক।

মুসা বলল, 'কিশোর, ফলো করা হয়েছে আমাদের। সবুজ একটা ফোক্স-ওয়াগেন। সারা পথ পিছে পিছে এসেছে।'

লাফিয়ে ট্রাক থেকে নামল তিন গোয়েন্দা। ছুটে গেল গেটের কাছে। পথের পাশে দাঁড়িয়ে আছে সবুজ ফোক্সওয়াগেন। কিন্তু ভেতরে কে আছে, ছেলেরা সেটা দেখার আগেই স্টার্ট নিয়ে টায়ারের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ তুলে পথে উঠল গাড়ি, মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল।

'খাইছে! টিক বানাউ?'

'হতে পারে,' কিশোর বলল। 'কিন্তু মিউজিয়ম থেকে তো উল্টোদিকে গিয়েছিল সে, এদিকে নয়। আমাদের পিছু নিল কিভাবে?'

'বাক্সটার ব্যাপারে আরও আগ্রহী লোক আছে হয়ত,' রবিন বলল।

'কিংবা হয়ত লিটল মারমেইডের ধ্বংসাবশেষের ব্যাপারে আগ্রহী।' রহস্যের গন্ধ পেয়েছে কিশোর পাশা, উত্তেজনায় ফেটে পড়বে যেন। 'তিন গোয়েন্দার জন্যে আরেকটা কেস। আমরা এখন…'

'তোরা এখনও এখানে?' পেছন থেকে ওদেরকে চমকে দিলেন মেরিচাচী। ট্রাকের মাল নামাবি কখন? জলদি কর, জলদি কর।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে গিয়ে মাল নামানোয় হাত লাগাল ছেলেরা। পুরানো বাক্সের রহস্য সমাধান আপাতত বাদ।

তিন

মাল নামাতে নামাতে দুপুর। তদারকি রেখে যেতে পারছিলেন না মেরিচাচী, নামানো শেষ হলে রান্নাঘরে চললেন খাবার তৈরি করতে। এই সুযোগে ছেলেরা ফিরে এল পুরানো বাক্সের কাছে।

'হেডকোয়ার্টারে নিয়ে পরীক্ষা করতে হবে,' কিশোর বলল। 'তোমরা দু'জনে আন। আমি যাই, কাজ আছে।' কাউকে প্রতিবাদ করার সুযোগ না দিয়ে ছুটে চলে গেল সে।

ভারি বাক্সটার কাছে দাঁড়িয়ে আনমনে মাথা নাড়ল মুসা। তারপর ফুসফুসে চেপে রাখা বাতাস ছেড়ে ঝুঁকল বাক্সটা তোলার জন্যে।

কোনমতে বাক্সটা বয়ে এনে তিন গোয়েন্দার ব্যক্তিগত ওয়ার্কশপের কোণে ধপ করে নামিয়ে রাখল দু'জনে।

'দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে ঢুকবে না,' মোটা পাইপটার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল মুসা।

'হুঁ,' মাথা দোলাল রবিন। 'সব আমাদের মাপের। বড় কিছু হলেই আর ঢোকানো যায় না।'

সমস্যাটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে দু'জনে, এই সময় দুই সুড়ঙ্গের মুখ দিয়ে বেরোল কিশোর।

'হুমম্!' পাইপের মুখের দিকে একবার, আরেকবার বাক্সটার দিকে তাকাচ্ছে গোয়েন্দাপ্রধান। 'সহজ তিন দিয়ে ঢুকতে পারে, কি বল?'

ট্রেলারে, অর্থাৎ হেডকোয়ার্টারে ঢোকার সব চেয়ে সহজ পথ হল সহজ তিন। ফ্রেম সহ একটা ওক কাঠের দরজা রয়েছে জঞ্জালের ভেতর। মরচে ধরা চাবি লুকানো থাকে একটা খোলে। সেটা দিয়ে দরজার পুরানো তালা খুললেই বেরিয়ে পড়ে সরু গলিপথ। পথটা চলে গেছে ট্রেলারের মূল দরজা অবধি।

'চেষ্টা করার আগে,' রবিন প্রস্তাব দিল। 'ট্রেলারের দরজার মাপ নেয়া দরকার।'

'হ্যাঁ,' কিশোর বলল। 'ও, একটা কথা, সমস্তটাই টিক বানাউয়ের বানানো গপ্পো, বুঝে ফেলেছি আমি।'

'বুঝে ফেলেছ!' মুসা অবাক। 'কি করে বুঝলে?'

'মরিস ডিলম্যানের দোকানে ফোন করেছিলাম। কোন নাবিকের কাছ থেকে বাক্সটা কেনেনি সে। কিনেছে সান্তা বারবারার আরেক সেকেণ্ডহ্যাণ্ড দোকান থেকে। সেই দোকানদার কিনেছে ছয় মাস আগে এক মহিলার কাছ থেকে।'

'খাইছে! টিক ব্যাটা তো তাহলে নাবিকও নয়, নাকি?'

'না হলে অবাক হব না। নাবিকের ওরকম পুরানো পোশাক জোগাড় করা মোটেই কঠিন নয়। হয়ত ওসব পরে এসে আমাদের ধোঁকা দিতে চেয়েছে। কাঁচা কাজ। এত ভারি পোশাক পরার মত শীত নয় এখন।'

'টিক কল্পনাও করেনি, আমাদের সঙ্গে তার টক্কর লাগবে,' রবিন বলল।

'না, তা করেনি,' স্বীকার করল কিশোর। 'যাই হোক, একটা কথা ঠিক বলেছে টিক। গতকাল ডিলম্যানের দোকানে গিয়েছিল সে। আরেকটা গল্প শুনিয়েছে। বলেছে, তার বোন বাক্সটা বিক্রি করে দিয়েছে। সে তখন বাড়ি ছিল না। ফিরে এসে জেনেছে। এখন বাক্সটা ফেরত চায়।'

'গল্প বদলাল কেন?' মুসার প্রশ্ন।

'হয়ত ভেবেছে, তার নাবিকের গল্প শুনে গলে যাব আমরা, বাক্সটা দিয়ে দেব তাড়াতাড়ি। বাক্সটা কেন চায়, সেকথা গোপন রাখতে চেয়েছে সবার কাছেই। তবে, ডিলম্যানের কাছে বলা তার গল্প একটা জিনিস বোধহয় প্রমাণ করে, যে মহিলা ছয় মাস আগে বাক্সটা বিক্রি করেছে, তাকে চেনে টিক। হয়ত বাক্স বিক্রির কথা জেনেছে ইদানীং, বেশিদিন হয়নি। আগে জানলে আগেই খোঁজ করত ওটার।'

'তাই তো! আচ্ছা, একটা কথা বল, এত চাইছে কেন বাক্সটা? খালি বাক্স, তেমন কিছু তো নেই।'

'শুধু আঙটিটা ছাড়া,' মুসা বলল। 'তা-ও, এটাও মনে হয় তেমন দামি নয়।'

'আর আঙটিটার কথা টিক বানাউ জানত কিনা, সন্দেহ আছে,' রবিন যোগ করল।

'বাক্সে মূল্যবান কিছু আছে ভেবেছে হয়ত।'

'কিংবা হতে পারে,' কিশোর বলল। 'লিটল মারমেইড থেকে এসেছে বলেই বাক্সটা দামি। হোক না ভাঙা জাহাজের বাক্স।'

'তোমার কি মনে হয়? জাহাজটার ব্যাপারে সে আগ্রহী?' রবিন বলল। 'ওটাতেই কিছু আছে?'

'কি জানি। শোন, আঙটি আর ছুরিটা ছাড়া তো আর কিছু নেই বাক্সটায়। তার পরেও কেন ওটা চাইছে, জানতে হলে, আমার মনে হয় লিটল মারমেইডের ইতিহাস জানা দরকার।'

'হিসটোরিক্যাল সোসাইটির কিছু জানা থাকতে পারে,' রবিন বলল।

মুসার মন খারাপ হয়ে গেল। 'কিন্তু আমি যেতে পারব না। মা'র সঙ্গে বাজারে যেতে হবে। ওখান থেকে ফিরে বাড়িতে কাজ করতে হবে, বাবা বলে দিয়েছে।'

'আর, আমাকে আবার যেতে হবে মিউজিয়মে,' বলল কিশোর। 'রবিন, তোমাকে একাই যেতে হচ্ছে।'

'যেতে হলে যাব। আমার অসুবিধে নেই,' রবিন জানাল। লাইব্রেরিতে ঢুকে বই পড়া আর গবেষণামূলক কাজে আনন্দই পায় সে।

খানিক পরেই মেরিচাচীর ডাক শোনা গেল। খাবারের জন্যে ডাকছেন।

সাইকেলে করে রকি বীচ হিসটোরিক্যাল সোসাইটিতে পৌছুতে তিনটের ওপরে বেজে গেল। ভেতরে ঢুকতে ধূসর-চুল এক মহিলা মুখ তুলে তাকিয়ে হাসলেন রবিনের দিকে চেয়ে।

কি জানতে চায়, জানাল রবিন।

'লিটল মারমেইড?' মহিলা বললেন। 'নিশ্চয় শুনেছি। এক সময় বেশ আলোড়ন তুলেছিল জাহাজটা। গুজব রয়েছে, গুপ্তধন নাকি আছে ওটাতে।'

'গুপ্তধন?'

'সোনার মোহর, অলঙ্কার, এসব,' হাসলেন মহিলা। 'লিটল মারমেইডে পাওয়া কিছু জিনিস আছে আমাদের কাছে। দেখবে?'

অবশ্যই দেখবে, জানাল রবিন। উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। কব্জা লাগানো একটা ফাইল বক্স বের করলেন মহিলা।

বাক্সটা নিয়ে প্রায় দৌড়ে এসে পড়ার ঘরে ঢুকল রবিন। সে একা, আর কেউ নেই ওখানে। লম্বা টেবিলের সামনে বসে বাক্সটা খুলল।

ভেতরের জিনিস দেখে অবাক হল সে। কাগজ, পুস্তিকা, ছোট বই, খবরের কাগজের কাটিং, ম্যাগাজিনের আর্টিক্যাল গাদাগাদি করে রাখা। অগোছাল, একটা কাগজ তুলতে যাবে, এই সময় ঘাড়ের ওপরে কথা শোনা গেল, 'পড়তে সারাদিন লেগে যাবে।'

চমকে ফিরে তাকিয়ে রবিন দেখল, ছোটখাটো একজন মানুষ। পরনে পুরানো ফ্যাশনের কালো সুট, ওয়েস্টকোট, আর সোনার চেনওয়ালা ঘড়ি। গোলগাল লাল চেহারা, চোখে রিমলেস চশমা।

'আমি হিস্টোরিক্যাল সোসাইটির প্রফেসর হারম্যান কেইন,' জানালেন তিনি। 'মিসেস ডেভিড তোমার আগ্রহের কথা বলল। লোকের, বিশেষ করে তোমার মত কমবয়েসীদের কৌতূহল মেটাতে ভালবাসি আমরা। আমাকে প্রশ্ন করতে পার। হয়ত পড়ার ঝামেলা থেকে বাঁচবে।'

'লিটল মারমেইডের কথা কিছু জানেন, স্যার?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'নিশ্চয় জানি। আমি এখানে এসেছি, বেশিদিন হয়নি। তবে আমার এক সহকর্মী ওই জাহাজটার ওপর একটা পুস্তিকা লিখেছে। সেটা পড়েই জেনেছি। কি কি জানতে চাও তুমি, বল তো?'

'আমি জানি, লিটল মারমেইড একটা স্কয়ার-রিগার জাতের বড়সড় জাহাজ,' রবিন বলল। 'আঠারশো চুরানব্বইয়ে ডুবেছিল রকি বীচের কাছে। গুজব আছে, গুপ্তধন পাওয়া যাবে জাহাজটাতে। ঠিক?'

হাসলেন প্রফেসর। 'আগের দিনে যত জাহাজ ডুবেছে, খোঁজ করলে জানবে, সবগুলোতেই গুপ্তধন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, মানে গুজব রয়েছে। তবে সময়টা ঠিকই জান।' রবিনের পাশের চেয়ারে বসলেন তিনি। 'তিন মাস্তুলের জাহাজ লিটল মারমেইড। স্কটল্যাণ্ডের গ্লাসগো থেকে ঈস্ট ইণ্ডিজে গিয়ে মশলা আর টিনের ব্যবসা করত। ব্যবসার জন্যেই এসেছিল স্যান ফ্র্যান্সিসকোয়। তারপর দক্ষিণে

কেপ হর্নের দিকে রওনা হয়, সেখান থেকে স্কটল্যাণ্ডে ফিরে যেত। যাওয়া আর হল না, ঝড়ের কবলে পড়ল। আঠারশো চুরানব্বইর ডিসেম্বরে রাতের বেলা তীরের কাছাকাছি প্রবালপ্রাচীরে ধাক্কা খেল ওটা।

'ভয়ানক ঝড় বইছিল। বেঁচেছিল হাতে গোনা কয়েকজন। নাবিকেরা জাহাজ থেকে নেমে নৌকায় করে তীরে ওঠার চেষ্টা করেছিল, পারেনি। বেঁচেছে তারাই, যারা জাহাজ থেকে নামেনি, কিংবা নামতে পারেনি। ধাক্কা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডুবে যায়নি জাহাজটা, টিকেছিল ভোর পর্যন্ত। ডোবার আগে পর্যন্ত ওটাতে ছিল ক্যাপ্টেন।'

'গুপ্তধন ছিল না?'

'আমার সন্দেহ আছে। অল্প পানিতে ডুবেছে জাহাজটা। ডুবুরিরা বহুবার খুঁজেছে ওটাতে। একশো বছরের মধ্যে অনেকবার। এখনও মাঝেসাঝে কেউ কেউ গিয়ে খোঁজ করে। সে আমলের কয়েকটা মুদ্রা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি ওটাতে।' মাথা নাড়লেন প্রফেসর। 'না, ইয়াং ম্যান, লিটল মারমেইডে গুপ্তধন নেই। তবে গুজবটা সম্ভবত ছড়িয়েছে তার পরের আরেকটা দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে।'

'আরেকটা!' তাড়াতাড়ি ঘুরে বসল রবিন, প্রফেসরের দিকে মুখ করে।

'রকি বীচের কাছেই বাস করছিল লিটল মারমেইডের বেঁচে যাওয়া একজন স্কটিশ নাবিক বাওরাড ডাই। আঠারশো ছিয়ানব্বই সালে চারজন লোকের হাতে খুন হয় সে। পসি করে খোঁজা হয় ওই চারজনকে। তারাও মারা পড়ে পসিদের হাতে, মুখ খোলার আগেই। ফলে জানা যায়নি, ডাইকে কেন খুন করেছিল ওরা। চারজনের একজন, লিটল মারমেইডের ক্যাপ্টেন। সে কারণেই লোকের সন্দেহ, কোন জিনিসের পেছনে লেগেছিল ক্যাপ্টেন, যা জাহাজ থেকে সরিয়ে ফেলেছিল ডাই। তারপর থেকে কতজন যে কতবার গিয়ে জাহাজটাতে খুঁজেছে। আশপাশের তীরভূমি, ডাইয়ের বাড়ি আর চারপাশের প্রতিটি ইঞ্চি জায়গা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। কিছুই পায়নি।

'অনেক নাবিকের মত, বাওরাড ডাইও জার্নাল রাখত। পরে, তার বংশধররাই সেই জার্নালটা আমাদের সোসাইটিকে দান করেছে, পুস্তিকাটা লেখার সময় কাজে লাগবে বলে। ওই জার্নাল, আঠারশো ছিয়ানব্বই সালে তৎকালীন শেরিফও পড়েছিল। বাইরের লোকে তো বটেই, ডাইয়ের বংশধরেরাও সন্দেহ করে, গুপ্তধন আছে। তারাও অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে। পায়নি। জার্নালটাতে গুপ্তধনের কোন উল্লেখ নেই।'

ভ্রূকুটি করল রবিন। 'আপনার কি মনে হয়, স্যার? ঈস্ট ইণ্ডিজ থেকে আনা

কোন দামি জিনিস?'

'গুজব তো তাই বলে। জলদস্যুর সম্পদ। কেন? ও-ব্যাপারে তুমি কিছু জান নাকি?'

'ইয়ে, না, স্যার,' আমতা আমতা করল রবিন। 'নিছক আগ্রহ।'

'আই সী।' হাসলেন প্রফেসর কেইন। 'কেন আগ্রহ, জানতে পারি?'

'আমরা....আমরা, স্যার....ওই স্কুলের ব্যাপার আরকি। বড়দিনের ছুটি তো। স্কুলের ম্যাগাজিনে গবেষণামূলক একটা লেখা লিখতে চাই।'

'ভাল,' খুশি হলেন প্রফেসর। 'খুব ভাল।'

'স্যার, জার্নাল আর পুস্তিকাটা দেখতে পারি?'

রিমলেস গ্লাসের ওপাশে হাসি ফুটল প্রফেসরের চোখের তারায়। 'স্কুলের ম্যাগাজিনের জন্যে, না? নিশ্চয়। দেখ, কিছু আবিষ্কার করতে পার কিনা। তাহলে পুস্তিকার নতুন সংস্করণে তোমার নামও উঠে যাবে।'

হাসিমুখে বেরিয়ে গেলেন প্রফেসর। ফিরে এলেন কয়েক মিনিট পর। সঙ্গে এসেছেন মিসেস ডেভিড। হাতে একটা পাতলা পাণ্ডুলিপি—লিটল মারমেইডের ওপর লেখা পুস্তিকার, আর অয়েলস্কিনে বাঁধানো একটা নোটবুক।

নিয়ে পড়তে আরম্ভ করল রবিন।

সন্ধ্যার একটু আগে সাইকেল চালিয়ে ফিরে এল স্যালভিজ ইয়ার্ডে। পেছন দিকে বেড়ার পঞ্চাশ ফুট দূরে সাইকেল থেকে নামল। উনিশশো ছয় সালে স্যান ফ্রান্সিসকোতে এক মহাঅগ্নিকাণ্ডের ছবি আঁকা রয়েছে বেড়ার গায়ে। দাউ দাউ করে বাড়ি জ্বলছে। সেদিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ ভঙ্গিতে বসে আছে একটা কুকুর। এগিয়ে এসে কুকুরের একমাত্র চোখে টিপ দিল সে। বেরিয়ে পড়ল একটা ছোট ফোকর। তার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে লেভার চাপতেই সরে গেল বেড়ার তিনটে তক্তা। তিন গোয়েন্দার এই গোপন প্রবেশ পথের নাম 'লাল কুকুর চার'। সাইকেল নিয়ে ভেতরে ঢুকল রবিন।

জঞ্জালের তলা দিয়ে গেছে পথ। হামাগুড়ি দিয়ে সেই পথ ধরে গেলে ট্রেলারে ঢোকা যায়। হেডকোয়ার্টারে ঢোকার আগে ওয়ার্কশপটা দেখার সিদ্ধান্ত নিল সে। কিছুদূর এগিয়ে দেখল মেইন গেট দিয়ে সাইকেল চালিয়ে ইয়ার্ডে ঢুকছে মুসা আমান।

'সারাটা বিকেল খাটিয়ে মেরেছে আমাকে!' রবিনকে দেখে প্রায় গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'ছুটি, হ্যাহ! এরচে স্কুলই ভাল ছিল।'

আউটডোর ওয়ার্কশপে এসে ঢুকল দু'জনে। ওখানে পাওয়া গেল কিশোরকে। ওয়ার্কবেঞ্চের ওপর একটা বাতি রেখে বাক্সটা পরীক্ষা করছে। হিসটোরিক্যাল

সোসাইটিতে কি জেনেছে রবিন, বলার জন্যে মুখ খুলতেই হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে দিল গোয়েন্দাপ্রধান। 'এক মিনিট।' উত্তেজিত কণ্ঠ। 'আবার দেখলাম বাক্সটা। কি পেয়েছি, দেখ।'

অয়েলস্কিনে মোড়া একটা নোটবুক দেখাল কিশোর। সোসাইটিতে যে-রকম দেখে এসেছে রবিন, সে-রকম, তবে আরও পাতলা। হাত বাড়াল সে।

কথা বলে উঠল একটা খসখসে কণ্ঠ, ওয়ার্কশপে ঢোকার দরজায় দাঁড়িয়ে। 'ওটা আমাকে দাও!'

ছেলেদের দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছে পানির পোকা টিক বানাউ।

চার

লাফিয়ে উঠল কিশোর। পিছিয়ে গেল জঞ্জালের কাছে। বরফের মত জমে গেছে যেন মুসা আর রবিন।

পায়ে পায়ে কিশোরের দিকে এগোল টিক। বইটা শক্ত করে বুকের ওপর চেপে ধরেছে কিশোর। 'মুসা!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'পরিকল্পনা এক!'

পাঁই করে অন্য দু'জনের দিকে ঘুরল টিক। 'খবরদার! কোন চালাকি নয়!'

দাড়িওয়ালা নাবিকের কঠিন দৃষ্টি বর্শার ফলার মত বিদ্ধ করছে যেন দুই সহকারী গোয়েন্দাকে। ঢোক গিলল দু'জনেই। ওদেরকে ভয় দেখাতে পেরে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল টিক। 'দাও, বইটা। নিয়ে যাব।'

'আপনি এক নম্বরের মিথ্যুক!' বলে, পাশে সরতে আরম্ভ করল কিশোর। 'এবং চোর!'

হেসে উঠল টিক। 'ভুল বললে, খোকা। ডাকাত। ছিনিয়ে নিতে এসেছি যে। আর আমার খারাপের দেখেছ কি? দরকার পড়লে····,' বাক্যটা শেষ করল না সে। 'দাও, বইটা।'

সরেই যাচ্ছে কিশোর। সঙ্গে সঙ্গে এগোচ্ছে টিক। জঞ্জালের একটা বিশেষ স্তূপের কাছে চলে এল লোকটা। খেয়াল করল না, তার পেছনে চলে গেছে রবিন আর মুসা।

'এইবার!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

নিচু হয়ে স্তূপের নিচ থেকে একটানে দুটো তক্তা বের করে ফেলল রবিন আর মুসা। ফিরে তাকাল টিক। কিন্তু দেরি করে ফেলেছে।

লাফ দিয়ে সরে গেছে রবিন আর মুসা। টিকের গায়ের ওপর ভেঙে পড়ল জঞ্জালের স্তূপ—তক্তা, খাটের স্প্রিং, ভাঙা চেয়ার, ছেঁড়া কার্পেট। লাথি মেরে,

দু'হাতে ঠেলে ওসব সরিয়ে বেরোনোর চেষ্টা করছে সে।

দাঁত বের করে হাসছে রবিন আর মুসা।

'দাঁড়িয়ে আছ কেন?' কিশোর বলল। 'জলদি দৌড় দাও!'

ছড়িয়ে পড়া জঞ্জাল এড়িয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। ছুটল ইয়ার্ডের অফিসের দিকে। ট্রাকে মাল তুলছে বোরিস। তখনও জঞ্জাল সরিয়ে বেরোতে ব্যস্ত টিক, আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

'বোরিস ভাই!' চিৎকার করে ডাকল মুসা। 'ওয়ার্কশপে চোর ঢুকেছে! ধরুন ওকে!'

'তাই নাকি?' হাতের ভাঙা চেয়ারটা মাটিতে ফেলে দিল বোরিস। 'চল তো দেখি।'

ওয়ার্কশপে চলল আবার ওরা। আওয়াজ থেমে গেছে। ছুটে বেরোল একজন মানুষ, দৌড় দিল পেছনের বেড়ার দিকে।

'ওই যে!' বলেই মুসাও দৌড়াল পেছনে।

রবিন বলল, 'কি জানি নিয়ে যাচ্ছে! হাতে....বোধহয় নোটবুক! কিশোর, কখন ফেললে?'

'খাইছে!' গুঙিয়ে উঠল মুসা।

'যাবে কোথায়?' দৌড়াতে দৌড়াতে বলল বোরিস। 'ধরে ফেলব।'

'নাহ্, আর পারব না,' থেমে গেল কিশোর। হাঁপাচ্ছে। 'নিশ্চয় তোমাদের কাউকে ঢুকতে দেখেছে লাল কুকুর চার দিয়ে। বেরিয়ে যাবে।'

অন্য তিনজন থামল না। তাড়া করে গেল। কিন্তু লাল কুকুর চার দিয়ে বেরিয়ে দেখল পথ নির্জন। টিক বানাউয়ের ছায়াও নেই।

'আরে, ওই তো!' হাত নাড়ল মুসা। 'সবুজ ফোক্সওয়াগেন।'

স্বল্প আলোকিত পথ ধরে ছুটে গেল গাড়িটা। দেখতে দেখতে পৌঁছে গেল পথের মোড়ে।

'গেল পালিয়ে, ব্যাটাআ!' হাত ঝাড়ল রবিন।

'ধরতে পারলে আজ...!' কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছে বোরিস।

আফসোস করতে করতে ফিরে এল ওরা। ছেলেরা ঢুকল ওয়ার্কশপে। বোরিস চলে গেল তার কাজে।

ছড়িয়ে পড়া জঞ্জালের দিকে তাকিয়ে মুখ বাঁকাল ছেলেরা, তেতো হয়ে গেল মন। আবার ওগুলো তুলে যথাস্থানে গুছিয়ে রাখা...দূর! কিন্তু কি আর করা? রাখতেই হবে।

'কাজই বাড়ল শুধু,' তিক্ত কণ্ঠে বলল মুসা। 'না পারলাম টিক ব্যাটাকে

আটকাতে, না পারলাম বইটা রাখতে।'

হাসল কিশোর। শার্টের বুকের কাছে হাত ঢুকিয়ে গেঞ্জির ভেতর থেকে বের করে আনল ভাঁজ করা একমুঠো কাগজ। অয়েলস্কিনের খাপটা নেই।

'নোটবুক,' জানাল সে। 'পাতাগুলো খুলে গেছে। পরিকল্পনা এক বলে আমি চিৎকার করতেই টিক তোমাদের দিকে ফিরেছিল। ওই সুযোগে একটানে পাতাগুলো বের করে গেঞ্জির ভেতরে ভরেছি। খাপটা ফেলে দিয়েছি মাটিতে। জিনিসটা খুব ভারি। না খুললে বুঝবে না, ভেতরে কিছু নেই। সেই ফাঁকিতেই পড়েছে টিক। তাড়াহুড়োয় খোলারও সময় পায়নি। জাস্ট তুলে নিয়ে দৌড়।'

মুসার মুখে হাসি ছড়াল। 'কিশোর, তুমি একটা জিনিয়াস!'

'নিশ্চয়ই!' একমত হল রবিন।

খোলাখুলি প্রশংসায় লজ্জা পেল কিশোর। তাড়াতাড়ি বলল, 'যাক, একটা ব্যাপার স্পষ্ট করে দিয়ে গেল টিক।'

'কি করে?' রবিন অবাক। 'কিছুই তো বলল না, খালি বইটা দাও বইটা দাও ছাড়া।'

'আসল কথাটাই তো বলল। কেন, বুঝতে পারছ না? আঙটি চায়নি, বাক্স চায়নি, খালি বই?'

'খাইছে!' মুসা বলল। 'তাই তো। শুধু বই। নোটবুকটা।'

'বইটা যে বাক্সে ছিল, জানত,' বলল রবিন।

'কিংবা অনুমান করেছিল,' কিশোর বলল। 'আসলে বাক্স নয়, নোটবুকটা নেয়াই উদ্দেশ্য ছিল তার। বাক্সটা কিনতে চেয়েছিল এটার জন্যেই।'

'নোটবুক এত দামি? কি আছে ওতে?' জানতে চাইল মুসা।

পাতাগুলো তুলে ধরল কিশোর। 'এটা একটা জার্নাল, মুসা। একধরনের ডায়েরী। প্রতিদিনের হিসেব-নিকেশ, ঘটনার কথা লেখা হয়। আমি...'

'জার্নাল?' বাধা দিয়ে বলল রবিন। 'কিশোর, আমিও একটা জার্নাল পড়ে এসেছি। লিখেছিল লিটল মারমেইডের বেঁচে যাওয়া এক নাবিক,' হিসটোরিক্যাল সোসাইটিতে জেনে আসা তথ্যগুলো জানাল রবিন। 'বাওরাড ডাইয়ের কথা মুখেই সব বলেছেন প্রফেসর, পুস্তিকাটাতে নতুন কিছু পাইনি। তবে জাহাজটার কথা বিস্তারিত লেখা আছে। কোন জায়গায় ঝড়ের কবলে পড়েছে, কোথায় গিয়ে প্রবালপ্রাচীরে ধাক্কা খেয়েছে, ভোর পর্যন্ত কোথায় ছিল, সব। কিভাবে বেঁচে তীরে উঠেছে ডাই, পরের দু'বছর কোথায় কোথায় ছিল, এসবও লিখেছে। বাড়ি তৈরির একটা সুবিধেমত জায়গার জন্যে ক্যালিফোর্নিয়ার অনেক জায়গায় ঘুরেছে সে।'

'গুপ্তধনের কথা কিছু লেখেনি?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

মাথা নাড়ল রবিন। 'এমনকি ক্যাপ্টেনের কথা, বিপদের কথা, কিছুই না। শুধু বাড়ির ব্যাপারে। সব ভোঁতা।'

কিন্তু কিশোরের কাছে ব্যাপারটা ভোঁতা লাগল না। বলল, 'দেখ, জার্নালটা বাক্সের দেয়ালে লুকানো পেয়েছি। মোটা এক পরত তক্তার ওপর পাতলা আরেক পরত লাগিয়ে তৈরি দেয়াল, মাঝখানটা ফাঁপা, তার মধ্যে ছিল। ভেতরটা শুকনো রাখার জন্যেই হয়ত ওরকম করে বানিয়েছিল, যাতে পানি ঢুকতে না পারে। প্রথমে বুঝতে পারিনি। বাক্সটা ধরে যখন জোরে ঝাঁকালাম, ভেতরে শুনলাম মৃদু আওয়াজ।

'তখন আরও ভালমত দেখলাম। চোখে পড়ল আলগা কাঠ। ভেতরের দেয়াল একরকম, আর বাইরেরটা আরেক। তবে রঙ, কাঠের দাগে তফাৎ খুব সামান্য। ভাল করে না দেখলে চোখেই পড়ে না। স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে খুঁচিয়ে চলটা তুলে ফেললাম। তারপর পাতলা কাঠটা ফাঁক করে ফেলতে অসুবিধে হয়নি। কোটের একটা হ্যাঙার দিয়ে টেনে বের করেছি অয়েলস্কিনে মোড়া জার্নালটা।'

'নিশ্চয়ই কেউ লুকিয়েছিল?' মুসা বলল।

'মনে হয় না। দেয়ালের ওপরের দিকটা ফাঁক হয়ে গিয়েছিল হয়ত। তখন কোনভাবে জার্নালটা পড়েছে ভেতরে। নেহাত কাকতালীয় ঘটনা। তারপর আবার দেয়ালটা মেরামত করে ফেলা হয়েছে। যে করেছে, সে খেয়ালই করেনি ভেতরে একটা জিনিস রয়েছে।'

'কিন্তু টিক বানাউ ঠিকই আন্দাজ করেছে, ওটা ভেতরে আছে,' মুসা বলল। 'জার্নালটা চায় সে। কেন?'

'রবিন, পয়লা পৃষ্ঠাটা পড়,' কাগজগুলো বাড়িয়ে দিল কিশোর।

বেঞ্চে রাখা আলোর কাছাকাছি পাতাগুলো নিয়ে গেল রবিন। জোরে জোরে পড়ল, 'বাওরাড ডাই, ফ্যানটম লেক, ক্যালিফোর্নিয়া, অক্টোবর ২৯, ১৮৯৬! ...কিশোর, ওই জার্নালটাও এই লোকই লিখেছে—যেটা পড়ে এলাম, লিটল মারমেইডের বেঁচে যাওয়া নাবিক।'

'ওই জার্নালের শেষ তারিখটা মনে আছে? কোন তারিখে শেষ করেছে?'

'এটা উনত্রিশে শুরু, ওটা শেষ হয়েছে আটাশ তারিখে। তারমানে ওটার পরের অংশ এটা।'

'এটাতে হয়ত গুপ্তধনের কথা লেখা আছে!' তুড়ি বাজাল মুসা।

মাথা নাড়ল কিশোর। 'না; সে-রকম কিছু দেখলাম না। রবিন যেটা পড়ে এসেছে, ও-রকমই। কোথায় কোথায় গিয়েছিল ডাই, কি কি করেছে। ব্যস, এসব।'

'তাহলে টিক চাইছে কেন?' আবার প্রশ্ন করল মুসা। 'সে-ও কি গুজবের পিছেই ছুটছে?'

'এই জার্নালই যে চাইছে, শিওর হচ্ছি কি করে?' রবিন প্রশ্ন তুলল।

জবাব দিল না কিশোর। খানিক পরে চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল, 'রবিন, তুমি বললে, ডাই পরিবার এই কিছুদিন আগে জার্নালটা হিসটোরিক্যাল সোসাইটিকে দান করেছে?'

'হ্যাঁ।...তারমানে...'

'তারমানে কাছাকাছিই কোথাও বাস করছে ওরা।' বাক্যটা শেষ করে দিল কিশোর। 'এস।'

দুই সুড়ঙ্গে ঢুকল কিশোর। পেছনে রবিন আর মুসা।

ট্র্যাপডোর তুলে হেডকোয়ার্টারে ঢুকল ওরা। ডেস্কে বসে টেলিফোন বুক খুলল কিশোর। 'এই যে, পাওয়া গেছে। মিসেস বাওরাড ডাই, চার, ফ্যান্টম লেক রোড। মুসা, ম্যাপটা, জলদি।'

বিশাল ম্যাপটায় চোখ বোলাচ্ছে কিশোর। জার্নালটার জন্যে নতুন একটা খাপ বানাচ্ছে রবিন।

অবশেষে মুখ তুলল গোয়েন্দাপ্রধান। 'এই যে। মাইল তিনেক পুবে, পর্বতের ভেতরে,' হাসল সে। 'কাল সাইকেল নিয়ে বেড়াতে যাব। দেখা করে আসব মিসেস ডাইয়ের সঙ্গে।'

পাঁচ

সুন্দর দিন। আবহাওয়া ঠাণ্ডা। কিন্তু সাইকেল চালিয়ে পর্বতের পাশের রাস্তায় যখন পৌছল তিন গোয়েন্দা। তেতে উঠেছে সূর্য।

'ওই যে,' কপালের ঘাম মুছল মুসা। 'ফ্যান্টম লেক রোড। দেখ, সোজা পর্বতের ভেতরে ঢুকে গেছে।'

'আর কি খাড়া,' গুঙিয়ে উঠল কিশোর। 'চালাতে তো পারবই না, ঠেলে নিতে হবে সাইকেল। চল, কি আর করা যাবে।'

ঠেলে নিয়ে উঠতে লাগল ছেলেরা। লম্বা গাছপালার ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে গেছে পাহাড়ী পথ। পথের ধারে একটা খাঁড়ি; এই শীতেও ঝোপঝাড়ে বোঝাই, আশপাশে শুকনো, রুক্ষ মরূদ্যান।

'এই নাম পেল কোথায়?' ধূসর পর্বতের দিকে তাকিয়ে বলল রবিন। 'ফ্যান্টম লেক। অবাকই লাগছে। এখানকার পর্বতের মাঝে হ্রদ আছে বলে তো কখনও

শুনিনি!'

ভ্রূকুটি করল কিশোর। 'হ্যাঁ। অবাক করার মতই।'

'ওদিকে কয়েকটা পুকুর দেখা যাচ্ছে,' মুসা বলল।

'আছে। কিন্তু ওগুলোর একটার নামও ফ্যান্টম লেক নয়,' বলল রবিন। 'আমি…।'

ইঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল। সামনে, ওপর থেকে ফ্যান্টম লেক রোড ধরে নেমে আসছে গাড়িটা। মোড় নেয়ার সময় তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ জানাচ্ছে টায়ার, শোনা যাচ্ছে, গাড়ি চোখে পড়ছে না এখনও। দেখা গেল অবশেষে। ছুটে আসছে ওদের দিকেই।

'আরি! সবুজ ফোক্সওয়াগেন!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'টিক বানাউ!' বলল রবিন।

'লুকাতে হবে!' কিশোর বলে উঠল। 'কুইক!'

সাইকেল তিনটে পথের পাশে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে হুড়মুড় করে ঝোপে ঢুকে পড়ল ওরা। পাশ দিয়ে শাঁ করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা, কয়েক গজ এগিয়েই ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল। এক ঝটকায় দরজা খুলে লাফিয়ে রাস্তায় নেমে ছুটে এল চালক। 'এই, এই ছেলেরা, থাম!'

লোকটা টিক বানাউ নয়। রোগাটে এক যুবক, পুরু গোঁফ, কালো উদাসী চুল। পরনে কালো পোশাক। 'এই, কি হচ্ছে?' আবার চিৎকার করে বলল সে। 'কি করছ ওখানে…?'

পিছিয়ে গেল ছেলেরা।

'দৌড় দাও!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

পথের ধার দিয়ে ছুটতে শুরু করল ওরা। পেছনে আবার চিৎকার করে উঠে পিছু নিল লোকটা।

সামনে একটা ঘন ঝোপ, পথের পাশে। আর কোন উপায় না দেখে তাতেই ঢুকে পড়ল ছেলেরা।

'কে…?' হাঁপাচ্ছে রবিন। 'কে লোকটা?'

'আগে পালানো দরকার,' মুসা বলল। 'তারপর প্রশ্ন।'

'দাঁড়াও,' বলল কিশোর। 'দেখি ওকে জিজ্ঞেস করে…।'

এই সময় আরেকটা শব্দ শোনা গেল। ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের খটাখট। পথের ডানে বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একজন ঘোড়সওয়ার। হাতে লম্বা চকচকে কি যেন।

'কে…কে…!' কথা জড়িয়ে গেল মুসার।

'দেখ, দেখ!' কিশোর বলল।

ওদের পাশ দিয়ে গাড়ির দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে গেল লোকটা। ততক্ষণে ঘুরে গাড়ির দিকে ছুট দিয়েছে যুবক। গাড়িতে উঠে, স্টার্ট দিয়ে, একরাশ ধুলো উড়িয়ে চলে গেল ঢালু পথ ধরে। গাড়ির পিছে পিছে কিছুদূর ছুটে গেল ঘোড়সওয়ার। ধরা যাবে না বুঝে থামল, তারপর ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল ছেলেদের দিকে।

রাশে হ্যাঁচকা টান খেয়ে পেছনের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে গেল ঘোড়াটা। বেঁটে, গাট্টাগোট্টা আরোহী কড়া চোখে তাকাল ছেলেদের দিকে। নীল চোখ, লাল মুখ। গায়ে টুইড জ্যাকেট, পরনে আঁটো পায়জামা। হাতের জিনিসটা তলোয়ার।

'চুপ!' ধমক দিল সে। 'একদম নড়বে না!'

'কিন্তু…!' প্রতিবাদ জানাতে গেল কিশোর।

'চুউপ!' গর্জে উঠল লোকটা। 'ওই চোরটার সঙ্গে তোমাদের কি সম্পর্ক?'

গরম হয়ে বলল মুসা, 'ওর সঙ্গে আমাদের কোন সম্পক…।'

'মিথ্যে কথাগুলো পুলিশের কাছে বলা। নাও, হাঁট।'

'কিন্তু, স্যার,' আবার শুরু করল কিশোর। 'আমরা…।'

'হাঁটতে বললাম না!'

শাঁই করে বাতাসে তলোয়ার চালাল লোকটা। ভয়ে মাথা নিচু করে ফেলল ছেলেরা, না করলেও অবশ্য লাগত না, অনেক ওপর দিয়ে গেছে। আর প্রতিবাদ করল না। পা বাড়াল নীরবে।

দশ মিনিট পর। একটা শৈলশিরা পেরিয়ে হঠাৎ নিচে নেমে গেল আবার পাহাড়ী পথ, উপত্যকায়। ঘন গাছপালা জন্মেছে ওখানে। একেবারে তলায় ছোট একটা পুকুর, দুটো ফুটবল মাঠের সমান। পুকুরের মাঝে উঁচু দ্বীপ, তাতে কিছু পাইন গাছ, আর লম্বা খুঁটির মাথায় একটা লণ্ঠন—একধরনের বীকন বলা যেতে পারে, আলোক-সঙ্কেত দেয়ার জন্যেই তৈরি হয়েছে বোধহয়। দ্বীপের কিনার থেকে শুরু করে খালের মধ্য দিয়ে এসে হ্রদের প্রান্ত ছুঁয়েছে এক সারি পাথর।

থমকে গেল মুসা। 'এ-কি? এই সেই হ্রদ?'

'এই, কোন কথা না,' পেছনে ধমক দিল অশ্বারোহী। 'এগোও।'

পাহাড়ী পথ ধরে নেমে চলল ছেলেরা। কড়া রোদ। ফিসফিসিয়ে মুসা বলল, হ্রদ না ছাই। ডোবাও এরচে বড়।'

পথের একটা মোড় ঘুরতে নিচে একটা বাড়ি দেখা গেল। পাথরের বাড়ি, তিনতলা, উঁচু জায়গায় তৈরি করা হয়েছে। চারকোণা একটা পাথরের টাওয়ারের

ওপর ব্যাটলমেন্ট, তাতে বড় বড় ছিদ্র। তীর ছুঁড়তে, কিংবা ছিদ্র দিয়ে বন্দুকের নল বের করে গুলি ছোঁড়ার জন্যে আগের দিনে বানানো হত ওধরনের ব্যাটলমেন্ট। দু'ধারে দুটো বিশেষ ধরনের জানালাও আছে, ডরমার উইনডো বলে ওগুলোকে। ঘন হয়ে জন্মানো পুরানো আঙুরলতাও বাড়ির দেয়ালের রুক্ষতা ঢাকতে পারছে না।

'বাপরে!' বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠেও স্বর নামিয়ে ফেলল মুসা। 'বাড়ি না দুর্গ রে, বাবা! ওই টাওয়ারে উঠে বহুদূরের শত্রুকেও দেখা যাবে।'

'হ্যাঁ, অদ্ভুতই,' একমত হল কিশোর।

বাড়ির সামনে পৌছে ঘোড়া থেকে নামল লোকটা। আদেশ দিল, 'যাও, ঢোক।'

বিরাট এক ঘরে ঢুকল ওরা, বাইরের হলরুম। দেয়ালের ওপর সুদৃশ্য কাঠের আস্তরণ। কারুকাজ করা পর্দা। পুরানো অস্ত্রশস্ত্র ঝোলানো। বড় একটা এল্ক হরিণের মাথাও রয়েছে। কাঠের মেঝেতে বিছানো রঙচটা কার্পেট। একসময় হয়ত দামি ছিল জিনিসগুলো, এখন পুরানো, মলিন। তলোয়ার দেখিয়ে ওদেরকে আরেকটা বড় ঘরে নিয়ে এল লোকটা, লিভিংরুম, ভারি ভারি পুরানো আসবাবপত্র আছে এটাতে। এককোণে পাথরের মস্ত ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে, তাতেও ঘরের ঠাণ্ডা কাটছে না। শীত শীত একটা ভাব রয়েই গেছে।

ফায়ারপ্লেসের সামনে চেয়ারে বসে আছেন হালকাপাতলা এক মহিলা। সুন্দরী। পাশে দাঁড়ানো রবিনের বয়েসী লাল-চুল এক কিশোর। লোকটার মতই তার পরনেও আঁটো পাজামা।

'ধরা পড়েছে?' বলে উঠল ছেলেটা।

'না, চোরটাকে ধরতে পারিনি,' লালমুখো লোকটা জানাল। 'পালিয়েছে। এগুলোকে ধরেছি।'

'কাদের নিয়ে এসেছ?' মহিলা বলল। 'কয়েকটা ছেলে···ডিনো, এরা···'

'ইবলিস হতে কি বয়স্ক হওয়া লাগে নাকি, ডোরিনা ডাই,' ডিনো বলল। লাল-চুল ছেলেটার দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল, 'পুলিশকে ফোন কর, এড। সব শয়তানি আজই বন্ধ করব।'

সতর্ক হয়ে উঠল কিশোর। 'ফোক্সওয়াগেনের লোকটা চুরি করে ঢুকেছিল নাকি এখানে, স্যার? কি নিয়েছে?'

হেসে উঠল ডিনো। 'এহ্, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না।'

'সত্যি আমরা কিছু জানি না,' রেগে উঠল মুসা। 'লোকটাকেও আগে আর দেখিনি। গাড়িটা অবশ্য দেখেছি, আমাদের পিছু নিয়েছিল।'

শান্তকণ্ঠে কিশোর বলল, 'আমরা আপনার কাছেই আসছিলাম, মিসেস ডাই। এই সময় গাড়িটা আসতে দেখলাম। গাড়ি থামিয়ে আমাদের তাড়া করল লোকটা।... আমি কিশোর পাশা, ও মুসা আমান, আর ও রবিন মিলফোর্ড। তিনজনেই রকি বীচে থাকি। আমাদের সাইকেল রাস্তায় ফেলে এসেছি। এতেই প্রমাণ হয়, আমরা ফোক্সওয়াগেনে লোকটার সঙ্গে আসিনি।'

'ডোরিনা!' কড়া গলায় বলল ডিনো। 'পুলিশকে জানানো উচিত...।'

'থাম, ডিনো,' ছেলেদের দিকে চেয়ে বললেন মহিলা। 'এ আমার ছেলে, এডবার ডাই। আর ও ডিনাম্যান হ্যাঙবার, আমাদের আত্মীয়। তো, কেন আসছিলে আমার কাছে?'

'বাক্সটার জন্যে, ম্যাডাম,' জানাল রবিন।

'একটা স্যালভিজ ইয়ার্ড আছে আমাদের,' বুঝিয়ে বলল কিশোর। 'এক মিউজিয়মে গিয়েছিলাম পুরানো মাল কিনতে। সেখানে একটা বাক্স পেয়েছি, তাতে লিটল মারমেইড জাহাজের নাম লেখা। আমরা জেনেছি, বাক্সটা আপনাদের কোন পূর্বপুরুষের ছিল। ওটা হাতে আসার পর থেকেই রহস্যময় কতগুলো ঘটনা ঘটেছে। ফোক্সওয়াগেনের লোকটা আপনার বাড়ি থেকে কি নিয়েছে, জানলে হয়ত ঘটনাগুলোর কারণ বুঝতে পারব।'

দ্বিধা করলেন মিসেস ডাই। 'না, সে কিছু নেয়নি। এরকমই হয়, হয়ে আসছে প্রতিটি বার। চুরি করে ঢোকে, বাওরাড ডাইয়ের জিনিসপত্র ঘাঁটে। কখনোই কিছু নেয়নি।'

'কিছুই নেয়নি?' হতাশ মনে হল মুসাকে।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'ইদানীং কবার ঢুকেছে, মিসেস ডাই?'

'গত ছয় মাসে পাঁচবার।'

'সব সময় বাওরাডের জিনিসই খালি ঘাঁটে। বোধহয়...,'এড বলল। 'বাওরাড আমার দাদার দাদা।'

'গুপ্তধন খোঁজে!' এডের কথাটা শেষ করল রবিন।

'মা, দেখলে! ওরাও ভাবছে, গুপ্তধনের খোঁজে আসে চোর। আমার কথা তো বিশ্বাস কর না।'

হাসলেন মহিলা। 'অনেক আগেই প্রমাণ হয়ে গেছে, গুপ্তধন নেই। শুধুই গুজব।'

'না-ও হতে পারে, মিসেস ডাই,' কিশোর বলল। টিক বানাউ আর বাক্সটার প্রতি তার আগ্রহের কথা জানাল। বাক্সে পাওয়া আঙটিটা দেখাল মহিলাকে।

হাতে নিয়ে জিনিসটা দেখলেন মিসেস ডাই। বললেন, 'তোমরা পেয়েছ?'

'দেখি তো,' বোনের হাত থেকে আঙটিটা নিল ডিনো। 'বাহ্, খুব দামি জিনিস,' মুখ বাঁকাল সে। 'লাল কাচ আর তামা। বুড়ো ডাই এসব ফালতু জিনিস নিয়েই বাণিজ্য করতে যেত, পুবদেশের গাধাগুলোকে গিয়ে ঠকাত। তোমরাও হাঁদা। লোকে কি আর খোঁজা বাদ রেখেছে নাকি। বুড়োর জার্নাল ঘাঁটতে ঘাঁটতে ছিঁড়ে ফেলেছে, পাতি পাতি করে খুঁজেছে জাহাজটা। কিচ্ছু পায়নি।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন মিসেস ডাই। 'ডিনো ঠিকই বলেছে। গুপ্তধনের সামান্যতম ইঙ্গিত থাকলেও ওই জার্নালেই থাকত। নেই বলেই পায়নি লোকে। অযথাই গুজব ছড়িয়েছে।'

'সবাই হয়ত ভুল জার্নালটা পড়েছে, সে-জন্যেই পায়নি।' জ্যাকেটের ভেতর থেকে পাতলা জার্নালটা টেনে বের করল কিশোর।

ছয়

'আরেকটা জার্নাল?' চেঁচিয়ে উঠল এড।

'এসব কি? চালাকি হচ্ছে, না?' ধমক দিল ডিনো।

কিশোরের হাত থেকে জার্নালটা নিলেন মিসেস ডাই। ধীরে ধীরে কয়েক পাতা ওল্টালেন। 'না, ডিনো, চালাকি করছে না। বাওরাড ডাইয়ের হাতের লেখা, কোন সন্দেহ নেই। সইও এক।' ছেলেদের দিকে তাকালেন। 'কোথায় পেয়েছ?'

কোথায়, কিভাবে পেয়েছে, জানাল কিশোর। তারপর বলল, 'বাক্সটা যে-ই মেরামত করে থাকুক, ফাঁকের ভেতর জার্নালটা তার চোখে পড়েনি, বোঝা যায়। গোপন খোপটাও না। কারণ, ওটা খুললেই ছুরিটা বেরিয়ে যেত।'

মাথা ঝাঁকালেন মিসেস ডাই। 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে। বছর দুই আগে বিক্রি করে দিয়েছিলাম, আমার স্বামীর মৃত্যুর পর। অভাবে পড়ে ডাইদের আরও অনেক জিনিসই ছেড়ে দিতে হয়েছে আমাকে। এই বাড়িটা রাখাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন। ডিনোর সাহায্য না পেলে আরও আগেই ছেড়ে দিতে হত।'

'ছাড়তে হবে না, ডোরিনা,' ডিনো বলল। 'আর রূপকথা শোনারও দরকার নেই।'

'জার্নালে রূপকথা থাকে না, মিস্টার হ্যাঙবার,' কিশোর বলল।

'আমাকে শুধু ডিনো বলে ডাকলেই চলবে।··· ডোরিনা যখন বলছে, জার্নালটা আসল, ধরে নিলাম আসলই। কিন্তু তাতে প্রমাণ হয় না যে গুপ্তধন আছে।'

'কিন্তু চিঠিটা!' বলে উঠল এড।

'চিঠি?' সতর্ক হল কিশোর।

প্রশ্ন এড়িয়ে গেল ডিনো। সরু হয়ে এল চোখ। 'পড়ে দেখা দরকার। দেখি, জার্নালটা।'

মায়ের হাত থেকে নিয়ে জার্নালটা দিল এড। ফায়ারপ্লেসের ধিকিধিকি আগুনের সামনে লম্বা একটা বেঞ্চে বসে পড়তে শুরু করল ডিনো। এডও বসল তার পাশে।

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন মিসেস ডাই। 'হুঁ, দ্বিতীয় জার্নালটাও বাক্সেই থাকার কথা। আমার স্বামী বলেছে, তার দাদা নাকি প্রথম জার্নালটাও বাক্সেই পেয়েছেন। বরাবরই দাদার বিশ্বাস ছিল, গুপ্তধন আছে, আর জার্নালেই রয়েছে তার সূত্র। কিন্তু আমার শ্বশুর তা মনে করতেন না। তাঁর ধারণা, ওটা শুধুই গুজব।'

'আপনার দাদা-শ্বশুর এত শিওর ছিলেন কেন?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'একটা চিঠি। আমার দাদা-শ্বশুর...,' থেমে গিয়ে হাসলেন মহিলা। 'গোড়া থেকেই বলি। বাওরাড ডাই সম্পর্কে কতখানি জান তোমরা?'

কি কি জানে, জানাল রবিন।

'ও, অনেক কিছুই তো জান তাহলে। সোসাইটিকে প্রায় সবই বলেছি আমি, স্বামীর মুখে যা যা শুনেছি। অনেক ঘুরে, দেখেশুনে এই উপত্যকা পছন্দ করেছিলেন বাওরাড ডাই। তাঁর বাড়ি স্কটল্যাণ্ডের হাইল্যাণ্ডে। এখানকার সঙ্গে ওই জায়গার মিল আছে, বিশেষ করে পুকুর আর ওটার মাঝের দ্বীপটা। স্কটল্যাণ্ডে ডাইদের বাড়ি ছিল সাগরের একটা খাঁড়ির ধারে। খাঁড়িটার নাম ফ্যান্টম লক। লকের মাঝে ছিল ছোট দ্বীপ। দ্বীপ থেকে বড় বড় পাথর চলে এসেছিল তীর পর্যন্ত। এখানে পুকুরটাতে যে-রকম আছে ঠিক সে-রকম। ওগুলো দিয়ে দ্বীপে যাওয়া যেত, নাম রাখা হয়েছিল ফ্যান্টম'স স্টেপস।'

'লক মানে কি?' মুসা বলল। 'হ্রদ, না?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল কিশোর। 'ফ্যান্টম লক, বা ভূতের হ্রদ, আর ফ্যান্টম'স স্টেপস হল গিয়ে ভূতের সিঁড়ি।' ডোরিনার দিকে তাকাল সে। 'তাহলে এই ব্যাপার! মিস্টার বাওরাড ডাই এখানে বাড়ি বানিয়েছেন স্কটল্যাণ্ডের বাড়ির মত করে। সেজন্যেই ক্যালিফোর্নিয়ায় বেমানান।'

'হ্যাঁ, কিশোর। আসল ডাই লজটা তৈরি হয়েছিল তেরশো বায়ান্ন সালে। তখন ওটার নাম ছিল ডাই ক্যাসল। চোর-ডাকাত আর বাইরের শত্রুর হামলার আশঙ্কা এত বেশি ছিল সেকালে, পয়সাওয়ালা লোকেরা দুর্গ ছাড়া থাকতে সাহস পেত না। নিরাপদ মনে করত না,' এক মুহূর্ত বিরতি দিয়ে বললেন মহিলা, 'প্রথমে ডাই ক্যাসল ছিল শুধু একটা টাওয়ার হাউস। আস্তে আস্তে চারপাশে ঘর তৈরি হল, ঠিক এই বাড়িটার মত। সতেরশো সালের দিকে ওই টাওয়ারে অস্ত্রধারী দারোয়ান

বসানোর দিনে শেষ হয়ে এল। সে-সময় পেশা বদল করে নাবিক হল ডাইয়েরা। তখন টাওয়ারে উঠে সাগর দেখত তাদের স্ত্রীরা, জাহাজ দেখত, স্বামীদের জাহাজের ফেরার অপেক্ষা করত।'

পুরানো দিনের এসব গল্প শুনতে শুনতে অধৈর্য হয়ে উঠল মুসা। বলল, 'চিঠির কথা কি যেন বলছিলেন?'

'উপত্যকাটা পছন্দ করে বাড়ি তৈরি করলেন বাওরাড ডাই। বানাতে প্রায় দু'বছর লেগেছিল। তারপর ছেলে আর স্ত্রীকে আনতে লোক পাঠালেন স্কটল্যাণ্ডে। কয়েক মাস পর ওরা যখন এসে পৌঁছল, বাওরাড তখন নেই, খুন হয়েছেন। তাঁর স্ত্রী নোরিয়া একটা চিঠি খুঁজে পেলেন পুরানো একটা বেড-ওয়ারমারের ভেতরে। নোরিয়ার উদ্দেশেই লেখা।'

'তারমানে এমন কিছু,' কিশোর বলল। 'যা নোরিয়া ছাড়া আর কেউ বুঝতে না পারে?' বেশ খুশি মনে হল তাকে।

'নোরিয়ার ছেলে তা-ই ভাবতেন। গুজব ছড়ানো শুরু হয়েছে তখন। তিনি বিশ্বাস করতেন, ওই চিঠি আর জার্নালেই রয়েছে গুপ্তধনের চাবিকাঠি। অনেক চেষ্টা করেছেন আমার দাদা-শ্বশুর। বোঝেননি কিছু।'

'চিঠিটা দেখা যায়?' অনুরোধ করল মুসা।

'নিশ্চয়ই। আমার শোবার ঘরেই রেখেছি, একটা খাতার ভেতরে।'

'কেন?' কিশোর জিজ্ঞেস করল। 'খাতায় কেন? বাওরাড ডাইয়ের অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে রাখেন না?'

'না।'

উঠে বেরিয়ে গেলেন মিসেস ডাই। খাতাটা নিয়ে ফিরলেন। হলদে হয়ে গেছে চিঠির কাগজ।

তাতে লেখাঃ

'নোরিয়া, ডিয়ার

শীঘ্রি এসে পৌঁছবে তুমি। ইদানীং আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আমার ওপর চোখ রাখছে কেউ। শেষ এই জরুরি কথাগুলো বলতে হচ্ছে আমাকে, আরও অনেকেই পড়বে এই চিঠি সেকথা মনে রেখে।

তোমাকে কথা দিয়েছিলাম সোনালি সুখ উপহার দেব। তা-ই দিচ্ছি। মনে করার চেষ্টা কর, বাড়িতে আমি কি ভালবাসতাম, ভাব পলকের গোপন রহস্যের কথা। আমার শেষ নির্দেশ অনুসরণ কর। পড়, আমার দিনগুলো কিভাবে তৈরি করেছি তোমার জন্যে। আয়নায় দেখ সেই গোপন কথা।'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল ছেলেরা। আবার পড়ল চিঠিটা।

'আমার দাদা-শ্বশুর মনে করতেন,' মিসেস ডাই বললেন। 'সোনালি সুখ বলে গুপ্তধন বোঝাতে চেয়েছেন বাওরাড ডাই। বাড়ির এমন কোন আয়না নেই যার ভেতরে তিনি দেখেননি, যেটা নিয়ে গবেষণা করেননি। কিছুই যখন পেলেন না, অনুমান করলেন, জার্নালে দেখতে বলা হয়েছে। আমার দিনগুলো কিভাবে তৈরি করেছি তোমার জন্যে—এটা জার্নাল দেখার ইঙ্গিত। খুঁজলেন। কিছুই বের করতে পারলেন না।'

'কারণ, দ্বিতীয় জার্নালটা তিনি পাননি,' কিশোর বলল। 'চিঠিতে বলা হয়েছেঃ শেষ নির্দেশ অনুসরণ কর। তার মানে শেষ জার্নাল দেখার কথাই বলেছেন। চিঠি লেখার আগের দু'মাসের কথা লেখা রয়েছে ওতে। ওই দু'মাসে কি কি করেছিলেন বাওরাড ডাই?'

নাক দিয়ে বিচিত্র শব্দ করে জার্নালটা রেখে দিল ডিনো। 'গুপ্তধনের কথা কিচ্ছু বলেনি। খালি বাজে বকবক—কোথায় কোথায় গিয়েছিল, নোরিয়াকে চমকে দেয়ার জন্যে কি কি বানিয়েছে; এসব কথা।'

'নাহ্, কোন সূত্র নেই, বুঝলে,' তিন গোয়েন্দাকে বলল এড। 'কিছুই বুঝলাম না।'

'আমিও বুঝিনি,' স্বীকার করল কিশোর। 'মিসেস ডাই, বাওরাড ডাই বাড়িতে কি ভালবাসতেন, জানেন? লকের গোপন রহস্যটাই বা কি?'

'আমি কিছুই বলতে পারব না, কিশোর, কি ভালবাসতেন বাওরাড। তবে লকের ব্যাপারে পুরানো একটা কিংবদন্তী আছে স্কটল্যাণ্ডে, ডাইদের এলাকায়। ওদের কোন এক পূর্বপুরুষ নাকি অপঘাতে মারা যায়। তারপর মাঝে মাঝে দেখা গেছে তাকে, শীতের সকালে, কুয়াশার মধ্যে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে নাকি চেয়ে থাকত হ্রদের দিকে। শত্রু খুঁজত। নয় শতকে ভাইকিংরা মেরে ফেলেছিল তাকে। তার নামেই নামকরণ করা হয়েছিল হ্রদের।'

'বাহ্, চমৎকার,' বলল এড। 'গুপ্তধনের সঙ্গে ভূতের গল্প। ভালই জমে।'

'টিক বানাউই সেই ভূত কিনা কে জানে,' মুসা বলল।

'সবুজ ফোক্সওয়াগেনের লোকটা কে?' রবিনের প্রশ্ন।

'আর আমাদের বাড়িতে চোর ঢোকারই বা কি ব্যাখ্যা?' রবিনের কথার যেন প্রতিধ্বনি করল এড।

ডিনো নীরব হয়ে আছে।

'চোর ঢোকার সম্ভবত একটাই ব্যাখ্যা,' কিশোর বলল। 'টিক বানাউ কোনভাবে পেয়েছে চিঠিটা। পড়ে বুঝেছে, জার্নালে খোঁজার কথা বলা হয়েছে। প্রথম জার্নালের শেষ পাতার শেষ তারিখ, আর বাওরাড ডাইয়ের খুন হওয়ার

মাঝের দুটো মাস ফাঁকা। অর্থাৎ জার্নাল যেদিন শেষ হয়েছে, তার দু'মাস পরে মারা গেছেন বাওরাড। ওই দুই মাস কি তিনি জার্নাল লেখেননি? জার্নাল বা ডায়েরী লেখা যাদের অভ্যাস, তারা সাধারণত না লিখে পারে না। একথা জানা আছে টিক বানাউয়ের। সন্দেহ করেছে, নিশ্চয় দ্বিতীয় আরেকটা জার্নাল আছে। আমার ধারণা, চুরি করে ডাই লজে ঢুকে সেটাই খুঁজেছে সে।'

'গাধা আরকি,' বিড়বিড় করল ডিনো। 'গুপ্তধন শিকারী। হুঁহ্!'

'গুপ্তধন শিকারী হলেই গাধা হয় না,' জোর আপত্তি জানাল কিশোর। 'চিঠিতে কি লিখেছেন বাওরাড? শেষ এই জরুরি কথাগুলো বলতে হচ্ছে আমাকে, আরও অনেকেই পড়বে এই চিঠি সেকথা মনে রেখে। একটা ধাঁধা বানিয়ে রেখে গেছেন। তিনি ভেবেছিলেন, নোরিয়া সেটার সমাধান করতে পারবেন। আমার বিশ্বাস আরও বাড়ছে এখন। নিশ্চয় গুপ্তধন লুকিয়ে রেখে গেছেন বাওরাড়। ধাঁধার সমাধান করতে পারলেই বের করা যাবে। আর সমাধানের সূত্র রয়েছে দ্বিতীয় জার্নালে।'

তার সঙ্গে একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল রবিন, মুসা, এড।

'কি জানি, কিশোর।' মিসেস ডাই মানতে পারছেন না, 'কিন্তু, নোরিয়া যেটা পারেননি, সেটা আর কে পারবে? তাঁর জন্যেই তো লেখা হয়েছিল চিঠি।'

'আমরা চেষ্টা করে দেখতে পারি, ম্যাডাম,' রবিন বলল।

'অনেক জটিল ধাঁধার সমাধান আমরা করেছি,' বলল মুসা।

'রহস্যের সমাধান করাই আমাদের নেশা,' ভারিক্কি চালে বলল কিশোর। পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার কার্ড বের করে দিল।

মায়ের কাঁধের ওপর ঝুঁকে কার্ডটা পড়ল এড, বড় বড় হয়ে গেল চোখ।

এগিয়ে এসে ডিনোও দেখল। সন্দেহ ফুটল চোখে।

কিশোর খুশি, তাদের যোগ্যতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা হল না দেখে। নতুন ছেপেছে কার্ড। তাতে কোন চিহ্ন দেয়া হয়নি। দিলেই লোকের মনে প্রশ্ন জাগে, সন্দেহ প্রকাশ করে। প্রথমে কিছুদিন প্রশ্নবোধক দিয়ে চালিয়েছিল, তারপর দিয়েছে আশ্চর্যবোধক। তারপর আবার প্রশ্নবোধক। সেগুলোও শেষ হওয়ার পর নতুন কার্ড ছেপেছে। গম্ভীর হয়ে বড়দের মত করে বলল, 'আমরা আপনাদের সাহায্য করতে চাই।'

'নিশ্চয় চাই,' মুসা যোগ করল।

মাকে অনুরোধ করল এড, 'চেষ্টা করতে দোষ কি, মা? করুক না। আমিও ওদের সাহায্য করব, যতটা পারি।'

'বেশ,' হাসলেন মিসেস ডাই। 'কোন দোষ দেখি না। গুপ্তধন পেলে তো খুবই

ভাল। বড় টানাটানিতে দিন কাটছে আমাদের।'

'হুর্‌রে!' হুল্লোড় করে উঠল রবিন, মুসা আর এড।

মিসেস ডাইয়ের হাসি বিস্তৃত হল। 'লাঞ্চটা তাহলে এবার সেরে ফেলা যায়, কি বল? গুপ্তধন খুঁজতে হলে শরীরে বল চাই তো।'

'খাইছে!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'ভুলেই গিয়েছিলাম! নিশ্চয় বলা দরকার।'

ডিনোর মুখে হাসি নেই, গম্ভীর হয়ে আছে। কার্ডটা ছুঁড়ে ফেলে বলল, 'সব চালাকি। ডোরিনা, ছেলেগুলো মহা চালবাজ, বিশ্বাস করা উচিত হবে না।'

'আমার তা মনে হয় না,' দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলেন যেন মিসেস ডাই।

'বেশ, যা ইচ্ছে কর! আমি এসবে নেই...!' বলে রাগে দুপদাপ পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ডিনো।

সেদিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করল কিশোর। চিন্তিত।

সাত

লাঞ্চের পর পরই বেরিয়ে গেল ডিনো। বলে গেল, পথের ধারে পাইন গাছের কিছু ডাল ছাঁটতে যাচ্ছে। ছেলেরা আর মিসেস ডাই ফিরে এলেন লিভিংরুমে। দ্বিতীয় জার্নাল থেকে সূত্র বের করায় মনোযোগ দিল।

'একটা কথা মনে রাখতে হবে,' বক্তৃতার ঢঙে শুরু করল কিশোর। 'জার্নাল ঠিক ডায়েরী নয়, কিছুটা আলাদা। নিজের চিন্তা-ভাবনা পরিকল্পনার কথা এতে লেখেননি বাওরাড, কোন ঘটনারও বিশ্লেষণ করেননি। প্রতিটি ঘটনাই খুব সংক্ষিপ্ত, এক কি দুই লাইনে শেষ। এই যেমন, আজ চত্বরে কাজ করেছি, কিংবা, একটা ঈগল দেখেছি, এরকম। জাহাজের লগবুকের মত অনেকটা।'

'অন্য জার্নালটাও একই রকম,' রবিন বলল।

'তারমানে, ঘটনার উল্লেখ খুব একটা কাজে লাগছে না আমাদের। তবে চিঠিতে বলেছেন বাওরাড, তাঁর নির্দেশ মেনে চলতে, আর শেষ দিনগুলো কিভাবে তৈরি করেছেন, সেটা মেনে চলতে। কি কি করেছেন তিনি, সেটার ওপর গুরুত্ব দিতে বলেননি নোরিয়াকে। বলেছেন, কোথায় গেছেন আর কি বানিয়েছেন, সেটা লক্ষ্য করতে।'

জার্নালের দিকে তাকাল এড। 'হ্যাঁ, প্রথমেই রয়েছে কোথায় গিয়ে কি করেছিল। লিখেছেঃ নোরিয়াকে চমকে দেয়ার পালা আজ থেকেই, কাজ শুরু করেছি। প্রথমে পাউডার গালচে গেছি লোক আর টিম্বার স্লুস জোগাড় করার জন্যে।'

'নিশ্চয় কিছু বানাতে!' মুসা বলল।

'মনে হয়,' বলল কিশোর ।'তারপর কি লিখেছে, এড?'

কয়েকটা পাতা ওল্টাল লাল-চুল ছেলেটা। 'দু'হপ্তা আর তেমন কিছু নেই। শুধু ছোট ছোট নোট। তারপর একটা দ্বীপে গেছে।'

'মিসেস ডাই?' কিশোর জিজ্ঞেস করল। 'নোরিয়াকে চমকে দেয়ার ব্যাপারটা কি, বলতে পারেন?'

'নাহ্।'

'থাক, এ-নিয়ে পরে ভাবব। লোক এবং টিম্বার স্লূস জোগাড়। কেন? এসব এলাকায় শুনেছি, একসময় খনি ছিল। খনির লোকেরা টিম্বার স্লূস দিয়ে আকরিক ছাঁকত। এড, ফ্যান্টম লেকের কাছে কোন খনি চেন?'

'না। সোনার খনির কথা বলছ?'

'হতে পারে,' মুসা আন্দাজ করল। 'গোপনে কোন খনিতে কাজ চালিয়েছে বাওরাড!'

'তা পারে,' বলল কিশোর। 'তবে আমার মনে হয় না, সেরকম কিছু বলতে চেয়েছেন তিনি। নির্দেশ অনুসরণ করতে বলেছেন। তারমানে, এমন কোথাও গিয়েছেন, যেখানে রয়েছে সূত্র। পাউডার গালচে যেতে হবে আমাদের, বুঝেছ।'

'পাউডার গালচ কি কাছাকাছিই নাকি?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

এড জানাল, 'হাইওয়ে ধরে গেলে বড়জোর এক মাইল।'

'আশ্চর্য, মুসা, তুমি জান না?' ভুরু কোঁচকাল কিশোর। 'বিখ্যাত জায়গা। লোকাল হিস্টরিতে জায়গাটার নাম রয়েছে। পড়েছি...'

'গোস্ট টাউন!' উত্তেজনায় চেয়ার চেড়ে উঠে পড়ল রবিন। 'পুরানো ভূতুড়ে শহর! তাই তো বলি, নামটা চেনা চেনা লাগে কেন?'

'ভূ-ভূতের শহর...!' ভয় দেখা দিল মুসার চোখের তারায়। 'আ-আমরা যাচ্ছি নাকি?'

'যেতে হবে,' উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'এখুনি।'

জীর্ণ, মলিন রোড-সাইনঃ পাউডার গালচ। তীর চিহ্ন নির্দেশ করছে সরু একটা কাঁচা সড়ক। সাইকেল চালিয়ে চলল চার কিশোর। মিনিট দশেক পরেই নিচে দেখা গেল গোস্ট টাউন।

ওপর থেকে দেখার জন্যে থামল ওরা। শুকনো খাঁড়ির পাড়ে ছড়িয়ে রয়েছে কতগুলো পুরানো, ভাঙা ছাউনি। পথের কিনার ঘেঁষে তৈরি হয়েছিল কিছু বাড়ি, বেশির ভাগই পাথরধসে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। কোনমতে দাঁড়িয়ে থাকা বড়

একটা বাড়ির কপালে সাইনবোর্ড রয়েছে, 'স্যালুন'। আরেকটাতে 'জেনারেল স্টোর'। কাত হয়ে যাওয়া একটা বাড়িতে লেখা, 'জেল'। একটা কামারশালা আর একটা আস্তাবল আছে। পথের শেষ মাথায় পর্বতের গায়ে মস্ত এক কালো ফোকর, খনির প্রবেশ মুখ। ওই খনির জন্যেই গড়ে উঠেছিল শহরটা।

'আঠারশো নব্বই সালে ফুরিয়ে আসে খনি,' কিশোর বলল। 'চলে যেতে শুরু করে লোকে। ততদিনে খাঁড়িও প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে।'

গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'একশো বছর পর এখানে কি খুঁজতে এসেছি আমরা, কিশোর?'

'জানি না, সেকেণ্ড। তবে আমি শিওর, নোরিয়াকে এখানে এসেই খুঁজতে বলেছেন বাওরাড। হয়ত এক-আধটা খবরের কাগজও বের হত তখন এখানে। খুঁজলে কয়েক সংখ্যা পাওয়াও যেতে পারে।'

'বলা যায় না, খবরের কাগজের মর্গও থাকতে পারে,' রবিন আশা করল।

মর্গের নামে চমকে উঠল মুসা। 'খাইছে! যে শহরে এসেছি, আমরাও না শেষে মর্গের বাসিন্দা হই!'

তার কথা কানে তুলল না কিশোর। বলল, 'এস, যাই।'

পুরানো শহরের পাশে এসে সাইকেল থামাল ওরা। তালা দেয়া বড় একটা ফটকের সামনে। উঁচু বেড়ায় ঘেরা পুরো শহরটা

'বেড়া দেখছ!' এড বলল। 'দেখ, ওই বিল্ডিঙের লেখাটাও নতুন। কেউ এসে বাস করতে আরম্ভ করেছে নাকি আবার?'

'কি জানি,' গাল চুলকাল কিশোর।

মিনিটখানেক অপেক্ষা করল ছেলেরা, কান পেতে রইল। কিন্তু নীরব হয়ে রইল পাউডার গালচ।

'বেড়া ডিঙিয়ে ঢুকতে হবে,' অবশেষে বলল কিশোর।

সাইকেল রেখে, বেড়া বেয়ে উঠতে শুরু করল ওরা। ওপাশে নেমে তাকাল ধুলো-ধূসরিত পথের দিকে।

'রবিন, মুসা,' কিশোর বলল। 'তোমরা বাঁয়ের বাড়িগুলোতে খুঁজবে। আমরা যাচ্ছি জেলখানা, আস্তাবল আর অন্য কয়েকটাবাড়ি খুঁজতে। খনির কাছে গিয়ে মিলিত হব। দেখা যাক, কিছু পাই কিনা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানিয়ে জেনারেল স্টোরে গিয়ে ঢুকল রবিন আর মুসা। পা টিপে টিপে ঢুকে থামল। দু'জনেই অবাক। একশো বছর আগে যেমন ছিল ঠিক তেমনই রয়েছে স্টোরটা। তাকে তাকে মাল বোঝাই। ময়দা আর শুকনো আপেলের পিপা, লোহার নানারকম জিনিস—হাতুড়ি, বাটালি, করাত, শাবল,

বেলচা, কুড়াল এসবই বেশি। চামড়ার জিন, আর আরও নানারকম জিনিস স্তূপ করে রাখা আছে মেঝেতে। দেয়ালে ঝোলানো পুরানো আমলের আগ্নেয়াস্ত্রগুলো ম্লান আলোতেও চমকাচ্ছে। লম্বা কাউন্টারটা চকচকে পালিশ করা, পরিষ্কার।

'কেউ থাকে এখানে!' রবিন বলল।

'কি-কিন্তু...,' তোতলাতে লাগল মুসা। 'নি-নিশ্চয় এ-যুগের কেউ নয়! জিনিসপত্র সব একশো বছর আগের মত...মানে, স্টোরটা এখন ভূতের দখলে!' ভয়ে ভয়ে চারপাশে তাকাল সে। যেন আশঙ্কা করছে, 'হ্যাল্লো, কেমন আছ?' বলে এখুনি বেরিয়ে আসবে ভূত।

রবিনেরও গা ছমছম করছে। ঢোক গিলল। 'হ্যাঁ, স্টোরটা যখন খোলা থাকত, এরকম সাজানোই থাকত বোধহয়। যেন...যেন এখনও খোলা...পোড়ো নয়! মুসা, কাউন্টারে দেখছ, পুরানো ধরনের একটা হিসেবের খাতা এখনও রয়েছে, যেন বেচা-কেনা চলছে!'

খুব সাবধানে কাউন্টারের কাছে এসে দাঁড়াল দু'জনে। খোলা পড়ে আছে খাতাটা। খদ্দেরের নাম লেখাঃ জিনিসের অর্ডার দিয়ে গেছে। অনেক দ্বিধা করে শেষে খাতাটায় আঙুল ছোঁয়াল রবিন। কাঁপা হাতে পাতা উল্টে চলল। নব্বইয়ের পরেও আরও কয়েক বছর টিকে ছিল এই শহর। ২৯ অক্টোবর, ১৮৯৬ সাল পাওয়া গেল। তার কাঁধের ওপর দিয়ে দেখে জোরে জোরে পড়ল মুসা, 'বাওরাড ডাই, ফ্যান্টম লেক—সাপোর্ট সহ ২০০ বোর্ড-ফুট স্লুস টিম্বার, ২ পিপা ময়দা, ১ পিপা গরুর মাংস, ৪ বাক্স শুকনো সীমের বীচি।' চোখ মিটমিট করল সে। 'খাইছে! কত লোকের জন্যে অর্ডার দিয়েছে?'

'অনেক লোক ভাড়া করেছিল নিশ্চয়। শ্রমিক। তাদের খাবার লাগবে না? আর কিছু চোখে পড়ছে, মুসা?' মাথা নাড়ল মুসা। 'দেখছি না।'

স্টোরের বাইরে বেরিয়ে হাঁপ ছাড়ল দু'জনে। এরপর ঢুকল স্যালুনে।

'আরি, এটা তো কম্যুনিটি সেন্টার ছিল মনে হচ্ছে,' রবিন বলল। 'লোকে একে অন্যের সঙ্গে দেখা করত এখানে, মেসেজ রেখে যেত। নিশ্চয় এখানে ঢুকেছিল বাওরাড।'

ঘরটা বড়, অন্ধকার। পেছনে একটা দরজা, শোবার ঘরে ঢোকার জন্যে। বাঁ ধারে কারুকাজ করা একটা পিয়ানো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চকচকে বারের ওপাশে সারি সারি মদের বোতল। পেছন দিকে গোল একটা টেবিলে কয়েকটা বোতল, গেলাসে ঢালা মদ, তাস ছড়িয়ে আছে, যেন এই খানিক আগে মদ খাওয়া আর তাস খেলা চলছিল।

'এ-এটাও তো স্টোরের মতই,' মুসার কণ্ঠে অস্বস্তি। 'যেন এইমাত্র ছিল খনির

শ্রমিকেরা, হঠাৎ উঠে চলে গেছে···।'

কথা শেষ হল না তার। অনেকগুলো কণ্ঠের মিলিত শব্দে ভরে উঠল ঘর। সীমান্ত এলাকার পুরানো গানের সুর বাজতে শুরু করল পিয়ানোতে। কিন্তু মানুষ-জন কাউকে চোখে পড়ল না। বোতল আর গেলাস ঠোকাঠুকির মৃদু টুংটাং পান করার শব্দ, মানুষের হুল্লোড় চলছে। পেছনে গোল টেবিলের কাছে জোরে শব্দ, আবছা একটা মূর্তি উঠে দাঁড়াল বলে মনে হল। 'চুপ! একচুল নড়বে না!' ধমক শোনা গেল।

সামান্য স্পষ্ট হল আবছা মূর্তিটা। দেখা গেল, দু'হাতে দুই পিস্তল।

'ভূ-ভূত!' চিৎকার করে উঠল মুসা। 'মেরে ফেলল রে, মেরে ফেলল! রবিন, দৌড় দাও!'

দৌড়াতে গিয়ে একজন আরেকজনের ওপর এসে পড়ল। ওদের কাণ্ড দেখেই বুঝি পেছনে হো হো করে হেসে উঠল লোকেরা। বেজেই চলেছে পিয়ানো। বাইরে গরম। পরোয়াই করল না দুই গোয়েন্দা। ধুলোয় ঢাকা পথ ধরে ছুটল খনির দিকে।

খনির ভেতরে লম্বা সুড়ঙ্গটা আলোকিত। ঢালু শ্যাফট ধরে ছুটল ওরা। সামনে দেখা গেল কিশোর আর এডকে।

'কিশোর!' চেঁচিয়ে ডাকল মুসা। 'আরেকটু হলেই ভূতে···!' এবারেও শেষ হল না তার কথা। দেখল, থমকে দাঁড়িয়ে গেছে কিশোর আর এড। দৃষ্টি সামনে। কিছু একটা ওদেরকেও অবাক করেছে।

রবিন আর মুসারও কানে এল বিচিত্র শব্দ। পানি পড়ছে, মেশিন চলছে, থেকে থেকেই বন্য কণ্ঠে হেসে উঠছে কোন পাগল! গুলি ফোটার বিকট আওয়াজ হল বদ্ধ সুড়ঙ্গে, কানের পাশ দিয়ে শিস কেটে বেরিয়ে গেল যেন বুলেট, গুলির শব্দ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল সুড়ঙ্গের ভেতর।

'কি হল, কিশোর?' ফিসফিসিয়ে বলল রবিন, জোরে বলতে ভয় পাচ্ছে।

ঢোক গিলল কিশোর। 'বুঝতে পারছি না!···ঢুকলাম···গুলি করল আমাদেরকে···লোকটা···'

লোকটাকে দেখতে পেল মুসা আর রবিন।

সুড়ঙ্গের আবছা অন্ধকারে বিশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে। রাইফেলের নল ওদের দিকে ফেরানো। দাড়িওয়ালা এক খনি-শ্রমিক। গায়ে লাল উলের শার্ট। পরনে হরিণের চামড়ার প্যান্ট। পায়ে গোড়ালি ঢাকা উঁচু চামড়ার বুট।

'চুরি করে যারা ঢোকে, তাদের কি করে তাড়াতে হয়, জানি আমরা!' খসখসে গলায় বলল লোকটা। হেসে উঠল খলখল করে। হাতের রাইফেল উঁচু করে আবার ট্রিগার টিপল।

আট

প্রচণ্ড শব্দ!

আবার গুলি করল লোকটা।

ছাই হয়ে গেছে মুসার চেহারা। আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। ককিয়ে উঠল, 'আমি···আমি কি···গুলি খেয়েছি?'

চোখ মেলল সে। অন্যদের অবস্থাও কমবেশি তারই মত।

'মিস্ করেছে!' রবিন বলল।

'আসলে···আসলে আমাদের ভয় দেখাতে চেয়েছে,' বলল এড।

আবার বুনো হাসি হেসে উঠল লোকটা। রাইফেল তুলে হুমকি দিল, 'চুরি করে যারা ঢোকে, তাদের কি করে তাড়াতে হয় , জানি আমরা!'

আবার টিপে দিল ট্রিগার। পর পর দুটো গুলির শব্দ কাঁপন তুলল সুড়ঙ্গের দেয়ালে।

'এবারও মিস্ করেছে!' চিৎকার করে বলল এড। সাহস করে লোকটার দিকে এক পা এগোল সে। 'কি ব্যাপার? আমাদের···'

'দাঁড়াও, এড,' ডাকল কিশোর। 'ভালমত দেখ সবাই। কি বলে শোন।'

লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে ওরা। খনির ভেতর থেকে এখনও ভেসে আসছে পানি পড়া আর মেশিন চলার আওয়াজ। দীর্ঘ এক মিনিট পর কট করে মৃদু একটা শব্দের পরই খড়খড় করে উঠল কিছু, সঙ্গে সঙ্গে বন্য হাসি হেসে রাইফেল তুলল লোকটা। একঘেয়ে কণ্ঠে বলল, 'চুরি করে যারা ঢোকে, তাদের কি করে তাড়াতে হয়, জানি আমরা!' টিপে দিল ট্রিগার। পর পর দু'বার।

'ওটা নকল মানুষ!' বলেই হাসতে শুরু করল কিশোর। 'যান্ত্রিক পুতুল। ভেতরে রেকর্ড করা ক্যাসেট ভরা। নানারকম শব্দের ব্যবস্থাও করা হয়েছে ক্যাসেটের সাহায্যেই। কায়দা করে বিশেষ বিশেষ জায়গায় বসিয়ে দিয়েছে স্পীকারগুলো।'

হঠাৎ কপালে চাপড় মারল রবিন। 'হায় হায়রে, গাধা বানিয়ে ছেড়েছে আমাদের! ইস্ আরও আগেই বোঝা উচিত ছিল। পেপারেই তো পড়েছি। পাউডার গালচের সংস্কার করে টুরিস্ট আকর্ষণের ব্যবস্থা করেছে। গড়ে তুলেছে পুরানো ওয়েস্টার্ন পরিবেশ। সে-জন্যেই চারপাশে বেড়া, গেটে তালা।'

'হুঁ,' তিক্তকণ্ঠে বলল কিশোর। ধোঁকা খেয়েছে বলে নিজের ওপরই বিরক্ত। 'আমিও পড়েছি। কিছুদিন আগে।'

এগিয়ে গিয়ে পুতুলটার মুখে হাত বোলাল মুসা। 'প্লাস্টিক। আসল না নকল বোঝাই যায় না। স্যালুনের ভূতটাও নিশ্চয় পুতুল। খোদা, কি জিনিস বানায় ওরা আজকাল!'

'হ্যাঁ, ভালই বানায়। খালি কথা বললে হবে না, আরও কাজ আছে। কোন সূত্র-টুত্র পাওয়া গেছে? কাজে লাগার মত?'

হিসেবের খাতাটার কথা জানাল রবিন। আর কি পরিমাণ খাবার কিনেছে বাওরাড ডাই।

'একজনের জন্যেও কিনতে পারেন। শুনে কিশোর বলল, অনেক দিন কোথাও থেকে কিছু বানানোর দরকার হলে। একটা ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে, নোরিয়াকে চমকে দেয়ার জন্যে যা বানিয়েছেন, বাওরাড, সেটা বড় রকমের কিছু। কিন্তু কি বানিয়েছেন, কোথায় বানিয়েছেন এখনও জানি না আমরা।' পাতলা জার্নালটা খুলল সে। 'ঊনত্রিশে অক্টোবর এমন কিছু লেখা নেই, যাতে কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায়।'

'স্যালুনে সূত্র খোঁজার সুযোগই পাইনি,' মুসা বলল।

'বেশ, তাহলে আবার যাব আমরা।' জার্নাল বন্ধ করল কিশোর। 'তারপর জেলখানায়। শেরিফের ফেলে যাওয়া রেকর্ড থাকতেও পারে। শেষে ঢুঁ মারব পত্রিকা অফিসে।'

ফিরে চলল ওরা। ঢোকার সময় তাড়াহুড়োয় খেয়াল করেনি রবিন আর মুসা। এখন দেখল ভালমত। ঠেলাগাড়ি, নানারকমের যন্ত্রপাতি, আরও একটা পুতুল—কালো দাড়িওয়ালা এক খনি-শ্রমিক, হাতে গাঁইতি।

'বাহ্, চমৎকার,' হেসে বলল মুসা। 'তখন এটা দেখলেও দৌড় পেতাম...।'

হাত থেকে গাঁইতি ফেলে দিল দাড়িওয়ালা। লাফিয়ে কিশোরের কাছে গিয়ে একটানে তার হাত থেকে জার্নালটা নিয়ে দৌড় দিল। বেরিয়ে গেল সুড়ঙ্গ থেকে।

'টিক বানাউ!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

এতই দ্রুত ঘটে গেছে ঘটনা, ক্ষণিকের জন্যে যেন পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল ওরা। রবিন চেঁচাতেই কিশোরও চিৎকার করে উঠল, 'নিয়ে গেল! ধর, ধর!'

ম্লান আলোকিত সুড়ঙ্গ ধরে ছুটল ওরা। বেরিয়ে এল কড়া রোদে। ভীষণ গরম।

'ওই যে ব্যাটা!' হাত তুলে দেখাল এড।

পথের শেষ মাথায় চলে গেছে বেঁটে নাবিক, এখনও দৌড়াচ্ছে।

'থাম! এইই, থাম, চোর কোথাকার!' মুসা চেঁচাল।

'আরে, থামছে না তো!' বলল এড। 'এই, এইই, থাম!'

ফিরে চেয়ে হাসল টিক। তারপর ছুটে গেল স্যালুনের দিকে। এই সময় দরজায় দেখা দিল একটা আবছা মূর্তি, দুই হাতে পিস্তল।

চমকে উঠল মুসা। 'সেই ভূতটা...।'

মূর্তিটাকে টিকও দেখেছে। সে-ও চিৎকার করে উঠল। পরক্ষণেই মোড় নিয়ে আরেকদিকে দৌড়াতে গেল। ঘোড়াকে পানি খাওয়ানোর একটা পুরানো গামলায় পা বেঁধে পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে। হাত থেকে উড়ে চলে গেল জার্নালটা। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে কোনমতে উঠে দাঁড়াল সে।

'ধর ব্যাটাকে!' মুসা বলল। 'ধর!'

ফিরে তাকাল ভূত। তারপর কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল, চোরটাকে ধরার জন্যে। পিস্তলে রোদ লেগে ঝিক করে উঠল। ধরা পড়ার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকল না টিক। বাড়িটার ধার দিয়ে আবার দৌড় দিল। বেড়ার কাছে পৌঁছে দেরি করল না এক মুহূর্ত। ওপরে চড়ে লাফ দিয়ে নামল ওপাশে। খাঁড়ির পাড়ে ওখানে ঘন ঝোপঝাড়, হারিয়ে যেতে অসুবিধে হবে না তার।

ভূতের কাছে ছুটে এল ছেলেরা। কালো ওয়েস্টার্ন পোশাক পরা একজন মানুষ। জার্নালটা তুলে নিল কিশোর।

'এখানে কি করছ তোমরা?' কৈফিয়ত তলব করল ভূতটা। 'জলদি সব খুলে বল। আর ওটা দাও,' জার্নালটার কথা বলল সে। 'নিশ্চয় এখানকার জিনিস।'

'না, স্যার,' মোলায়েম গলায় বলল কিশোর। 'জানতাম না এখানে কেউ আছে। তাহলে অনুমতি নিয়েই ঢুকতাম,' পাউডার গালচে বাওরাড ডাইয়ের গতিবিধির খবর নিতে এসেছে, জানাল সে। 'দারুণ হয়েছে আপনার ভূত ভূত খেলা! রীতিমত ভয় পাইয়ে দিয়েছেন।'

ভূত হাসল। 'প্র্যাকটিস করছিলাম। দেখতে চাইছিলাম, কি প্রতিক্রিয়া হয় তোমাদের। আমি এখানকার কেয়ারটেকার।' চোয়াল ডলল সে। 'বাওরাড ডাই, না? বোধহয় সাহায্য করতে পারব। পুরানো রেকর্ড আছে আমার অফিসে। বাওরাড ডাই এখানে তেমন কিছু করে থাকলে নিশ্চয় পাওয়া যাবে।'

স্যালুনের ভেতর দিয়ে এসে ছোট একটা অফিসে ঢুকল ওরা। একটা ফাইলিং ক্যাবিনেট খুলল কেয়ারটেকার 'এখানে আছে রেকর্ড। দেখা যাক, বুড়ো বাওরাড কি করেছে।'

একটা ফাইল খুলে, পড়ে, মাথা নাড়ল কেয়ারটেকার। 'না, তেমন কিছু নেই। শুধু দুটো রেফারেন্স। জেনারেল স্টোরে জিনিস কিনেছে, হিসেবের খাতায় তোমরা যা দেখেছ। আর দৈনিক গালচ-এ দুই লাইনের একটা নোসিশ, আঠারশো ছিয়ানব্বই সালে, কয়েকদিনের জন্যে কিছু শ্রমিক চেয়েছে। ব্যস।'

'এইই?' নিরাশ হল মুসা। 'দূর! এত কষ্ট করে কোন লাভ হল না...'
বাইরে ডাক শোনা গেল, 'এই, কোথায় গেলে তোমরা?...এড? এডবার... আই, ছেলেরা...?'
'ডিনো,' এড বলল।
দ্রুত বেরিয়ে এল ছেলেরা। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে ডিনো, সঙ্গে আরেক লোক। হিসটোরিক্যাল সোসাইটির সেই প্রফেসর, হারম্যান কেইন।
ছেলেদের দেখে এগিয়ে এলেন তিনি। 'গেটের বাইরে দেখা হল ডিনাম্যান হ্যাংবারের সঙ্গে। বললেন, তোমরা এখানে এসেছ। এসে তোমাদের সাইকেল পড়ে থাকতে দেখলাম। ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, তোমাদের কিছু হয়েছে ভেবে...।'
'বিনা অনুমতিতে ঢুকেছ?' ডিনো বলে উঠল। 'জানতাম, গোলমাল বাধাবে। সে-জন্যেই তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছি।'
'না, কিছু হয়নি ওদের,' কেয়ারটেকার বলল। 'তবে বেশ উত্তেজনার মধ্যে ছিল, আমাদের কাজ দেখে। তাই না, ছেলেরা? প্রফেসরকে জানাও সেকথা। খুশি হবেন। আমাদের হিসটোরিক্যাল অ্যাডভাইজার তিনি। নতুন করে আবার সব সাজাতে সাহায্য করেছেন সোসাইটি।'
'শুনব, শুনব সব, পরে,' হাত তুললেন প্রফেসর। রিমলেস চশমার ওপাশে উজ্জ্বল হল তাঁর চোখ। কেয়ারটেকারের উদ্দেশে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে ছেলেদের নিয়ে রওনা হলেন ওয়েস্টার্ন শহরের পথ ধরে। 'বাওরাড ডাইয়ের আরেকটা জার্নাল নাকি পেয়েছ তোমরা? গুপ্তধন সত্যি আছে ভাবছ নাকি? পাওয়া গেলে কি সাংঘাতিক ব্যাপার হবে। বল, জলদি খুলে বল সব।'
কিভাবে জার্নালটা পাওয়া গেছে, জানাল কিশোর। টিক বানাউয়ের কথাও বলল।
লাল হয়ে গেল প্রফেসরের লাল মুখ। 'ওই শয়তানটা? টিক বানাউ। ডাইয়ের গুপ্তধন চুরির মতলব করেছে? নিয়ে গিয়ে নিশ্চয় গলিয়ে ফেলবে সমস্ত সোনার অলঙ্কার। নষ্ট করে ফেলবে! মানুষ নাকি ও? এত মূল্যবান ঐতিহাসিক জিনিসপত্র নষ্ট করে! আরিব্বাপরে, ভাবতেই রোম খাড়া হয়ে যায়—ঈস্ট ইনডিয়ান জলদস্যুদের লুটের মাল! বিখ্যাত হয়ে যাবে আমাদের সোসাইটির মিউজিয়ম। তা কোন সূত্রে পেলে?'
'না, বেশি কিছু না,' দ্বিধা করছে কিশোর। 'শুধু জেনেছি, স্ত্রীর জন্যে বড় কিছু একটা বানিয়ে গেছে বাওরাড ডাই।'
'হুঁ। এখানে নয় নিশ্চয়? ফ্যান্টম লেকে না তো? এই এলাকার অনেক জায়গাই চিনি আমি। তোমাদের চোখে না পড়লেও হয়ত আমার চোখে পড়বে।'

একটা স্টেশন ওয়াগন দেখিয়ে বললেন প্রফেসর, 'যাও, সাইকেলগুলো আমার গাড়িতে তোল। ফ্যান্টম লেকে যাব আমরা। কিছুতেই টিক বানাউকে নিতে দেব না গুপ্তধন।'

আরেক দিকে মুখ ফেরাল ডিনো। বিড়বিড় করল, 'আরেকটা বেকুব।'

'কী? কি বললেন?' কথাটা শুনে ফেলেছেন প্রফেসর। 'বেকুব আমি, না আপনি? এসবের কি কচুটা জানেন আপনি? আপনি কোথাকার বুদ্ধিমান? এই, যাও তোমরা, সাইকেল তোল।'

ডিনোর চেহারা দেখে ফিক করে হেসে ফেলল মুসা। ছুটল সাইকেল আনার জন্যে।

নয়

শেষ বিকেল। আগে আগে চলেছেন প্রফেসর, পেছনে ছেলেরা। উপত্যকার প্রতিটি ফুট পরীক্ষা করে দেখে এসেছে ওরা, ছোট পাহাড়টারও অর্ধেকটা। সম্ভাব্য সমস্ত দিক থেকে খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে পুকুরটাকে, ফ্যান্টম লেক। উত্তেজিত প্রফেসরের সঙ্গে প্রায় দৌড়ে দৌড়ে তিনবার চক্কর দিয়েছে ওরা পুরো বাড়িটা। পরিশ্রম অনেক করেছে, কিন্তু পায়নি কিছুই।

বিশাল বাড়িটার চত্বরে এখন পড়ন্ত রোদ। সেখানে এসে জমায়েত হল সবাই। হেসে ওদের সান্ত্বনা দিলেন মিসেস ডাই। বাঁকা হাসল ডিনো, দাঁতের ফাঁকে পাইপ, ফক ফক ধোঁয়া ছাড়ছে।

'কিছুই পেলাম না,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন প্রফেসর। 'বাড়িটা ছাড়া বড় কিচ্ছু বানায়নি বাওরাড ডাই। আর এখানে খোঁজা হয়েছে প্রায় একশো বছর ধরে।' মাথা নাড়লেন তিনি। 'সূস টিম্বারের চিহ্নও দেখলাম না।'

হেসে উঠল ডিনো, খুব মজা পাচ্ছে যেন। 'বলেছিলাম না, বেকুব। তখন তো রেগে গেলেন। টিম্বার দিয়ে বুড়ো কিছু বানিয়ে থাকলেও নেই এতদিন, নষ্ট হয়ে গেছে কবেই। আর গুপ্তধন? ঘোড়ার ডিম আছে।'

'আছে। এবং বেরও করব আমরা!' রেগে গেল শান্ত রবিন। সে-ও লোকটাকে সহ্য করতে পারছে না।

'নিশ্চয়ই করবে,' প্রেরণা জোগালেন মিসেস ডাই। তিরস্কারের ভঙ্গিতে তাকালেন ডিনোর দিকে। 'সোনার মোহর কিংবা হীরের গহনা না পেলেই বা কি? এমন কিছু পাওয়া যেতে পারে, যার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।'

'মা,' এড বলল। 'মনে হচ্ছে গুপ্তধন আছে তুমিও বিশ্বাস কর না?'

এসব কথায় কান নেই কিশোরের। বাওরাড ডাইয়ের চিঠিটা আবার পড়ছে। 'ইস্, আর একটু যদি বুঝতে পারতাম। আমি শিওর, চাবি কোথাও আছেই। আসলে, সময় পেরিয়ে গেছে অনেক। হয়ত নষ্ট হয়ে গেছে সূত্র।' তারপর যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, বাড়িতে কি ভালবাসতেন বাওরাড?'

মাথা নাড়লেন মিসেস ডাই। 'তোমরা যখন পাউডার গালচে, আমিও বসে থাকিনি। নোরিয়ার অনেক চিঠি বের করে পড়েছি। আগেও পড়েছি, আবার পড়লাম। লেখা আছে অনেক কথাই। কিন্তু স্কটল্যাণ্ডে কি ভালবাসতেন বাওরাড, সে-সম্পর্কে তেমন কিছু নেই। হ্রদের দৃশ্য দারুণ ভালবাসতেন, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শুধুই একথা।'

'ওটা এমন কোন ব্যাপার না,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন প্রফেসর।

'জটিল সমস্যা,' আনমনে বলল কিশোর।

শঙ্কিত হল এড। 'খোঁজা বাদ দেবে না তো, কিশোর?'

'বাদ?' মুচকি হাসল মুসা। 'কিশোর পাশাকে তুমি চেন না, এডবার ডাই। তদন্ত তো সবে শুরু করেছে ও।'

'বাদ দিলেও তোমাদের দোষ দেব না আমি,' বললেন মিসেস ডাই।

'বাদ দেয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না,' মুখ খুলল কিশোর। 'প্রথম ধাপে রয়েছি আমরা, বাওরাড এখনও বলেননি কোথায় খুঁজতে হবে।' জার্নালটা খুলল সে। 'ঊনত্রিশ অক্টোবরের পরে, যেটাতে কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে, সেটা নভেম্বর এগার। লিখেছেনঃ সাইপ্রেসের দ্বীপে গিয়েছিলাম আজ। নৌকা বোঝাই ছিল। আরেকটু হলেই গিয়েছিল ডুবে, দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে আসা ঝড়ে, এমনই ফুঁসে উঠেছিল সাগর। আমার প্রস্তাবে রাজি হয়েছে দ্বীপের মালিক। দুপুরের দিকে সন্তুষ্ট হয়ে বাড়ি ফিরে এসেছি আমি। নোরিয়ার উপহারের কাজ ভালই এগোচ্ছে।' মুখ তুলল গোয়েন্দাপ্রধান। 'পরের হপ্তায় আর বিশেষ কিছু নেই।'

'কিশোর,' মুসা বলল। 'লিখেছে, নৌকা বোঝাই ছিল।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'দ্বীপেই হয়ত রয়েছে জবাব।'

'কিন্তু,' বলল এড। 'কোথায় ওটা? এখানে সাইপ্রেসের দ্বীপ আছে বলে তো শুনিনি?'

'আমিও না,' কিশোর বলল। 'মুসা, তুমি জান?'

রকি বীচের আশপাশের সাগর সম্পর্কে ভাল জ্ঞান মুসার। সাগর, সাঁতার, নৌকা বাওয়া খুব পছন্দ করে। হাত বাড়িয়ে জার্নালটা নিল সে। 'আমার মনে হয় না ওটা আসল নাম। হয়ত কোন নামই নেই, সে-জনেই ওই নাম রেখেছে। চ্যানেল আইল্যাণ্ডস-এর বড় বড় সমস্ত দ্বীপের নাম আছে, এটার নেই যখন, নিশ্চয়

খুব ছোট। উপকূলের কাছেই কোথাও হবে। নইলে সকালে গিয়ে দুপুরের আগে ফিরে আসতে পারত না বাওরাড ডাই। ব্যক্তিগত সম্পত্তি তো বললই, আর দ্বীপটায় সাইপ্রেস গাছ আছে। খুঁজে দেখা দরকার।'

'আমিও যাব,' বলে উঠলেন প্রফেসর। 'ছোট একটা সেইলিং বোট আছে আমার। রকি বীচ থেকে বেশি দূরে না হলে ওটা নিয়েই যাওয়া যায়।'

উঠে দাঁড়াল ডিনো। 'গুজব, ভূত, নাম ছাড়া দ্বীপ, একশো বছর আগে মরে যাওয়া একজন মানুষ···পাগল···সব উন্মাদ হয়ে গেছে।' গটমট করে বেরিয়ে গেল স্কটসম্যান।

সেদিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন মিসেস ডাই, হাসলেন। প্রফেসরের দিকে চেয়ে বললেন, 'ওর ব্যবহারে কিছু মনে করবেন না। ও একটু বদমেজাজী। অবাস্তব কথা সইতে পারে না। তবে লোক খারাপ না, ভাল। এডের বাবা মারা যাওয়ার পর কি কষ্টে যে দিন কাটছিল আমাদের, ডিনো আসাতে খানিকটা সহজ হয়েছে। ভীষণ খাটতে পারে। আগে অবশ্য মেজাজ এত খারাপ ছিল না তার। বাইরে থেকে আসার পর এমন হয়েছে।'

'বাইরে?' কথাটা ধরল কিশোর। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। 'কোথায় গিয়েছিল?'

'সান্তা বারবারায়। অ্যাভোকাডো বেচতে গিয়েছিল। তিনদিন পর কাল রাতে ফিরেছে।'

মেঘ জমল কিশোরের চেহারায়। 'ও আপনার কেমন আত্মীয়, মিসেস ডাই? মাত্র এক বছর হল এসেছে বললেন না?'

'স্কটল্যাণ্ড থেকে এসেছে। আমার স্বামীর দূর সম্পর্কের খালাতো ভাই, সেই সম্পর্কে আমারও। বছরখানেক আগে আমাদের এখানে বেড়াতে এসেছিল। এসে দেখে এডের বাবা নেই। সাহায্য করতে চাইল। আমার তখন অবস্থা খারাপ। রাজি হয়ে গেলাম। আমাদের জন্যে ওর খুব মায়া। এত যে খাটে, কাজের জন্যে একটা পয়সা নেয় না। থাকা আর খাওয়া, ব্যস।'

উঠে দাঁড়াল কিশোর। রবিন আর মুসাকেও ওঠার ইঙ্গিত করে বলল, 'দেরি হয়ে গেছে। চলি, ম্যাডাম। বাড়ি যাব।'

'চল, পৌঁছে দেব,' বললেন প্রফেসর।

শাখাপথ থেকে বেরিয়ে হাইওয়েতে উঠল স্টেশন ওয়াগন।

'প্রফেসর,' হঠাৎ কথা বলল কিশোর। 'একটা ব্যাপার অবাক লাগছে। আচ্ছা বলুন তো, চিঠি আর ডাইদের সম্পর্কে এত কথা জানল কি করে টিক বানাউ?'

'বলতে পারব না। গুপ্তধনের জোর গুজব রয়েছে, অনেকেই জানে। কিন্তু টিক বানাউয়ের কথা যা শুনলাম, তাকে স্থানীয় লোক মনে হচ্ছে না। কে জানে, লিটল

মারমেইডের বেঁচে যাওয়া অন্য কোন নাবিকের বংশধর হতে পারে। ক্যাপ্টেনের কেউ হলেও অবাক হব না।'

'ঠিক,' রবিন বলল। 'এটাই ব্যাখ্যা।'

'হতে পারে,' ধীরে ধীরে বলল কিশোর।

ডিনারের আধ ঘন্টা আগে স্যালভিজ ইয়ার্ডে ছেলেদের নামিয়ে দিয়ে গেলেন প্রফেসর।

দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে হেডকোয়ার্টারে ঢুকল ওরা।

'কিশোর, ভাবছি,' মুসা বলল। 'ফ্যান্টম লেকেই কোন খনি রেখে যায়নি তো বাওরাড ডাই? গোপন খনি?'

'থাকতেও পারে। হাতে কোন প্রমাণ নেই, শিওর হই কি করে? আর স্কটল্যাণ্ডের ভূতের গুজবের সঙ্গে খনির যোগাযোগ কোথায়? কিংবা আয়নার?'

রবিন মনে করিয়ে দিল, 'মিসেস ডাই বললেন, ভাইকিংরা আসে কিনা সেদিকে নাকি চোখ রাখে ভূত। ওই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছে হয়ত বাওরাড। হ্রদের দিকে চেয়ে থাকা ভূত। মানে কি? পুকুরের নিচে লুকিয়ে রাখেনি তো গুপ্তধন?'

'রাখতে পারে,' কিশোর বলল। 'তবে তার জন্যেও প্রমাণ চাই। নির্ভরযোগ্য সূত্র। কোথায় রেখেছে, জানতে হলে। সারা পুকুরের তলায় তো আর খোঁজা যাবে না।' থামল এক মুহূর্ত। 'ডিনোর কথা মিসেস ডাই কি বললেন মনে আছে?'

'আছে,' বলল মুসা। 'খুব খাটতে পারে, আর খুব মায়া। কাজের বিনিময়ে একটা পয়সা নেয় না।'

'তবে কিছুটা বদমেজাজী,' যোগ করল রবিন। 'চমৎকার সব লক্ষণ।'

'এবং,' কিশোর বলল। 'ফ্যান্টম লেক থেকে তিনদিনের জন্যে বাইরে চলে গিয়েছিল, ফিরেছে কাল রাতে। তারমানে, গতকাল তার রকি বীচে থাকা সম্ভব, যখন টিক আমাদের ওপর হামলা চালিয়েছিল।'

'টিকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গুপ্তধন খুঁজছে ভাবছ?' রবিন বলল। 'বাওরাডের চিঠির কথা, ফ্যান্টম লেক, মিসেস ডাই কি কি জিনিস বিক্রি করেছেন, সব জানা আছে ডিনোর।'

'হ্যাঁ, আছে। মুসা, আজ রাতের মধ্যে সাইপ্রেস আইল্যাণ্ডটা কোন দ্বীপ, জানার চেষ্টা করবে। কাল সকালে প্রফেসর কেইনের বোটে মিলিত হব আমরা।'

ডিনারের পর চাচা-চাচীকে ঘরের কাজে সাহায্য করল কিশোর। দশটায় বাজল টেলিফোন।

মুসা করেছে। বলল, 'কিশোর, ওটা আসলে ক্যাবরিলো আইল্যাণ্ড। আঠারশো ছিয়ানব্বই সালে দ্বীপটা ক্যাবরিলো পরিবারের দখলে ছিল। সাইপ্রেস গাছের ছড়াছড়ি। তীর থেকে মাত্র মাইলখানেক দূরে। বন্দর থেকে মাইল দুই উত্তরে।'

'চমৎকার কাজ দেখিয়েছ, সেকেণ্ড!' দুর্লভ প্রশংসা পেল মুসা, কিশোর পাশা সহজে কারও প্রশংসা করে না।

রিসিভার রেখে দোতলায় নিজের ঘরে চলে এল কিশোর। আলো জ্বালার আগে একবার সামনের জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। রকি বীচে ক্রিস্টমাস লাইট দেখার জন্যে। অনেক বাড়িতেই জ্বলছে রঙিন আলো।

সরে আসতে যাবে, এই সময় আলোর একটা ঝিলিক চোখে পড়ল তার। তাকাল সেদিকে। আবার দেখা গেল আলো। অবাক হল সে। ওখানে তো কোন বাড়িঘর নেই? হঠাৎ বুঝল, তাদের স্যালভিজ ইয়ার্ডের ভেতরেই। যেখানটায় ওদের হেডকোয়ার্টার লুকানো রয়েছে জঞ্জালের তলায়।

আলোটা আসছে ট্রেলারের স্কাইলাইটের ফোকর দিয়ে!

তাড়াতাড়ি নিচে নামল কিশোর। বাইরে বেরিয়ে নিঃশব্দে এগোল। মেইন গেট বন্ধ। তালা দেয়া। মোড় নিয়ে ওয়ার্কশপের দিকে চলল সে। এখানে আরেকটা গোপন প্রবেশ পথ রয়েছে তিন গোয়েন্দার, সবুজ রঙ করা বেড়ার গায়ে দুটো আলগা বোর্ড।

সাবধানে সবুজ ফটক একের ভেতর দিয়ে ওয়ার্কশপে ঢুকল কিশোর। আলো আর চোখে পড়ছে না এখন। দুই সুড়ঙ্গের কাছেও কেউ নেই। সহজ তিন-এর সামনে থেকে খুব সতর্ক ভাবে কিছু জঞ্জাল সরাল।

পুরানো কাঠের দরজার পাল্লা ভেঙে খোলা হয়েছে। তার ওপাশে হাঁ হয়ে খুলে আছে ট্রেলারের দরজা।

হেডকোয়ার্টারে ঢুকল কিশোর। বাওরাড ডাইয়ের জার্নালটা ডেস্কের ওপরই আছে, তবে বন্ধ নয়, খোলা। তীব্র আলোর ঝিলিকের মানে বুঝে ফেলল। দরজা ভেঙে ঢুকে জার্নালটার ছবি তুলে নিয়ে গেছে কেউ। ফ্ল্যাশগানের আলো দেখেছে সে।

সহজ তিন-এর দরজা আবার ঠিকঠাক করে লাগিয়ে ঘরে ফিরে এল কিশোর। চিন্তিত। এখন আরও একজনের জানা হয়ে গেল, কি লেখা রয়েছে বাওরাডের দ্বিতীয় জার্নালে।

দশ

রকি বীচ বন্দরের ওপর কুয়াশা যেন ঝুলে রয়েছে। সাইকেল চালিয়ে এসে দেখল তিন গোয়েন্দা, হাজির রয়েছে এড, ওদেরই অপেক্ষা করছে। সাইকেল তুলে নিয়েছে প্রফেসরের বোটে। আঠাল ঠাণ্ডা গায়ে কাঁপুনি তুলে দিয়েছে তার।

তিন গোয়েন্দাকে দেখে হাসল এড। 'সারারাত ধরে ভেবেছি, বুঝেছ। আমি শিওর, নৌকা বোঝাই করে গুপ্তধনই নিয়ে গিয়েছিল বাওরাড ডাই। আমার ধারণা, আজ দ্বীপে গেলেই পেয়ে যাব।'

'আমি তা মনে করতে পারছি না, এড,' কিশোর বলল। 'এত…'

ইঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল। তীরের কাছে এসে ঘ্যাচ করে ব্রেক কষল স্টেশন ওয়াগন। লাফিয়ে নেমে প্রায় ছুটে এলেন প্রফেসর। 'সরি, বয়েজ, দেরি হয়ে গেল। আজ সকালে একটা গণ্ডগোল হয়েছে হিসটোরিক্যাল সোসাইটিতে। লিটল মারমেইডের ফাইল চুরির চেষ্টা হয়েছিল। কালো দাড়িওয়ালা এক লোক।'

'টিক ব্রাউন!' একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল রবিন আর মুসা।

মাথা ঝাঁকালেন প্রফেসর। 'আমারও তাই মনে হয়।'

'কিন্তু কেন?' এডের জিজ্ঞাসা। 'লিটল মারমেইডের ইতিহাস তো সবাই জানে।'

'হয়ত সবার চোখেই কিছু এড়িয়ে গেছে,' অনুমান করল কিশোর। স্যালভিজ ইয়ার্ডেও যে চোর এসেছিল, জানাল সবাইকে।

চমকে উঠলেন প্রফেসর, 'জার্নালও তাহলে পেয়ে গেছে টিক! চোরটা হয়ত ইতিমধ্যেই রওনা হয়ে গেছে, আমাদের আগেই গিয়ে হাজির হবে দ্বীপে।' সাগরের ওপরের কুয়াশার দিকে তাকালেন তিনি। 'কিন্তু এই আবহাওয়ায় কি আমরা যেতে পারব?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'তীরের কাছে ঘন বটে, তবে আমার ধারণা, যতই দূরে যাব পাতলা হয়ে যাবে কুয়াশা। এসময়ে এখানটায় কুয়াশা কিছু বেশিই থাকে, জানেনই তো। আর অসুবিধে কি? যথেষ্ট বড় আপনার বোট।'

'চল তাহলে। তাড়াতাড়ি করতে হবে।'

পঁচিশ ফুট লম্বা সুন্দর একটা সেইলিং বোট। উঠল সবাই। অকজিলারি ইঞ্জিন স্টার্ট দিলেন প্রফেসর। দ্রুত তীরের কাছ থেকে সরে এল বোট। হাল ধরল মুসা, কোর্স সেট করল উত্তরে। ছেলেদের নিয়ে কেবিনে গাদাগাদি করে বসলেন প্রফেসর। প্রচণ্ড শীত। ভারি সোয়েটারেও বাগ মানছে না ডিসেম্বরের কনকনে

ঠাণ্ডা।

'দ্বীপটা ছোট,' মুসা বলল। 'খুব সুন্দর। এখন পরিত্যক্ত। চমৎকার একটা গুহাও আছে।'

বাতাস কম, পাল তুলে লাভ নেই। তাই ইঞ্জিনের ওপরই ভরসা করল মুসা। নিচে কেবিনেই রয়েছে অন্যেরা, তাদেরকে বলল সে, 'ওই যে, দেখা যাচ্ছে।'

সামনে, প্রায় মাইলখানেক দূরে কুয়াশার ভেতর মাথা তুলেছে দ্বীপটা, যেন সাগর থেকে উঠে এসেছে কালো কিম্ভূত এক দানব। আরও কাছে এগোলে চোখে পড়ল গাছ, রাশি রাশি সাইপ্রেস। পেছনের দুটো পাহাড় চূড়ার একটাকে ছাড়িয়ে উঠেছে লম্বা চিমনি। জনহীন, পাথুরে এলাকা। তার ওপাশে আকাশ থেকে সাগরে নেমে গেছে যেন কুয়াশার ভারি চাদর।

দক্ষ হাতে হুইল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটা খাঁড়ির ভেতরে বোট ঢোকাল মুসা। পুরানো কাঠের জেটিতে বাঁধল। হুড়াহুড়ি করে নামল সবাই। দেখতে লাগল জনমানবশূন্য পাথুরে দ্বীপটা। যেখানে সেখানে জন্মে রয়েছে বুড়ো সাইপ্রেস, ওগুলোর মাঝের খোলা জায়গা দখল করে নিয়েছে ঘন ঝোপঝাড়। ক্রমাগত ঝড়ো বাতাসের কারণে বিচিত্র ভঙ্গিতে বেঁকে গিয়েছে বড় বড় গাছগুলো।

'সর্বনাশ!' হতাশ কণ্ঠে বলল রবিন। 'বুড়ো বাওরাড এখানেই যদি গুপ্তধন লুকিয়ে থাকে, কি করে বের করব? যেখানে খুশি থাকতে পারে। শত বছর খোঁড়াখুঁড়ি করলেও খুঁজে পাব না।'

'না, রবিন,' কিশোর বলল। 'কাল রাতে অনেক ভেবেছি এসব নিয়ে। আমার ধারণা, মাটির তলায় গুপ্তধন লুকাননি বাওরাড। কারণ, তিনি জানতেন, লিটল মারমেইডের ক্যাপ্টেন তাঁর পিছু নিয়েছে। সদ্য খোঁড়া মাটি তার নজরে পড়ে যেতে পারে। যে কারই চোখে পড়তে পারে। তাছাড়া, তিনি চেয়েছেন, সহজেই যাতে খুঁজে বের করতে পারে নোরিয়া। মাটিতে পুঁতে রাখলে সেদিক থেকেও অসুবিধে। খুব তাড়াতাড়িই নতুন মাটি পুরানো মাটির সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায়, আলাদা করে চেনা মুশকিল হয়ে পড়ে।' মাথা নাড়ল সে। 'না, ওরকম জায়গায় লুকাননি। আর যেখানেই লুকিয়েছেন, স্পষ্ট চিহ্ন দিয়ে রেখেছেন, দীর্ঘদিনেও যা নষ্ট হবার নয়। কারণ তিনি শিওর ছিলেন না, ধাঁধার মানে বুঝে গুপ্তধন বের করতে কতদিন লাগবে তাঁর স্ত্রীর।'

'এই দ্বীপে কিছু বানিয়ে যায়নি তো বাওরাড?' এড বলল। 'নোরিয়াকে চমকে দেয়ার জন্যে হয়ত জায়গা কিনে কিছু বানিয়েছে।'

'সেকথাও ভেবেছি। কাঠ দিয়ে তৈরি জিনিসের দিকে চোখ রাখতে হবে আমাদের। আর, ডাইদের চিহ্ন বহন করে এমন কিছু।'

'চিঠিতে বলেছেন, তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করতে,' রবিন বলল। 'তাঁর দিনগুলো কিভাবে তৈরি হয়েছে পড়ার জন্যে। ভূত আর আয়নার কথা বলেছেন। ইঙ্গিত আর চিহ্ন বোধহয় ওগুলোই।'

'ঠিক,' একমত হল কিশোর। 'জার্নালে উল্লেখ আছে, এই দ্বীপের মালিকের কাছে একটা প্রস্তাব দিয়েছেন বাওরাড, হয়ত কোন জিনিস লুকানোর অনুমতি চেয়েছেন। কাজেই, ওই চিমনিওয়ালা বাড়িটা থেকে খোঁজা শুরু করব। রেকর্ড থাকতে পারে ওখানে।

পাহাড়ে চড়ল ওরা। চূড়ার কাছে একটা ছোট গুহামত রয়েছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় তাতে আশ্রয় নেয়া চলে। কাছাকাছি খানিকটা সমতল জায়গা। বিশাল চিমনি মাথা তুলেছে ওখান থেকেই। পাথরের মস্ত ফায়ারপ্লেস আছে, পাথরের চুলা আছে, চারপাশে পাথরের ছড়াছড়ি, কিন্তু বাড়ি নেই। বড় বড় পাথরের চাঙড় চাড় দিয়ে তুলে ফেলা হয়েছিল, বোঝা যায়, জায়গামত রেখে দেয়া হয়েছে আবার।

ওগুলো দেখে বলে উঠলেন প্রফেসর, 'কেউ এসে দেখে গেছে আমাদের আগেই। বেশিক্ষণ হয়নি।'

অস্বস্তিতে ভুগতে শুরু করল ওরা। বার বার তাকাচ্ছে বাঁকাচোরা সাইপ্রেস বনের দিকে, নির্জন পাহাড়ের চূড়া আর ঢালের দিকে। কেউ নেই। শুধুই কুয়াশা, যেন ঝরে পড়ছে পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়াটে মেঘ।

'দেখি তো, কি আছে ওটার তলায়,' বলে একটা চাঙড়ের দিকে এগোল রবিন। সে আর মুসা মিলে সরিয়ে ফেলল ওটা। শূন্য গর্তটার দিকে তাকাল সবাই।

'কিচ্ছু নেই,' বলল মুসা। 'থাকার কথাও না অবশ্য। বিশেষ করে লোকটা এসে দেখে যাওয়ার পর।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল কিশোর। 'চুলার ভেতরেও খুঁজেছে। নিচেও। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে চারপাশ থেকে মাটি সরিয়েছে, দেখেছ।'

'কিন্তু খাঁড়িতে তো আর কোন নৌকা দেখলাম না। তবে ছোট একটা সৈকত আছে ওধারে।'

'চল, ছড়িয়ে পড়ে খোঁজা শুরু করি ওকে,' প্রস্তাব দিলেন প্রফেসর। 'আমি মাঝে থাকছি। তোমরা চারজন চার দিকে যাও। খুব সতর্ক থাকবে। কিছু দেখলে জোরে ডাকবে।'

'নতুন বা আকর্ষণীয় কোন চিহ্ন দেখলেও জানাবে,' কিশোর বলল। 'কোন গুহা, পাথরের স্তূপ, পাথরে বা পাহাড়ে খোদাই করা কোন নকশা…কি বলছি,

বুঝেছ?'

নার্ভাস ভঙ্গিতে মাথা দোলাল অন্য তিনজন। রওনা হয়ে গেল একেকজন একেক দিকে। কুয়াশা ঘন হতে আরম্ভ করেছে। এডের চোখে আবছা হয়ে এল মুসার মূর্তি, দ্বীপের বাঁ ধারে চলে এসেছে সে। অন্য তিনজন কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না এখন কুয়াশার জন্যে।

এড এসেছে পশ্চিমধারে, পাহাড়ের গোড়ায়, দ্বীপের এই ধারটা বেশি উঁচু। বাঁয়ে সাগরের ওপর কুয়াশা খুবই ঘন। কুয়াশার একটা মেঘ ভেসে এসে ঘিরে ফেলল তাকে, ফলে মুসাকেও দেখতে পেল না আর। ভীষণ অস্বস্তি লাগছে তার, বুক কাঁপছে। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, কান খাড়া। সামনে কিছু দেখা যায় না। অন্ধের মত পা বাড়াতে গিয়ে পড়ে গেল সে। পাথরের ধস সৃষ্টি করে গড়িয়ে পড়তে লাগল ঢাল বেয়ে।

ব্যথা লাগতে আঁউক করে উঠল। বাড়ি লেগেছে কোন কিছুতে, পাথরেই হবে। উঠে বসল। এই সময় চোখে পড়ল ওটা।

ভূতুড়ে একটা মূর্তি, ঢালে দাঁড়িয়ে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। কালো মূর্তি, পিঠে কুঁজ, ছুঁচালো কুৎসিত মুখ, বাঁকা নাক, বড় বড় চোখ।

'ভূত! ভূত!' চিৎকার করে উঠল এড। 'বাঁচাও!'

নড়ে উঠল ভূত। লম্বা হাত বাড়িয়ে দিল যেন এডকে ধরার জন্যে।

এগার

দৌড়ে এল সবাই। চোখ বন্ধ করে চিৎকার করছে এড। ইতিমধ্যে পাতলা হয়ে গেছে কুয়াশা। রবিন বলল, 'ভূত দেখলে কোথায়? ওটা তো গাছ।'

চোখ মেলল এড। সত্যিই। কুঁজো ভূতটা একটা বাঁকা সাইপ্রেস। ডালগুলো কাণ্ডের দু'পাশে এমনভাবে বেঁকে আছে, যেন হাত। তার ওপরে অনেকখানি গায়েব, ছিঁড়ে নিয়ে গেছে ঝড়। কাণ্ডের ছেঁড়া, মোচড়ানো অংশটাকে মাথার মত দেখাচ্ছে, তাতে বড় একটা ছিদ্র—কুয়াশার কারণে মনে হয়েছিল, চোখ নড়ছে।

'গাছ!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল এড। 'আমি ভেবেছি ভূত।'

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, 'ভূতই ওটা! বুঝতে পারছ না? বাওরাড ডাইয়ের চিহ্ন।'

'চিহ্ন?' মুসা বুঝতে পারল না।

'ঠিক বলেছ!' কিশোরের মতই চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

রিমলেস গ্লাসের ওপাশে সরু হল প্রফেসরের চোখ। 'মাই গড, কিশোর,

ঠিকই বলেছ তুমি! খোঁজ, খোঁজ সবাই। গাছের চারপাশে কোন জায়গা বাদ দেবে না। গুপ্তধন এখানে থাকতে পারে।'

'আমি বাঁয়ে দেখছি,' এড বলল।

'আমি ডানে,' বলল রবিন।

'কিশোর, তুমি গাছে ওঠ,' প্রফেসর বললেন। 'আমি গোড়ায় দেখছি।'

অদ্ভুত গাছটার কাছে এগিয়ে গেল সবাই, একা দাঁড়িয়ে আছে মুসা। একবার ডানে তাকাচ্ছে, একবার বাঁয়ে। তারপর ঘাড় ফেরাল পেছনে। 'এই, শোন,' আস্তে বলল সে।

তার কথা বোধহয় কারও কানে গেল না।

'এই, শুনছ,' আবার বলল সে। 'ওখানে পাওয়া যাবে না।'

থমকে গেল কিশোর। 'কি বললে?'

মাথা নাড়ল মুসা। 'ওই গাছটাকে চিহ্ন বানায়নি বাওরাড।'

'কি বলছ?' ফিরে তাকালেন প্রফেসর। 'কেন...'

'ওই যে,' হাত তুলে দেখাল মুসা। কিছুটা ডানে ঢালের গায়ে আরেকটা গাছ। 'ওটাকে তো আরও বড় ভূত মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

'আর ওই যে,' পেছনে আরেকটা গাছ দেখাল সে। 'ওটা ভূতের দাদা।'

জোরে বাতাস বইছে। দ্রুত উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে কুয়াশা। একটা পাথর সরানোর জন্যে ঝুঁকেছিলেন প্রফেসর, গুঙিয়ে উঠে সোজা হলেন। 'হায় হায়, সবগুলোকেই তো ভূতের মত দেখাচ্ছে!'

'হ্যাঁ, মুসা ঠিকই বলেছে,' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল কিশোর। 'এখানে কিছু পাব না। এতগুলো ভূত-গাছ, কোনটাকে চিহ্ন ধরব? এরকম অনেক সাইপ্রেস আছে দ্বীপে। কুয়াশার মধ্যে বিশেষ অ্যাঙ্গেলে দাঁড়িয়ে দেখলে অসংখ্য ভূত দেখা যাবে।'

'আমরা হেরে গেলাম, বয়েজ,' নিরাশায় জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাতে লাগলেন প্রফেসর।

'যদি এই দ্বীপে গুপ্তধন লুকানো থাকে,' আশা ছাড়তে পারছে না কিশোর। 'পাওয়ার আশা নেই। কিন্তু...'

বাধা পড়ল কথায়। হঠাৎ গড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে ছোট বড় অনেক পাথর। ঝট করে ওপরে তাকাল সে। কুয়াশাকে ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাতাস, অনেক দূরে দৃষ্টি চলে এখন। চূড়ার কাছে আরেকটা ভূতকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।

'আরেকটা সাইপ্রেস,' হেসে উঠল এড।

'কিন্তু,' নিচের ঠোঁটে টান দিয়ে ছেড়ে দিল কিশোর। 'সাইপ্রেস পাথর ফেলতে

পারে না।'

'গাছ না, গাছ না!' চিৎকার করে উঠলেন প্রফেসর। 'মানুষ! এই এই, থাম! থাম!'

থামল না লোকটা। হারিয়ে গেল চূড়ার ওপাশে। ছুটন্ত পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

'জলদি এস, ব্যাটাকে ধরতে হবে,' বলেই দৌড় দিলেন প্রফেসর।

তাঁর পেছনে ঢাল বেয়ে ছুটল ছেলেরা। চূড়ায় উঠে দেখলেন, দূরে দৌড়ে চলে যাচ্ছে মূর্তিটা, ডানে, খাঁড়ির পাশ কাটিয়ে যাওয়ার মতলব।'

'নিশ্চয় বোট এনেছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন প্রফেসর। 'ধরতেই হবে।'

সরাসরি গেলে পথ কিছুটা কম হয়, সোজা খাঁড়ির দিকে ছুটলেন তিনি। তাঁকে পাশ কাটাল মুসা, পেছনে এড। সবার আগে খাঁড়ির কাছে পৌঁছল ওরা দু'জন। কিন্তু লোকটাকে দেখা গেল না।

'ওই যে,' মুসা আর এডের পেছনে উঁচু জায়গায় থেকে বলল কিশোর। 'বাঁয়ে। বাঁয়ে।'

খাঁড়ির উত্তরে একটা টিলার ওপাশে হারিয়ে যাচ্ছে মূর্তিটা। ছুটল মুসা আর এড। রবিন গেল। তার পেছনে প্রফেসর। সবার শেষে হাঁপাতে হাঁপাতে চলেছে কিশোর।

টিলার কাছে আগে পৌঁছল রবিন আর প্রফেসর। তাদের পর পরই মুসা আর এড। টিলার নিচে ছোট্ট, সরু এক টুকরো সৈকত। সেটা ধরে দৌড়ে গিয়ে মোটরবোটে উঠল লোকটা। ইঞ্জিন স্টার্ট দিল। সরে যেতে শুরু করল বোট। ফিরে তাকাল একবার সে।

'সেই লোকটা!' রবিন বলল। 'সবুজ ফোক্সওয়াগেনে করে এসেছিল.

কালো চুল, কালো গোঁফওয়ালা হালকা-পাতলা লোকটার দিকে চেয়ে আছেন প্রফেসর। 'চিনি ওকে! ওর নাম নোবল। এই, এই থাম।'

কে শোনে কথা। গতি আরও বাড়িয়ে দ্বীপের কাছ থেকে সরে যেতে লাগল বোট।

'শয়তান!' গর্জে উঠলেন প্রফেসর। 'চল, চল, আমার বোটে।

আবার খাঁড়ির কাছে দৌড়ে চলল ওরা।

বোটের বাঁধন খুলে দিল মুসা। ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে ফেললেন ততক্ষণে প্রফেসর। খোলা সাগরের দিকে ছুটল বোট। মোটরবোটটা কয়েক শো গজ সামনে।

'ফুল স্পীড, মুসা! ধর ব্যাটাকে!' প্রফেসর তাগাদা দিলেন। মোটরবোটের

দিকে চেয়ে মুঠো ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, 'ব্যাটা চোর! আসছি, দাঁড়া!'

'ও কে, স্যার?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'আমার অ্যাসিসটেন্ট ছিল,' খুব রেগেছেন প্রফেসর। 'রুক্সটন ইউনিভারসিটির গ্র্যাজুয়েট। অভাবে পড়ে এসে কাজ চাইল আমার কাছে, কাজ দিলাম। আমার ওখানেই চুরি শুরু করল। মিউজিয়মের দামি দামি জিনিস চুরি করে বিক্রি করে দিতে লাগল। অনেক বোঝালাম, শুনল না। শেষে চোরাই মালসহ ধরা পড়ে গেল জেলে।'

অনেক এগিয়ে গেছে মোটরবোট, প্রায় আধ মাইল।

'ধরা যাবে না, স্যার,' মুসা বলল। 'ওটার স্পীড অনেক বেশি।'

জ্বলন্ত চোখে ক্রমশ-দূরে-সরে-যাওয়া বোটটার দিকে তাকিয়ে রইলেন প্রফেসর। 'কিশোর, টিক বানাউ কিভাবে এত কথা জানল, এবার বোঝা যাচ্ছে। এখন মনে পড়ছে আমার, লিটল মারমেইড আর বাওরাড ভাইয়ের ব্যাপারে খুব আগ্রহী ছিল নোবল। নিশ্চয় বানাউয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। জেলে গেলে কি হবে, চোর আর শোধরায় না!'

'নোবলই মনে হয় কাল রাতে জার্নালের ফটো তুলে এনেছে,' রবিন বলল।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'ওটা পড়েই দ্বীপের কথা জেনেছে। তবে পায়নি কিছু। পেলে, ওভাবে প্যাহাড়ের ওপরে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে চেয়ে থাকত না। নিয়ে চলে যেত।'

'আমাদের মতই ব্যর্থ।'

নীরব হয়ে গেল সবাই। বাকি পথে গুপ্তধন নিয়ে আর একটা কথাও হল না। বন্দরে ভিড়ল বোট। নোবলের মোটরবোট কিংবা সবুজ ফোক্সওয়াগেনের ছায়াও দেখা গেল না কোথাও।

'পুলিশকে রিপোর্ট করব,' রাগ যায়নি এখনও প্রফেসরের। 'কাল রাতে তোমাদের অফিসে ঢুকেছিল, একথাও জানাব।'

'ওকে তো তখন দেখিনি, স্যার,' বলল কিশোর।

'কিন্তু ওকে সন্দেহ তো করছ। পুলিশকে অন্তত জানিয়ে রাখা দরকার।'

'কি একখান দিন গেল!' কপাল ডলল মুসা। 'না পেলাম গুপ্তধন, না পারলাম চোর ধরতে।'

আস্তে মাথা নাড়লেন প্রফেসর। 'হবে না, বুঝেছ, আশা করতে পারছি না আর। অনেক দেরি হয়ে গেছে...প্রায় একশো বছর, অনেক সময়।'

'একেবারেই এগোইনি বলা যাবে না,' হাল ছাড়তে রাজি নয় কিশোর। 'একটু ধীর হয়ে যাচ্ছে আর কি।'

'ঠিক,' তাড়াতাড়ি বলল এড। ভয়, পাছে না আবার গুপ্তধন খোঁজার উৎসাহ হারিয়ে ফেলে সবাই। 'দ্বিতীয় জার্নালটা তো রয়েছেই। আরও ভালমত পড়ে দেখতে হবে।'

'আমি আর যেতে পারছি না তোমাদের সঙ্গে।' চেহারাই বলে দিল মন খারাপ হয়ে গেছে প্রফেসরের। 'কাজের অনেক ক্ষতি করেছি এমনিতেই। যা করার তোমরাই কর। খবর শোনার জন্যে অধীর হয়ে থাকব আমি।'

স্টেশন ওয়াগন চালিয়ে চলে গেলেন প্রফেসর।

তিন গোয়েন্দার দিকে তাকাল এড। সে কিছু বলার আগেই মুসা বলল, 'কিশোর, তদন্ত চালিয়েই যাব আমরা, না?'

'আপাতত লাঞ্চটা সেরে নেয়া দরকার,' মুখ গোমড়া করে রেখেছে কিশোর। 'আরও ভাবতে হবে। ফ্যান্টম লেকে গিয়ে ঠিক করব এরপর কি করা যায়।'

বার

যার যার বাড়িতে লাঞ্চ সারল ওরা। তারপর স্যালভিজ ইয়ার্ডে মিলিত হল তিন গোয়েন্দা। ট্রাক বের করে অপেক্ষা করছিল কিশোর আর বোরিস, মুসা আর রবিন এলে রওনা হল।

ডাই লজ-এর সিঁড়িতে ওদের অপেক্ষায়ই দাঁড়িয়েছিল এড, ট্রাকটা দেখে দৌড়ে এল। তার মা কোথায় জিজ্ঞেস করল কিশোর।

বাড়ির পেছনে কাঠ আর পাথরে তৈরি একটা ছাউনিতে ওদেরকে নিয়ে এল এড। লাল রঙ করা কাঠের টবে তখন একটা হিবিসকাসের বড় চারা লাগাচ্ছেন মিসেস ডাই।

'ম্যাডাম,' কোনরকম ভূমিকা করল না কিশোর। 'আমরা ভেবেছি, নৌকা বোঝাই করে মাল নিয়ে গেছেন বাওরাড়। বাড়িতে গিয়ে জার্নালটা আবার পড়লাম। এখন আমার বিশ্বাস, নেননি, আসলে দ্বীপ থেকে কিছু এনেছেন। ওখান থেকে আনা হয়েছে, এমন কোন জিনিসের কথা জানেন আপনি?'

হাসলেন মহিলা। 'আমি কি করে জানব, কিশোর?'

এই জবাবই আশা করেছিল কিশোর। 'ভাল করে ভেবে দেখুন।' ইতিমধ্যে বাওরাডের মেসেজগুলো নিয়ে আরেকবার আলোচনা করে দেখি।' পাতলা জার্নালটা খুলল সে। 'এই যে, একুশে নভেম্বর লেখা রয়েছে…ও হ্যাঁ, একটা ভুল করে ফেলেছিলাম আমরা। বাওরাড বলেছেন তাঁর "দিনগুলো" কিভাবে তৈরি করেছেন, পড়ার জন্যে, একটা বা কয়েকটা দিন নয়, সমস্ত দিন পড়ে তারপর

মেসেজের মানে উদ্ধার করতে বলেছেন। তাহলে দেখা যাক, আর কোথায় কি রয়েছে। জরুরি পৃষ্ঠাগুলো শুধু পড়ব। একুশে নভেম্বরঃ ড্যানিয়েল ব্রাদার্সরা খবর পাঠিয়েছে, আমার অর্ডার তৈরি। বড় ওয়াগনটা দরকার আমার।...তার পরদিন লিখেছেনঃ অর্ডার নিয়ে রকি বীচ থেকে ফিরে এলাম। চমৎকার কাজ দেখিয়েছে ওরা। প্রতিটি পিস একেবারে মাপমত। এই দেশে এরকম জিনিস বানাতে পারবে কেউ আশা করিনি।' মুখ তুলল কিশোর। 'বাইশে নভেম্বর তেমন কিছু নেই। তেইশে নভেম্বরঃ এলাকায় দু'জন নতুন মুখকে ঘোরাঘুরি করতে দেখলাম। নাবিক।... একেবারে আটাশে নভেম্বর গিয়ে আবার জরুরি কথা আছেঃ ওরা চলে গেছে। ক্যাপ্টেনের কাছে রিপোর্ট করতেই গেল বোধহয়।'

'চোখ রাখা হয়েছে যে তখনই নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন,' বলল রবিন।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'তখনকার তাঁর মনের অবস্থা আন্দাজ করতে পার? ছেলে নেই, বউ নেই, বিদেশ-বিভুঁইয়ে একা একজন মানুষ, শত্রু ঘোরাফেরা করছে...নিশ্চয় তখনই তাড়াহুড়ো করে কাজ শেষ করার কথা ভাবেন।'

'আর কি লিখেছে?' এড জিজ্ঞেস করল।

'ডিসেম্বরের পাঁচ তারিখে লিখেছেনঃ নোরিয়ার চমকে শেষ ছোঁয়া দিতে সান্তা বারবারায় গেলাম। ভাল জিনিস পেয়েছি, সস্তায়, কারণ প্রতিষ্ঠানে আগুন লেগেছিল। ওয়ান ম্যান'স ট্র্যাজেডি ইজ অফেন অ্যানাদার ম্যান'স ফরচুন!' জার্নাল বন্ধ করল কিশোর। 'কাল রাতে ড্যানিয়েল ব্রাদার্স-এর ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছিলাম। রকি বীচে ইট সিমেন্টের কারবার করে। নিশ্চয় অনেক ইট কিংবা পাথর কিনেছিলেন বাওরাড। ড্যানিয়েল বিল্ডিং সাপ্লাই কোম্পানি এখনও আছে, নাতিপুতিরা কোম্পানি চালাচ্ছে। গেলে পুরানো রেকর্ড পাওয়াও যেতে পারে।'

'তাহলে যাচ্ছি না কেন?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল এড।

'যাব। সান্তা বারবারায়ও যেতে হবে। নোবল জার্নালের ফটো তুলে নিয়ে গেছে, সে-ও যেতে পারে ওসব জায়গায়। জলদি করতে হবে আমাদের। রবিন আর মুসা ড্যানিয়েল কোম্পানিতে চলে যাক। আমি আর তুমি যাব সান্তা বারবারায়, বোরিস ট্রাকে করে নিয়ে যাবে আমাদের। আপনার কোন আপত্তি আছে, মিসেস ডাই?'

'না, আমার আপত্তি কি? তবে একটা কাজ করে দিয়ে যাও। এই টবটা বেজায় ভারি,' হিবিসকাসের টব দেখালেন মিসেস ডাই। 'এটা বাইরে বের করে দিয়ে যাও। নইলে আবার ডিনোকে ডাকতে হবে, আমি একা পারব না।'

সিঁড়ির একপাশে নিয়ে গিয়ে টবটা সবে বসিয়েছে ওরা, এই সময় শোনা গেল ইঞ্জিনের শব্দ। দ্রুত আসছে। প্রফেসর কেইনের স্টেশন ওয়াগন।

গাড়ি থেকে নেমে প্রায় ছুটে এলেন প্রফেসর। 'তোমাদের সাবধান করতে এসেছি, বয়েজ! পুলিশকে জানিয়েছিলাম। খোঁজ নিয়েছেন ইয়ান ফ্লেচার। শাস্তির মেয়াদ শেষ হয়নি নোবলের, প্যারোলে মুক্তি দেয়া হয়েছে। ডেঞ্জারাস লোক। কোন ঝুঁকি নিতে দ্বিধা করবে না সে। বুঝেছ আমার কথা?'

'কত দিন আগে ছাড়া পেয়েছ?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'ছয় মাস।'

'ছয় মাস আগে থেকেই ডাই লজে চোর ঢুকতে আরম্ভ করেছে, না?' মুসা বলে উঠল।

'হ্যাঁ, মুসা,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'ভাবছি...।' হঠাৎ বড় বড় হয়ে গেল চোখ। নাক কুঁচকে বাতাস শুঁকছে। 'এই, গন্ধ পাচ্ছ?'

'তাই তো!' মুসা বলল। 'ধোঁয়া। পুড়ছে কিছু।'

'বাড়ির পেছন থেকে!' চেঁচিয়ে উঠল এড।

দৌড় দিল সবাই।

দেখল, ছাউনি থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে পকেটে খুঁজতে শুরু করল কিশোর। পেল না। প্রায় আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার করে উঠল, 'হায়, হায়! জার্নালটা! টব তোলার সময় হাত থেকে রেখেছিলাম, আর আনতে মনে নেই!'

তের

পাথরের ছাউনি, পুড়বে না, শুধু কাঠগুলো ছাড়া। ভেতরে ঘন ধোঁয়া।

ফায়ার এক্সটিংগুইশারের জন্যে দৌড় দিল এড। জ্যাকেট খুলে তৈরি রইল রবিন আর মুসা। এড ফিরতেই তার সঙ্গে সাবধানে ঢুকল ভেতরে।

'আলগা কাঠ রাখা ছিল,' বলল এড। 'ওগুলোতে লেগেছে।'

বাইরে দাঁড়িয়ে কিশোর, প্রফেসর আর মিসেস ডাই শুনছেন এক্সটিংগুইশারের শব্দ। জ্যাকেট দিয়ে জোরে জোরে বাড়ি মারা হচ্ছে আগুনের ওপর। কিছুক্ষণ পর ধোঁয়া পাতলা হয়ে এল। বেরিয়ে এল মুসা, মুখে বিজয়ীর হাসি। হাতে জার্নাল। জানাল, 'আর সামান্য দেরি হলেই যেত পুড়ে।'

হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি পাতাগুলো উল্টে দেখল কিশোর, ঠিক আছে কিনা।

কাকে যেন দৌড়ে আসতে শোনা গেল। ডিনো। চেঁচাচ্ছে, আর হাত তুলে দেখাচ্ছে ছাউনির পেছনটা। 'ওদিকে, ওদিকে...ব্যাটাকে দেখেছি আমি। এদিকেই তাকিয়ে ছিল...এই এক মিনিট আগে।'

'যাবে, ধরা যাবে!' চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর।

চোরের পেছনে ছুটল ওরা। দৌড় দিল গাছপালার ভেতর দিয়ে। ডিনো আগে আগে। 'নিশ্চয় বড় রাস্তার দিকে গেছে।'

বনের ভেতর একেকজন একেক দিকে ছড়িয়ে পড়ল ওরা। প্রফেসর গেলেন ডানে, ডিনো গেল সামনের দিকে। রবিন আর কিশোর সবার পেছনে। থেমে ঝোপঝাড়ে চোখ বোলাচ্ছে। ধূসর-সবুজ ঘন ওকের আড়ালে কেউ লুকিয়ে আছে কিনা দেখছে।

হঠাৎ নীরব হয়ে গেছে সব, যেন সবাই দাঁড়িয়ে কান পেতে শব্দ শোনার চেষ্টায় রত। সামনে বিড়বিড় করে গাল দিল একজন। আবার এগোল রবিন আর কিশোর, সতর্ক। গাছের আড়ালে আড়ালে চলে এল পঞ্চাশ গজ মত। মট করে কি যেন ভাঙল।

ঝট করে ঘুরল কিশোর। চিৎকার শোনা গেল ডানে। কে যেন এসে লাফিয়ে পড়ল তার ওপর। জাপটে ধরে তাকে নিয়ে পড়ল মাটিতে।

'ধরেছি! ধরেছি! ব্যাটাকে ধরেছি!' চেঁচাতে লাগল মুসা।

'আরে এই মুসা,' তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল রবিন। 'এই। কিশোরকে ধরেছ তো।'

'কী?' ভাল করে তাকাল মুসা। 'খাইছে। আমি··· ভেবেছিলাম···শুনলাম···'

'সর, সর,' মুসাকে ঠেলে সরিয়ে উঠল কিশোর। কাপড়ের ময়লা ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, 'কানা নাকি? দেখে লাফ দাওনি?'

'শব্দ শুনলাম। আর দেখে কে?'

'অমনি চোরের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লে,' হাসতে শুরু করল রবিন।

প্রফেসর, ডিনো আর এড ফিরে এসে দেখল তিনজনেই হাসছে। রিমলেস গ্লাসের ওপাশে রাগে জ্বলছে প্রফেসরের চোখ। গোল লাল মুখ আরও লাল হয়ে উঠেছে।

'পালাল হারামজাদা,' দাঁতে দাঁত চাপল ডিনো। 'টিক বানাউ ছাড়া কেউ না।'

'দেখলে নোবলকে দেখেছেন,' প্রফেসর বললেন।

'কি করে এত শিওর হচ্ছেন? নোবলকে নয়, বানাউকেই দেখেছি আমি। দাড়ি দেখলাম মনে হল···।'

'দাড়ি না। বোধহয় গোঁফ দেখেছেন। কালো গোঁফকে অনেক সময়···'

'বলে কি? গোঁফকে দাড়ি? আপনার···'

'মাথা খারাপ, না?' রেগে উঠতে গিয়েও উঠলেন না প্রফেসর। ছেলেদেরকে অবাক করে দিয়ে নতি স্বীকার করে নিলেন। 'বেশ, দেখিনি যখন, জোর করে কিছু

বলল না। আপনি সত্যিই লোকটাকে দেখেছেন তো?'

'নিশ্চয়ই। তবে চেহারাটা দেখিনি।'

'তাহলে,' তাড়াতাড়ি বলল কিশোর। 'দেরি করা যায় না আর। টিক বানাউ হয়ে থাকলে, বোঝা যাচ্ছে জার্নালটা আর তার দরকার নেই। যা জানার জেনে নিয়েছে। চলুন, চলুন।'

বন থেকে বেরিয়ে এল ওরা। উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছেন মিসেস ডাই। বোরিস রয়েছে তাঁর সঙ্গে। হৈ চৈ শুনে ট্রাক ফেলে দেখতে এসেছে কি হয়েছে।

'পালিয়েছে শয়তানটা,' ডিনো বলল। 'ইস্, আর একটা মিনিট আগে বেরোলেই...,' কথা শেষ না করে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল সে।

'আপনি ঘরে ছিলেন, মিস্টার হ্যাংবার?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ। ধোঁয়ার গন্ধ পেয়ে বেরিয়েছি।'

'পুলিশকে জানানো দরকার,' বললেন প্রফেসর। 'কাজ পড়ে আছে ওদিকে। তবু, যাবার সময় থানায় ঢুঁ মেরে যেতে পারব।'

'তা-ই করবেন,' ডিনো বলল। ছেলেদের দিকে তাকাল। 'তোমাদের ধারণাই ঠিক। আমিই ভুল করেছি। গুপ্তধন হয়ত আছে।' জোরে জোরে মাথা নাড়ল সে। 'না থাকলেও কয়েকটা শয়তান লোক অন্তত বিশ্বাস করে বসেছে যে আছে। তোমরা আর এসবে নাক গলিয়ো না। যা করার পুলিশই করবে। তোমরা করতে গিয়ে বিপদে পড়বে খামোকা।'

'আমিও তাই বলি, বয়েজ,' ডিনোর সঙ্গে একমত হলেন প্রফেসর।

'হয়ত...,' শুরু করেও বাধা পেয়ে থেমে গেলেন মিসেস ডাই।

'কিছুই হবে না, ম্যাডাম,' কিশোর বলল। 'টিক ভাবছে, যা পাওয়ার পেয়ে গেছে। আমাদের কিছু করতে আসবে না সে। আর দ্বীপ থেকে আমাদের তাড়া খেয়ে পালিয়েছে নোবল। কিছু করার ইচ্ছে থাকলে তখনই করতে পারত। আমাদের এখন প্রধান কাজ তাড়াতাড়ি গুপ্তধন খুঁজে বের করা। নইলে নিয়ে চলে যাবে ওরা।'

'আত্মবিশ্বাস থাকা ভাল, খোকা,' ডিনো পছন্দ করতে পারছে না কিশোরের কথা। 'তবে বেশি থাকা ভাল না। বিপদ বাড়ে তাতে।'

'আমার তা মনে হয় না,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল কিশোর।

'আমারও,' বললেন মিসেস ডাই। 'তাছাড়া ওরা কচি খোকা নয়। নিজেদের ভাল-মন্দ বোঝার বয়স হয়েছে।'

প্রফেসর হাসলেন। 'আমারও তাই বিশ্বাস। ইতিমধ্যেই যথেষ্ট বুদ্ধি আর সাহসের পরিচয় দিয়েছে ওরা।... আমি এখন যাই। নতুন কিছু জানলে আমাকে

জানিও। চলি। গুড বাই।'

চলে গেলেন প্রফেসর।

'যাও, গিয়ে সময় নষ্ট করে আস সবাই। আমি এসবে নেই। দেখি গিয়ে, আগুনে কি ক্ষতি করল।' ছাউনিতে ঢুকল ডিনো।

ট্রাক থেকে সাইকেল নামিয়ে রওনা হয়ে গেল রবিন আর মুসা।

কিশোর আর এড ট্রাকে উঠল। চলল উত্তরে, সান্তা বারবারায়।

চোদ্দ

'আরও তাড়াতাড়ি, বোরিসভাই,' তাগাদা দিল কিশোর।

'ভেব না, তাড়াতাড়িই পৌছুব। আরও বেশি তাড়াতাড়ি করতে গেলে হয়ত পৌছুতেই পারব না কোনদিন, অ্যাক্সিডেন্ট করে মরব।'

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে আবার সিটে হেলান দিল কিশোর।

বাওরাড ডাইয়ের দ্বিতীয় জার্নালটা পড়তে পড়তে মুখ তুলল এড। 'কিশোর, বাওরাড কোথায় গিয়েছিল, লেখা নেই। কি করে জানছি? সান্তা বারবারা ছোট না।'

বোরিস হাসল। 'হ্যাঁ, বড় শহর।'

'বড় হওয়াতেই তো ভাল,' বলল কিশোর। 'পুরানো শহর, বেশি পুরানো রেকর্ড থাকবে। একটা সূত্র রেখে গেছেন বাওরাড ডাই, সেটার সাহায্যেই খুঁজে বের করব।'

'সূত্র?' ভুরু কোঁচকাল এড।

'একটা দোকান থেকে কিছু কিনেছিল, যেটা আগুনে পুড়ে গেছে। আঠারশো ছিয়ানব্বই সালে এখনকার মত ছিল না সান্তা বারবারা, অনেক ছোট ছিল। অগ্নিকাণ্ডে দোকান পুড়ে যাওয়ার মত খবর না ছাপার কথা নয়।'

বিকেলের মাঝামাঝি সান্তা বারবারার উপকণ্ঠে পৌছল ওরা। খবর সংগ্রহের জন্যে দ্য লা গুয়েরা প্লাজায় অবস্থিত সান-প্রেস পত্রিকার অফিসটা খুঁজে বের করল বোরিস, কিশোরের নির্দেশে। দোতলায় উঠে জনৈক মিস্টার বুল-এর সঙ্গে দেখা করার অনুরোধ জানাল রিসিপশনিস্ট। সম্পাদকের নাম বুল বটে, কিন্তু গায়েগতরে ষাঁড়ের মত নন মোটেও। ছোটখাটো একজন মানুষ, হাসিখুশি। 'আঠারশো ছিয়ানব্বই?' কিশোরের চাহিদা শুনে বললেন। 'না, আমরা তখন ছিলাম না। লোকাল একটা পত্রিকা ছিল অবশ্য। তুমি ঠিকই বলেছ, ইয়াং ম্যান, বড় রকমের একটা অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল ওই সময়।'

'রেকর্ডগুলো, স্যার, আছে আপনাদের মর্গে?'

'ছিল। যা পেয়েছিলাম সব এনে ফাইল করেছিলাম। কিন্তু নানারকম দুর্ঘটনায়—এই ভূমিকম্পে আর আগুনে—উনিশশোর আগের সব রেকর্ড নষ্ট হয়ে গেছে।'

গুঙিয়ে উঠল কিশোর। 'সব রেকর্ড, স্যার?'

'হ্যাঁ, সরি,' বলে ভাবলেন এক মুহূর্ত। 'তবে, আরেক জায়গায় চেষ্টা করে দেখতে পার। একজন লেখককে চিনি, ষাট বছর আগে ওই পত্রিকায় ফিচার লিখত। তার ব্যক্তিগত একটা মর্গ আছে, পুরানো খবরের কাগজ আর কাগজের অনেক কাটিং সংগ্রহে আছে। হবি। তার কাছে গিয়ে দেখতে পার।'

'সান্তা বারবারায় থাকেন?' হাতে যেন চাঁদ পেল কিশোর।

'হ্যাঁ।' ছোট একটা অ্যাড্রেস ফাইল বের করলেন সম্পাদক। 'নাম আলফ্রেড পেরিংটন। থাকে এগারশো অ্যানাক্যাপা স্ট্রীটে। যাও, লোক ভাল। পারলে অবশ্যই সাহায্য করবেন।'

লম্বা পথের মাথায় ছোট্ট একটা অ্যাডাব হাউস, ১১০০ নম্বর, বড় একটা বাড়ির পেছনে। ট্রাকে বসে রইল বোরিস। কিশোর আর এড নেমে এগোল বাড়িটার দিকে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল কিশোর। দড়াম করে দরজা লাগার আওয়াজ, তার পর পরই ছুটন্ত পদশব্দ।

'কিশোর, দেখ, দেখ!'

হাঁ হয়ে খুলে আছে অ্যাডাবের দরজা। ভেতর থেকে চিৎকার শোনা গেল। 'এই! কে আছ? এই!'

'বিপদে পড়েছে,' বলেই দৌড় দিল কিশোর।

চিৎকারটা বোরিসেরও কানে গেছে। লাফ দিয়ে ট্রাক থেকে নেমে দৌড়ে এল।

খোলা দরজা দিয়ে ছোট একটা লিভিংরুমে ঢুকল ওরা। বই আর ফ্রেমে বাঁধাই খবরের কাগজের সামনের পাতা সুন্দর করে সাজানো।

'এই, কে?' বাঁয়ের ঘর থেকে এল চিৎকার।

ঢুকে দেখা গেল, ওটা স্টাডি। গাদা গাদা পুরানো খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিন। ডেস্কের ওপর একটা টাইপরাইটার। পাশের বাক্সে রাখা টাইপ করা কিছু পাতা। বই লেখা চলছে বোধহয়।

মেঝেতে পড়ে আছেন এক বৃদ্ধ। মুখের কাটা থেকে রক্ত পড়ছে। ছেলেদের দিকে তাকালেন।

'মাই গড!' বলে তাড়াতাড়ি গিয়ে বৃদ্ধকে তুলল বোরিস। একটা ইজি-চেয়ারে শুইয়ে দিল।

এক গেলাস পানি এনে দিল এড। ঢকঢক করে সবটা পানি খেয়ে ফেললেন বৃদ্ধ। 'দাড়িওয়ালা এক লোক!' মৃদু হাঁপাচ্ছেন তিনি। 'গালে কাটা দাগ, নাবিকের জ্যাকেট... তা, তোমরা কে?'

'টিক বানাউ!' চিৎকার করে উঠল এড।

পরিচয় দিয়ে কিশোর বলল, 'মিস্টার বুল পাঠিয়েছেন, স্যার। সানপ্রেসের সম্পাদক। আপনিই তো মিস্টার আলফ্রেড পেরিংটন?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝোঁকালেন বৃদ্ধ। 'টিক বানাউ? সে-ই হামলা করেছিল?'

'চেহারার বর্ণনায় তো তাই মনে হয়। কি চেয়েছিল আপনার কাছে?'

লম্বা দম নিলেন পেরিংটন। তাঁর কাটা মুছে দিয়ে বোরিস জানাল, ক্ষত সামান্য।

'জোর করে ঢুকে পড়ল,' বৃদ্ধ বললেন। 'আঠারশো ছিয়ানব্বইর নভেম্বরে একটা অগ্নিকাণ্ডের কথা জানতে চাইল।'

'গুপ্তধন খুঁজছে ব্যাটা,' রেগে গিয়ে বলল এড। 'লিটল মারমেইডের গুপ্তধন।'

'আছে নাকি?'

'কিছু জানেন মনে হচ্ছে?'

মাথা ঝাঁকালেন পেরিংটন। 'অনেক গবেষণা করেছি ওটার ব্যাপারে। ওই সময়কার প্রচুর কাটিং আছে আমার মর্গে।'

'বানাউকে বলে দিয়েছেন, স্যার?' শঙ্কিত হয়ে উঠেছে কিশোর।

'কিচ্ছু বলিনি। লোকটাকে দেখেই বুঝেছি, খারাপ। বলিনি বলেই তো মারল, তারপর গিয়ে ফাইল ঘাঁটতে লাগল। পেয়ে গেছে মনে হয়। নিয়ে বেরিয়ে গেছে। কাটিং।'

কাঁধ ঝুলে পড়ল কিশোরের। 'নিয়ে গেছে! কি লেখা ছিল? জরুরি কিছু?'

'জানি না। তবে চেষ্টা করলে হয়ত বলতে পারব।'

'করবেন, স্যার?' এড মিনতি করল, 'করুন না, স্যার, প্লীজ।'

'আমার সমস্ত ফাইল মাইক্রোফিল্ম করে রেখেছি। দেখি, ওই বাক্সটা আন তো।'

ডেস্কের ওপর থেকে লম্বা, সরু একটা বাক্স এনে দিল এড। ভেতর থেকে মাইক্রোফিল্মের একটা ছোট বাক্স বের করলেন লেখক। 'এই যে, আঠারশো ছিয়ানব্বই। নাও, ওই রিডিং মেশিনে লাগাও।'

ভিউয়ারে চোখ রেখে পড়তে আরম্ভ করল কিশোর। ছিয়ানব্বইর সেপ্টেম্বর

থেকে শুরু। 'এই যে!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল গোয়েন্দাপ্রধান। 'নভেম্বর, পনের। ডাইক অ্যাণ্ড সনস, শিপ শ্যাণ্ডলারস। আগুনে ওদের স্টোর হাউস পুড়ে গিয়েছিল। নিশ্চয় এটাই।'

'শিপ শ্যাণ্ডলার কি?' জিজ্ঞেস করল এড।

'জাহাজের খাবার আর দরকারি জিনিসপত্র সরবরাহ করে যারা।'

'ডাইক অ্যাণ্ড সনস?' পেরিংটন বললেন। 'এখনও ব্যবসা করে ওরা। বন্দরে গিয়ে খোঁজ করলেই অফিস পেয়ে যাবে।'

'জলদি চল তাহলে,' কিশোরকে বলল এড।

'আগে ডাক্তার ডাকা দরকার,' বোরিস বলল।

মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ। 'না না, লাগবে না, আমি ভালই আছি। ডাক্তার ডেকে নিতে পারব। তোমরা গিয়ে দাড়িওয়ালা লোকটাকে ধর। ওকে ধরতে পারলেই আমি সুস্থ হয়ে যাব। যাও, জলদি যাও।'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল কিশোর। তারপর মিস্টার পেরিংটনের দিকে চেয়ে হেসে, মাথা নেড়ে দরজার দিকে পা বাড়াল।

সহজেই খুঁজে পেল ওরা, ডাইক অ্যাণ্ড সনসের অফিস। বন্দরের একটা সরু গলিতে, পানির ধারেই। স্বাগত জানালেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক, 'এস এস, কি চাই?'

'আঠারশো ছিয়ানব্বই সালের রেকর্ড আছে আপনাদের?' জানার জন্যে তর সইছে না এডের। 'ব্যবসার খতিয়ান? জার্নাল, কিংবা ডায়েরী?'

কিশোর বলল, 'আমার...।'

'ওই দাড়িওয়ালা শয়তানটার অ্যাসিসটেন্ট নাকি?' নিমেষে হাসি হাসি মুখটা কঠোর হয়ে গেছে ভদ্রলোকের। 'যেতে পার।'

'না না, স্যার,' হাত নাড়ল কিশোর। পরিচয় দিল। সংক্ষেপে জানাল কি জন্যে এসেছে।

'বাওরাড ডাই?' আফসোস করে বললেন ভদ্রলোক, 'পুরানো রেকর্ড নষ্ট হয়ে গেছে ভূমিকম্পে। দাড়িওলাকেও একথাই বলেছি।'

দমে গেল কিশোর। 'রেকর্ড নেই! তাহলে বাওরাড ডাই কি কিনেছিলেন, কোনদিনই জানা যাবে না?'

'না...। আচ্ছা, দাঁড়াও তো দেখি...।

'প্রাইভেট' লেখা একটা দরজা ঠেলে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

অস্থির ভাবে অপেক্ষা করছে ছেলেরা। হঠাৎ হাত তুলল এড, 'কিশোর?'

তাড়াতাড়ি জানালার কাছে এগিয়ে গেল কিশোর, এডের পাশে। 'কী?'

'স্টোরের ওপর চোখ রাখছে মনে হয়?'

'কোথায়?'

'ওই যে, রাস্তার শেষ মাথায়। আরি, চলে গেল, একটা বিল্ডিঙের আড়ালে। আমরা যে দেখেছি বোধহয় বুঝে ফেলেছে। টিক বানাউ না তো?'

ফিরে তাকাল কিশোর। ভদ্রলোক এখনও ফেরেননি। জাহাজের একটা পুরানো ঘড়ি দেখছে মন দিয়ে বোরিস। ইশারায় এডকে আসতে বলে দরজার দিকে পা বাড়াল কিশোর।

জাহাজ ঘাটের দিকে এগিয়ে চলল দু'জনে। বাড়িঘরের আড়ালে আড়ালে থাকছে যতটা সম্ভব। একটা বাড়ির কোণে এসে থমকে গেল এড। 'কিশোর। সবুজ ফোক্সওয়াগেন।'

চওড়া রাস্তার ওধারে দাঁড়িয়ে আছে ছোট গাড়িটা। তার ওপাশে, গোঁফওয়ালা এক তরুণ তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে যাচ্ছে একটা কাঠের বার্জের দিকে।

'টিক বানাউ নয়,' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'নোবল।'

পানির কিনারে ভেজা বালি। বার্জের অর্ধেকটা বালিতে বসে গেছে, বাকি অর্ধেক পানিতে। অচল। ওটার অন্যপাশে হারিয়ে গেল তরুণ।

'কারও সাথে দেখা করতে গেছে,' অনুমান করল কিশোর।

'টিক বানাউ?'

'চল, দেখি।'

রাস্তা পেরিয়ে, সাবধানে বার্জের দিকে এগোল ওরা। কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল। কান পাতল, ওপাশে কি কথা হয় শোনার জন্যে। কিন্তু কিছুই শোনা গেল না।

'বেশি দূরে,' এড বলল। 'চল ঘুরে গিয়ে দেখি।'

'না। দেখে ফেলবে। তারচে উপরে উঠি।'

বার্জের এক পাশে একটা মই লাগানো। কাত হয়ে আছে বার্জটা, ফলে মই বেয়ে উঠতে অসুবিধে হয়। অনেক কায়দা কসরত করে শেষ পর্যন্ত উঠল ওরা। পা টিপে টিপে এগোল ডেকের ওপর দিয়ে। অন্য ধারে যাওয়া আর হল না, তার আগেই মড়মড় করে ভাঙল পচা তক্তা।

'হুঁক!' করে উঠল কিশোর। ভেজা, নরম কিছুর ওপর পড়েছে।

'পুরানো বস্তা। বস্তার ওপর পড়েছি।'

মাথার ওপরে গোল ফোকর—হ্যাচের ঢাকনা ভেঙে পড়েছে ওরা, আবছা আলো আসছে সেখান দিয়ে। বার্জের খোলে পড়েছে। ভেজা, ভ্যাপসা দুর্গন্ধ। খোলের পাশেও এক জায়গায় তক্তায় ফাটল, হালকা আলো আসছে ওপথেও। মাথার ওপরের ফোকরটা বারো ফুট ওপরে।

'কোন কিছুর ওপর দাঁড়াতে পারলে ধরা যেত,' কিশোর বলল।

পিচ্ছিল খোলে হেঁটে বেড়াল ওরা। উঠে দাঁড়ানোর মত কিছুই চোখে পড়ল না। বস্তা ছাড়া আর কিছু নেই। বাক্স, তক্তা, দড়ি, মই, কিচ্ছু না। অন্ধকার কোণে খচমচ করে নড়ছে কি যেন।

'ইঁদুর,' এড বলল। 'কিশোর, এখান থেকে বেরোনোর কোন রাস্তা নেই।'

'দেখি আরেকবার খুঁজে। এমাথা থেকে ওমাথা, কোথাও বাদ দেব না'

পেছনের শেষ প্রান্তে এসে ছপ করে পানিতে পা দিয়ে ফেলল কিশোর। অল্প পানি জমে রয়েছে। ঢোক গিলল সে। 'এড,' গলা কাঁপছে। 'জোয়ারের সময় পানিতে ডুবে যায় এটা।'

দ্রুত আবার ফোকরটার নিচে ফিরে এল ওরা।

'চেঁচাই?' এড বলল।

এই সময় ফোকর দিয়ে উঁকি দিল একটা মুখ। তরুণ। কালো গোঁফ। 'চেঁচিয়ে লাভ হবে না,' হেসে বলল সে। 'শীতকালে এদিকে বড় একটা আসে না কেউ। তাছাড়া রাস্তা এখান থেকে অনেক দূরে, গাড়িঘোড়ার গোলমাল। গলা ফাটিয়ে চেঁচালেও কেউ শুনবে না।' আবার হাসল লোকটা। 'তার চেয়ে এক কাজ করা যাক, এস, কথা বলি।'

পনের

কিশোররা যখন সান্তা বারবারায় পৌঁছেছে, প্রায় একই সময় মুসা আর রবিনও পৌঁছুল ড্যানিয়েল ব্রাদার্সদের অফিসের সামনে। একটা ট্রাকে ইট তুলছে বাদামী চামড়ার এক লোক। ছেলেরা জানাল, কি জন্যে এসেছে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল সে। হাসল। 'বিখ্যাত ড্যানিয়েল ব্রাদার্স? একজন ছিল আমার দাদার বাবা, আরেকজন চাচা। আমি ডিলিয়ানো ড্যানিয়েল। পাথরের কাজই বেশি করি আমরা। দামি জিনিস, লাভও বেশি।'

'আপনার বাপ-দাদাদের কথা তো তাহলে ভালই বলতে পারবেন,' হেসে বলল রবিন।

'নিশ্চয়। কি জানতে চাও?'

'আঠারশো ছিয়ানব্বই সালের বাইশে নভেম্বর, এক ওয়াগন বোঝাই মাল কিনেছিলেন স্কটল্যাণ্ডের বাওরাড ডাই। কি কিনে ছিলেন জানতে চাই।'

'আঠারশো ছিয়ানব্বই?' চোখ কপালে তুলল ডিলিয়ানো। 'মানে একশো বছর আগে?'

'চার বছর কম,' মুসা বলল।

'আপনি কোন সাহায্য করতে পারবেন না, না?' বলল রবিন।

'একশো বছর!' আবার বলল ডিলিয়ানো। নেচে উঠল কালো চোখের তারা। হাসল। 'পারব না কেন? পারব। এ শহরে আমাদের চেয়ে ভাল রেকর্ড কে রাখে? এস।'

ছেলেদেরকে অফিসে নিয়ে এল ডিলিয়ানো। কাঠের ক্যাবিনিট খুলে পুরানো একটা ফোল্ডার বের করল, হলদে হয়ে গেছে পাতাগুলো। ধুলো ঝেড়ে ফাইল বের করে পাতা ওল্টাল কয়েকটা। হেসে মুখ তুলে তাকাল ছেলেদের দিকে। 'পেয়েছি। বাইশে নভেম্বর বললে না? বাওরাড ডাই। এই যে। বাওরাড ডাই, ফ্যান্টম লেক। স্পেশাল অর্ডার দিয়েছেঃ এক টন পাথর। নগদ টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে গেছে।'

'এক টন?' মুসা জানতে চাইল, 'কি পাথর?'

'কি পাথর, লেখা নেই। শুধু এক টন লিখেছে, আর লিখেছে, স্পেশাল অর্ডার। তবে দাম দেখে বোঝা যায় সাধারণ পাথর নয়।'

'স্পেশাল অর্ডার বলতে তখন কি বোঝাত?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'সাধারণ পাথর নয়, এটুক বলতে পারি,' চোয়াল ডলল ডিলিয়ানো। হতে পারে স্পেশাল অর্ডারে কেটে, সাইজ করে সাপ্লাই দেয়া হত। ঘষে-মেজে পালিশ করেও পাথর সাপ্লাই দিই আমরা। আচ্ছা, নিয়ে গিয়ে সাইডওয়াক বানায়নি তো?'

'সাইডওয়াক?'

'তখনকার দিনে বড় চ্যাপ্টা পাথর দিয়েই সাইডওয়াক বানানো হত।'

'কি জানি,' রবিন বলল। 'ওরকম কিছু বানিয়েছে কিনা জানি না।'

'পাথর দিয়ে বাড়িও বানানো হত অনেক। দেয়াল, ভিত, ফ্ল্যাগস্টোনস···কোন জায়গায় বড় পাথর, কোন জায়গায় ছোট পাথর—সাইজ জানতে চাও?'

'হ্যাঁ, জানলে খুব ভাল হয়।'

'পাহাড়ে আমাদের পুরানো আড়ত থেকে আনা হত তখন পাথর। এখন আর ওখানে তেমন নেই, ফলে লোকজনও রাখা হয় না বেশি, শুধু একজন কেয়ারটেকার আছে। একটা অফিস আছে ওখানে। পুরানো রেকর্ড থাকার কথা।'

'যাওয়া যাবে?' আগ্রহ উত্তেজনায় কাঁপতে শুরু করল রবিন।

'যাবে। ফ্যান্টম লেক থেকে বড়জোর দু'মাইল।' কিভাবে কোথায় যেতে হবে বলে দিল ডিলিয়ানো।

'আমরা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই না,' সাফ মানা করে দিল এড। 'আপনি কে খুব ভাল করেই জানি।'

সতর্ক হয়ে উঠল লোকটা। 'কি জান?'

'জানি, আপনি একটা চোর। সোসাইটিতে চুরি করে জেলে গেছেন,' কড়া গলায় বলল কিশোর। 'তারপর জেল থেকে বেরিয়ে আবার শুরু করেছেন শয়তানি।'

'পুলিশকে জানানো হয়েছে আপনার কথা,' যোগ করল এড।

ঝট করে মাথা তুলে চারপাশে তাকাল নোবল, বোধহয় পুলিশ আছে কিনা দেখল। তাকাল আবার ছেলেদের দিকে। 'প্রফেসরের বাচ্চা তাহলে বলে দিয়েছে তোমাদেরকে। ওটার সঙ্গে মিশলে কিভাবে?'

'মিশেছি, যেভাবেই হোক,' কিশোর বলল। 'সেটা আপনাকে বলতে যাব কেন? হ্যাঁ, ভাল কথা, দ্বিতীয় জার্নালটা পোড়েনি, যেটার ছবি তুলে নিয়েছিলেন।'

দ্বিধা করল নোবল। 'ওই স্টোরে গিয়ে কি কি জানলে?'

'কি করে ভাবলেন, আপনাকে বলব?' ঝাঁজাল কণ্ঠে বলল এড।

'গিয়ে আপনার দোস্ত টিক বানাউকে জিজ্ঞেস করছেন না কেন?' কিশোর বলল।

'টিক বানাউ? ওর সম্পর্কে আবার কি জান?'

'জানি, দু'জনেই গুপ্তধনের পিছে লেগেছেন,' বলল এড। 'কিন্তু নিতে পারবেন না, মনে রাখবেন একথা। চালাকিতে আমাদের সঙ্গে···।'

'চালাকি? তারমানে এখনও জান না ওগুলো কোথায় আছে? প্রফেসরও না? টিক বানাউ জানে?'

'কেন, সব কথা বলেনি নাকি আপনার দোস্ত?' হাসল কিশোর। 'বন্ধুকেও ঠকানোর চেষ্টা?'

দীর্ঘ এক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল নোবল। 'চারজন দেখেছি। তোমাদের অন্য দুই বন্ধু কোথায়?'

'জানার খুব ইচ্ছে বুঝি?' ব্যঙ্গ করল এড।

'বলব না,' কিশোর বলল।

'তারমানে জরুরি কোন কাজে গেছে। নিশ্চয় ড্যানিয়েলদের স্টোন ইয়ার্ডে, তাই না?'

জবাব দিল না কিশোর।

'তাহলে ঠিকই বলেছি,' আবার বলল নোবল। শব্দ করে হাসল একবার। তারপর উঠে চলে গেল।

'কপালই খারাপ আমাদের,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিশোর। 'তক্তার এমন জায়গায় পা দিয়েছি, একেবারে ধপাস। সাবধান থাকলেই পড়তাম না।'

'কিশোর!' আতঙ্ক চাপতে পারল না এড। 'জোয়ার! জোয়ার আসছে!'

শেষ বিকেলে ফ্যান্টম লেকের ডাই লজে ফিরে এল মুসা আর রবিন। সাড়া পেয়ে বেরিয়ে এলেন মিসেস ডাই। এড আর কিশোর ফেরেনি, জানালেন। ওরা জানাল, ড্যানিয়েলদের ইয়ার্ড থেকে কি জেনে এসেছে।

'এক টন স্পেশাল পাথর?' আনমনে বললেন মিসেস ডাই। 'ঈশ্বর, কেন? এই বাড়ি তৈরির জন্যে নিশ্চয়?'

'না, ম্যাডাম,' মুসা বলল। 'তখন এই বাড়ি তৈরি হয়ে গেছে।'

'পাথর দিয়ে আর কিছু বানানো হয়েছে, জানেন?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

ভাবলেন মিসেস ডাই। মাথা নেড়ে বললেন, 'না। আর কিছু না।'

'কিন্তু কিছু একটা নিশ্চয় বানানো হয়েছে,' মুসা বলল। 'এমন কিছু...।'

ইঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল। ওরা ভাবল ট্রাকটা, কিন্তু না। মিসেস ডাইয়ের পুরানো ফোর্ড। কাছে এসে থামল। ডিনো নামল, হাতে ছোট একটা জেনারেটর। 'দূর, কেউ ঠিকমত কাজ করে না এখানে,' খুব বিরক্ত সে। 'ক' মিনিটের কাজ? অযথা এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখল,' ছাউনিতে আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়েছিল যন্ত্রটা, মেরামত করিয়ে এনেছে, সেকথা জানাল ছেলেদের।

'ডিনো,' মিসেস ডাই বললেন। 'বাড়ি আর ছাউনি ছাড়া পাথর দিয়ে আর কি তৈরি হয়েছে এখানে, জান? এক টন পাথর।'

'পাথর?' ভ্রূকুটি করল ডিনো। 'এক টন?'

ড্যানিয়েলের কাছে কি কি জেনে এসেছে, আরেকবার বলল রবিন আর মুসা।

'কি জানি, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। আড়তে গেলে জানা যাবে বলছ?'

'হয়ত,' রবিন বলল। 'কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখন সাইকেল নিয়ে যেতে যেতে অন্ধকার হয়ে যাবে।'

'চল, আমি নিয়ে যাচ্ছি। ওদিকে এমনিতেও যেতাম, কাজ আছে। পথে তোমাদের নামিয়ে দিয়ে যাব। ফেরার সময় সাইকেল নিয়ে ফিরবে।'

ফোর্ডের বুটে সাইকেল তুলল রবিন। মুসা ঠেলেঠুলে পেছনে, সিটের ওপর রাখল। সামনে, ডিনোর পাশে উঠে বসল দু'জনে।

পুরানো আড়তের কাছে যখন পৌঁছল ওরা, তখন আলো রয়েছে। দুই গোয়েন্দাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল ডিনো।

আড়ত মানে বিশাল এক গর্ত, কিংবা ছোটখাটো এক পুকুর বলা চলে—এক পাড় থেকে আরেক পাড়ের দৈর্ঘ্য দু'শ ফুট। তলায় পানি জমে আছে। সর্বত্র মাথা

তুলে রেখেছে পাথর, পড়ন্ত সূর্যের আলোয় লাল। প্রায় পুরো পাহাড়ের গা থেকেই ওখানে পাথর কেটে নেয়া হয়েছে, কোথাও সিঁড়ির মত ধাপ ধাপ হয়ে আছে, কোথাও ছড়ানো চত্বর। ওরকম একটা চত্বরের ওপর দেখা গেল একটা জীর্ণ মলিন ছাউনি, পাহাড়ের কাঁধের ওপর। ছাউনির বাইরে একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে, ভেতরে আলো জ্বলছে।

'কেয়ারটেকার আছে,' মুসা বলল।

ছাউনির দিকে রওনা হল ওরা। খানিকটা যেতেই ভেতরের আলো নিভে গেল। বেরিয়ে এসে ট্রাকে উঠল একজন লোক।

চিৎকার করে ডাকল। ওরা, 'এই যে, স্যার···এই যে···।'

বেশ দূরে ট্রাকটা, ইঞ্জিনও চালু করে দেয়া হয়েছে, ফলে ওদের ডাক লোকটার কানে পৌছল বলে মনে হল না। দৌড় দিল ওরা। কিন্তু ততক্ষণে চলতে শুরু করেছে ট্রাক।

পাহাড়ী পথ ধরে ট্রাকটা চলে যাওয়ার পর ছাউনির সামনে এসে দাঁড়াল দু'জনে। দরজায় তালা দেয়া।

'দূর, আরেকটু আগে এলেই হত,' নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল মুসা।

ছাউনিটা ঘুরে দেখল রবিন। চারটে জানালা, খড়খড়ি লাগানো। বাইরে থেকে ভারি বোর্ড খাঁজে বসিয়ে, তার ওপর বার লাগিয়ে তালা দেয়ার ব্যবস্থা। 'ভেতরে ঢুকতে পারলে রেকর্ডগুলো দেখা যেত,' বলল সে।

'রবিন,' মুসা ডাকল। 'এটা খোলা। ঢোকা যাবে।'

'হুঁ। যাক, কপাল ভালই আমাদের।'

জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকল ওরা। পুরানো কাঠের ফাইল, আসবাবপত্র। একটা কেবিনেটে লেবেল লাগানো দেখল মুসাঃ ১৮৭০—১৯০০। ওটা খুলে ভেতর থেকে ১৮৯৬ লেখা ফাইলটা বের করল। এনে রাখল ডেস্কে।

পড়ার জন্যে ঝুঁকল রবিন।

বাইরে হালকা পায়ের শব্দ হল।

পাঁই করে ঘুরল রবিন। 'কে?'

বন্ধ হয়ে গেল খড়খড়ি। খাঁজে বসিয়ে দেয়া হল বোর্ডটা। বার লাগানোর শব্দ শোনা গেল পরিষ্কার। তারপর দ্রুত সরে গেল পায়ের আওয়াজ।

বন্দি হল দুই গোয়েন্দা।

ষোল

ফোকর দিয়ে তেরছা হয়ে রোদ এসে পড়েছে খোলে। বেশ কয়েকবার জোরে জোরে চিৎকার করে ক্ষান্ত দিয়েছে কিশোর আর এড, লাভ হয়নি। ভেজা দেয়ালে হেলান দিয়ে বসেছে এখন গলুইয়ের দিকটায়। মাঝে মাঝে শঙ্কিত চোখে তাকাচ্ছে বাড়ন্ত জোয়ারের জলের দিকে। একটু একটু করে উঠে আসছে ওদের কাছে।

'আর কতক্ষণ লাগবে, কিশোর?' শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল এড।

'ঘন্টা দুই। তবে ততক্ষণ থাকতে হবে না আমাদের। কেউ না কেউ এসে যাবেই।'

'কে আসবে? ডাকই তো কেউ শুনল না আমাদের।'

'আসবে। বোরিস। আমাদের না দেখলেই খোঁজা শুরু করবে।'

'কিন্তু আমরা এখানে আছি কি করে জানবে? কল্পনাই করবে না বার্জের মধ্যে ঢুকে বসে আছি।'

'আবার চেঁচাব। কেউ না কেউ শুনবেই।'

'হ্যাঁ, আর শুনেছে!'

কিন্তু আর চেঁচানোর দরকার হল না। ডেকের ওপর ভারি জুতোর শব্দ।

'কিশোর, ডাকব নাকি?'

'শ্‌শ্‌!' ঠোঁটে আঙুল রাখল কিশোর। 'শত্রু না মিত্র জানি না। আসুক আগে।'

প্রায় দম বন্ধ করে কান পেতে রইল ওরা। সাবধানে ভাঙা হ্যাচের দিকে এগিয়ে আসছে পদশব্দ। থেমে গেল। দীর্ঘ নীরবতার পর ডাক শোনা গেল, 'কিশোর? এইই কিশোর? এড্?'

বোরিস!

'বোরিসভাই!' গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল কিশোর। 'আমরা এখানে।'

তাড়াতাড়ি ফোকরের নিচে চলে এল দু'জনে।

'ওখান থেকে বের করুন আমাদের,' এড বলল। 'জলদি। পানি ভরে যাচ্ছে।'

'দাঁড়াও। আসছি।'

ডেকের ওপর দিয়ে আবার কিনারে চলে গেল পদশব্দ। কাঠ ভাঙার আওয়াজ শোনা গেল। খানিক পরেই ফিরে এল বোরিস, বার্জের কিনারে লাগানো মইটা খুলে নিয়ে এসেছে। ফোকর দিয়ে খোলে নামিয়ে দিল ওটা।

ডেকে বেরিয়ে এল দু'জনে।

'কত জায়গায় যে খুঁজলাম তোমাদের,' বোরিস বলল। 'আমাকে না জানিয়ে এলে কেন?'

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের খুঁজে পেলেন কি করে?'

'রাস্তায় দেখলাম, আইসক্রীমের দোকানে দেখলাম, কোথাও পেলাম না। শ্যাণ্ডলারের দোকানে ফিরে যাচ্ছি, এই সময় একটা ছেলে বলল বার্জে উঠতে দেখেছে তোমাদের। চলে এলাম।'

'একটা ছেলে দেখেছে আমাদের?' ভুরু কোঁচকাল কিশোর।

'সে আমাদের সাহায্য করল না কেন তাহলে?' এড বলল।

'হ্যাঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'ছেলেটা কোথায় এখন?'

'চলে গেছে। আমাকে বার্জটা দেখিয়ে দিয়েই দৌড়ে চলে গেল। ওহ্হো, ভুলেই গেছি, মিস্টার ডাইক তাঁর বাবার সঙ্গেও কথা বলেছেন। বুড়ো থুরথুরে, এখনও বেঁচে আছেন ভদ্রলোক। বাওরাড ডাই কি কিনেছিল, তিনিও কিছু বলতে পারলেন না। তবে একটা সূত্র দিয়েছেন।'

'কী?' আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'বললেন, তখন যত জিনিস বিক্রি করত ডাইক কোম্পানি, পিতলের প্লেটে নিজেদের নাম খোদাই করে লাগিয়ে দিত জিনিসের ওপর।'

'কিশোর,' এড বলল। 'চল, বাড়ি গিয়ে খোঁজা শুরু করি।'

'হ্যাঁ, জলদি করা দরকার,' জরুরি কণ্ঠে বলল কিশোর। 'ভুলেই গেছিলাম, রবিন আর মুসা কোথায় গেছে জানে নোবল! বিপদে পড়বে ওরা!'

লজের ঘরে ঘরে ক্রিস্টমাস লাইট জ্বলছে। ড্রাইভওয়েতে ট্রাক রাখল বোরিস। এক লাফে নেমে বাড়ির দিকে দৌড় দিল কিশোর আর এড। পিছে পিছে এল বোরিস। অনেক দেরি হয়ে গেছে, রাশেদ পাশাকে ফোন করে জানাবে ওরা ভাল আছে।

লিভিংরুমে দাঁড়িয়ে আছে মিসেস ডাই। ফায়ারপ্লেসে গনগন করে জ্বলছে আগুন।

'মাআ! আমাদের বাড়িতে এমন কিছু আছে, যার ওপরে পেতলের প্লেটে লেখা ডাইক অ্যাণ্ড সনস?' সান্তা বারবারায় যা যা জেনে এসেছে সব মাকে জানাল এড।

'ও, বাওরাড কি কিনেছেন জানতে পারনি তাহলে?' ভুরু ডললেন মিসেস ডাই। 'পেতলের প্লেট? পুরানো অনেক জিনিসেই তো ওরকম প্লেট লাগানো আছে। তখন ওটাই চল ছিল। কিন্তু কোনটাতে ডাইক কোম্পানির নাম আছে বলে তো মনে পড়ছে না।'

'ভাল করে ভেবে দেখ, মা।'

'রবিনরা ফেরেনি?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'ফিরেছিল। আমাকে বলেছে, ড্যানিয়েলদের ওখান থেকে এক টন পাথর কিনেছিলেন বাওরাড। কি পাথর, কি সাইজ, দেখতে কেমন, বলতে পারেনি। তাই ডিনোর সঙ্গে ড্যানিয়েলদের পুরানো আড়তে গেছে, ওখানকার অফিসে, রেকর্ড দেখতে। কিন্তু গেছে তো অনেকক্ষণ...।'

'এখনও ফেরেনি?' গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লকটার দিকে তাকাল কিশোর। প্রায় সাতটা বাজে।

'না। ডিনোও তো ফিরল না...।'

বিচিত্র একটা শব্দ হল। বাড়ির পেছনে দূরে কোথাও। ফোন শেষ করে সবে ঢুকছিল বোরিস, শুনে সে-ও থমকে গেল।

'তখন থেকেই শুনছি,' মিসেস ডাই বললেন। 'এক ঘন্টা ধরে, মাঝে মাঝেই। কিসের শব্দ?'

'দেয়াল ভাঙছে মনে হয় কেউ,' বোরিস বলল।

'দেয়াল? আমাদের কাছাকাছি তো কেউ থাকে না। তবে ওদিকে...।'

'ওদিকে কি?' এড বলল। 'ওদিকে তো কোন দেয়াল নেই।'

'দেখনি হয়ত। ওদিকে একটা স্মোকহাউস আছে। বহুদিন ব্যবহার হয় না, তোমার বাবা যখন ছোট, তখন থেকেই। বলতে ভুলে গেছি...।'

'স্মোকহাউস?' কিশোর বলল। 'পাথরের স্মোকহাউস?'

'হতে পারে। আমিও ভালমত দেখিনি। দূর থেকে দেখেছিলাম, লতা, গাছগাছড়ায় ঢেকে ফেলেছে।'

'বোরিসভাই, ট্রাক থেকে লণ্ঠনটা নিয়ে আসুন, কুইক।'

বৈদ্যুতিক লণ্ঠনটা নিয়ে এল বোরিস। ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন মিসেস ডাই। পথ আর নেই এখন, জঙ্গল আর আগাছার রাজত্ব। কনকনে ঠাণ্ডা পড়েছে।

আধমাইল মত গিয়ে একটা কাঠের কুঁড়ে দেখা গেল। ওটার পাশ দিয়ে চলতে চলতে মিসেস ডাই বললেন, 'বাওরাডের আমলে মজুরদের ঘর ছিল এটা।'

'স্মোকহাউসটাও কি বাওরাডই বানিয়েছিলেন?' কিশোর জানতে চাইল।

'জানি না,' অন্ধকারে একদিকে হাত তুলে দেখালেন মিসেস ডাই। 'ওখানেই কোথাও আছে।'

বাড়ি মারার শব্দ থেমে গেছে। রাস্তা থেকে ঘন ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে এগোল ওরা। ভাঙা ডাল, দোমড়ানো পাতা, ছেঁড়া লতা বুঝিয়ে দিচ্ছে এখান দিয়ে গিয়েছে কেউ। স্মোকহাউসটা দেখা গেল। হাউস মানে ধসে পড়া পাথরের স্তূপ।

'ভেঙে ফেলেছে!' বলে উঠলেন মিসেস ডাই।

'গুপ্তধন খুঁজেছে!' উত্তেজনায় কাঁপছে এড।

'নিশ্চয় নোবলের কাজ,' কিশোর বলল। 'টিক বানাউও হয়ত ছিল সঙ্গে। সান্তা বারবারা থেকে ফিরে এসে এই কাজ করেছে। কিন্তু স্মোকহাউসের কথা কি করে জানল...?'

বড় একটা হাতুড়ি কুড়িয়ে নিল বোরিস। 'হাতলটা এখনও গরম।'

কান পেতে রইল ওরা। কোন শব্দ শোনা গেল না। লণ্ঠনের আলোয় স্মোকহাউসের পাথরগুলো দেখছে কিশোর।

'নিরেট পাথর,' আনমনে বিড়বিড় করল সে। 'ফাঁপা-টাপা নেই যে ভেতরে কিছু থাকবে। সবখানে মাকড়সা।...কিছু টেনে নেয়ার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না।'

আলগা পাথর পা দিয়ে সরিয়ে দেখছে এড। 'কিশোর, লেখা!'

লণ্ঠনটা কাছে নিয়ে এল বোরিস। পাথরের ওপর থেকে বালি মুছতেই স্পষ্ট হল লেখাটাঃ 'ই. ডাই। ১৯০৫।'

'আমার দাদা-শ্বশুর,' মিসেস ডাই বললেন। 'তাঁর নাম ছিল এডওয়ার্ড ডাই।'

'তারমানে বাওরাড বানাননি এই স্মোকহাউস,' হাসল কিশোর। 'আপনার দাদা-শ্বশুর বানিয়েছিলেন। এখানে গুপ্তধন থাকার কথা না। চলেন, যাই।'

লজে ফিরে ইয়ার্ডের ট্রাকের পাশে প্রফেসরের স্টেশন ওয়াগনটা দেখা গেল। গায়ে হালকা সুট, সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপছেন। 'ইস্, সাংঘাতিক শীত পড়েছে ক্যালিফোরনিয়ায়।' হাসলেন। 'খবর কি জানতে এলাম।'

গরম লিভিংরুমে আগুন আর ক্রিস্টমাস ট্রী-র সামনে বসে, সান্তা বারবারায় কি কি করে এসেছে প্রফেসরকে জানাল কিশোর।

'পিতলের প্লেট? টিক আর নোবেল দু'জনেই গিয়েছিল? হুঁম্‌ম্,' মাথা দোলালেন প্রফেসর। 'তা, পিতলের প্লেটটা পাওয়া গেছে?'

'না, স্যার,' এড বলল। 'আসলে খুঁজিইনি এখনও।'

'মুসা আর রবিনের আসার অপেক্ষায় আছি,' বলল কিশোর। কোথায়, কি জন্যে গেছে ওরা, সেকথাও জানাল প্রফেসরকে। ঘড়ির দিকে চেয়ে অস্বস্তি বাড়ল তার। 'ডিনো নিয়ে গেছে, না?...ওই যে, এল বোধহয়।'

ফোর্ডটাই এসেছে, ইঞ্জিনের শব্দেই বোঝা গেল। হাত ডলতে ডলতে ঘরে ঢুকল ডিনো। একা।

'ওরা কোথায়?' জিজ্ঞেস করলেন মিসেস ডাই।

'ফেরেনি এখনও? তাহলে নিশ্চয় আড়তে, যেখানে নামিয়ে দিয়েছি।' এডের দিকে তাকাল ডিনো। 'সান্তা বারবারা থেকে কি রত্ন জোগাড় করে আনলে?'

সংক্ষেপে বলল এড। শেষে বলল, 'প্লেটটা এখনও খুঁজতে পারিনি। নানা রকম ঝামেলা...রবিন আর মুসা আসছে না। ওদিকে স্মোকহাউসটা ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলেছে কে জানি।'

'স্মোকহাউস? ও, হ্যাঁ...,' ঘড়ি দেখল ডিনো। 'ছেলেগুলো এল না কেন এখনও? এতক্ষণ তো লাগার কথা না।'

'পাথরের স্মোকহাউস?' প্রফেসর বললেন। 'কি করে জানল...?'

প্রশ্ন শেষ হওয়ার আগেই জবাব দিল এড, 'রবিন আর মুসার সঙ্গে কথা বলেছে হয়ত।'

'কিংবা ড্যানিয়েলদের সঙ্গে নোবেলও দেখা করেছে,' বলল কিশোর। 'নাহ্, বেশি দেরি করছে। আড়তটার কথা নোবলও জেনে গেল না তো? সহজেই একজন পিছু নিতে পারে ওদের।'

'তা-ই করেছে।' লাফ দিয়ে উঠে দরজার দিকে রওনা হয়ে গেলেন প্রফেসর। 'নিশ্চয় বিপদে পড়েছে ওরা। জলদি এস।'

সতের

আড়তে কোথাও বাতি দেখা গেল না। শুধু তারার আলোয় আবছা মত চকচক করছে পাথরগুলো। গর্তের নিচে কালো অন্ধকার।

সাইকেল দুটো ডিনো আগে দেখল। 'এখানেই রেখে গিয়েছিলাম ওদের। ওরা এখানেই কোথাও আছে। নইলে সাইকেল থাকত না।'

টর্চের আলোয় পাহাড়ের কাটা ধাপগুলোকে মনে হল যেন কোন দানবের সিঁড়ি। গর্তের পানিতে প্রতিফলিত হল আলো। কালো ময়লা পানির দিকে তাকিয়ে প্রফেসর বললেন, 'পিছলে পড়েনি তো?' কণ্ঠ কেঁপে উঠল তার। 'তাহলে...।'

'থাক থাক, আর বলবেন না,' ভয় পেয়েছে এড।

সিঁড়িগুলো ভালমত দেখছে কিশোর, চকের চিহ্ন খুঁজছে। কার্ডে চিহ্ন না থাকলেও তিন গোয়েন্দার নতুন চিহ্ন নির্ধারিত হয়েছে 'তারকা'। পাওয়া গেল না।

টর্চ আর লণ্ঠন নিয়ে আশেপাশে অনেক জায়গায় খোঁজা হল। কোন চিহ্ন নেই, যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে দুই গোয়েন্দা। শুধু পাথরের সিঁড়ি, গর্তের পুরানো দেয়ালের ফাঁকে ফাঁকে জন্মে থাকা প্রায় বিকলাঙ্গ উদ্ভিদ, আর অসংখ্য পাথর—ছোট-বড়-মাঝারি, নানা রকমের, নানা আকারের।

অন্ধকারে হুটোপুটি করছে ছোট ছোট জীব। দুটো সাপ দেখল ওরা, এক পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে আরেক পাথরের তলায় গিয়ে লুকাল। কয়োট

ডাকল দূরে। নিশাচর বড় পাখি ডানায় ভারি শব্দ তুলে উড়ে যাচ্ছে গাছ থেকে গাছে। খাবারের সন্ধানে ছায়ার মত নিঃশব্দে মাথার ওপর চক্কর মারছে দুর্দান্ত শিকারী হুতোম পেঁচা।

রবিন আর মুসার কোন সাড়াশব্দ নেই।

আড়তের প্রায় পুরো সীমানাটাই ঘুরে এসেছে ওরা, এই সময় শোনা গেল আওয়াজ।

'শুনছ!' ফিসফিসিয়ে বলল বোরিস।

কাছেই হচ্ছে শব্দটা, ধাতব।

'দেখা যায় কিছু?' এড জিজ্ঞেস করল।

'না,' বললেন প্রফেসর।

আবার হল শব্দ, কাঠের সঙ্গে কাঠের ঘষা, তারপর কাঠের সঙ্গে ধাতব কিছুর।

'ওই যে!' নিচু কণ্ঠে বলল কিশোর। 'একটা ছাউনি না? মনে হয় ওখান থেকেই আসছে।'

ছাউনিতে শব্দ হচ্ছে। খটখট ঝনঝন করে উঠল কি যেন, ছুট দিল কেউ। টর্চ জ্বালল ডিনো। পাতলা একটা মূর্তিকে ছুটে যেতে দেখা গেল ছাউনির কাছে পার্ক করা ছোট একটা গাড়ির দিকে।

'নোবল!' চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর। 'ধর, ধর ব্যাটাকে!'

'আরে, পালিয়ে যাচ্ছে তো, ধর না,' গর্জে উঠল ডিনো।

'এই নোবল, দাঁড়াও। থাম!' প্রফেসর বললেন।

থামল না সে। পৌঁছে গেছে সবুজ ফোক্সওয়াগেনের কাছে। গাড়িতে উঠে ইঞ্জিন স্টার্ট দিল। ওটার কাছে কেউ যাওয়ার আগেই শাঁ করে বেরিয়ে গেল কাঁচা রাস্তা ধরে।

'আবার পালাল!' তিক্তকণ্ঠে বললেন প্রফেসর। 'শয়তান কোথাকার!'

নোবলের ব্যাপারে মাথাব্যথা নেই কিশোরের। 'রবিন আর মুসা কোথায়? ওদের কি করল সে?'

ঢোক গিলল এড। নীরব হয়ে রইল অন্যেরা। অন্ধকারে দেখার চেষ্টা করছে কিশোর। গলা চড়িয়ে ডাকল, 'রবিইন! মুসাআ!'

পাহাড়ের পাথুরে দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলল তার ডাক। কেঁপে কেঁপে সেই শব্দের রেশ মিলানোর আগেই এল জবাব, 'কিশোওর! আমরা এখানে-এ-এ!'

ক্ষণিকের জন্যে স্থির হয়ে গেল সবাই।

আবার শোনা গেল একই কথা, 'কিশোওর! আমরা এখানে এ-এ!'

'আরে দেখ,' প্রফেসর বললেন। 'ছাউনিতে আলো।'

হঠাৎ জ্বলেছে আলোটা। দরজা আর একটা জানালার আবছা কাঠামো চোখে পড়ছে। দৌড় দিল কিশোর। পেছনে অন্যেরা। দরজার কাছে এসে তালা ধরে ঝাঁকি দিল। ভেতর থেকে মুসা বলল, 'ডানপাশে চলে যাও। একটা জানালায় তালা নেই দেখবে।'

জানালার কাছে ছুটে গেল ডিনো। বার খুলে, বোর্ড সরাল। খড়খড়ি তুলে উঁকি দিল দুই গোয়েন্দা।

'খাইছে!' হাসিমুখে বলল মুসা। 'ভেবেছিলাম আজ রাতে বেরোতে পারব না।'

'লোকের সাড়া পেয়ে আলো নিভিয়ে দিয়েছিলাম,' রবিন বলল। 'ভেবেছি, শত্রু। শত্রুই। দরজার তালা ভেঙে ঢোকার চেষ্টা করেছে, পারেনি। শেষে এই জানালাটা খুঁজে বের করেছে। বার খোলার আগেই বোধহয় তোমরা এসে গেলে।'

'নোবল শয়তানটা এসেছিল,' তপ্তকণ্ঠে বললেন প্রফেসর।

'ও নিশ্চয় আটকায়নি তোমাদের,' ডিনো বলল। 'কতদূর কি হয়েছে দেখতে এসেছিল বোধহয়, আমাদের দেখে পালিয়েছে।'

'যাকগে। বেরিয়ে এস,' বোরিস বলল।

মাথা নাড়ল রবিন। 'আপনারা ভেতরে আসুন। একটা সূত্র পাওয়া গেছে।'

উত্তেজিত হয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল এড। তারপর কিশোর। একে একে অন্যেরাও ঢুকল। বিশাল শরীর নিয়ে ছোট জানালা দিয়ে ঢুকতে বেশ অসুবিধে হল বোরিসের।

ডেস্কের ওপর রাখা ফাইলটা দেখাল রবিন।

'স্পেশাল অর্ডার নম্বর একশো তেতাল্লিশ,' জোরে জোরে পড়ল কিশোর। 'বি. ডাইয়ের জন্যে লাগবেঃ দশটা স্কয়ার-কাট মনুমেন্ট স্টোনস। গ্র্যানিটের। দেখতে একই রকম হওয়া চাই সবগুলো।' মুখ তুলল গোয়েন্দাপ্রধান। 'মনুমেন্ট স্টোনস?'

'এত বড় পাথর দিয়ে কি করেছিল বাওরাড ডাই?' মুসা বলল। 'স্মৃতিসৌধ বানিয়েছে?'

নীরবে মাথা নাড়ল শুধু কিশোর, কি বোঝাতে চাইল বোঝা গেল না।

'ফ্যান্টম লেকে কোন স্মৃতিসৌধ নেই,' ডিনো বলল।

'কাছাকাছি অন্য কোথাও আছে?' জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর।

'কোন শহরে গিয়ে বানায়নি তো?' এড বলল।

'না,' ধীরে ধীরে বলল কিশোর। 'আমি শিওর, নোরিয়ার চমক ফ্যান্টম লেকেই অপেক্ষা করছে। জার্নালের লেখার আর কোন মানে হতে পারে না।

নোরিয়ার চমক বানানোর জন্যে প্রতিবারেই “বাড়ি” ফিরে এসেছেন বাওরাড।'

'কিন্তু সেটা লুকাল কিভাবে?' প্রফেসর বললেন। 'এমনই বুদ্ধি করে লুকিয়েছে, এত বছরেও কারও চোখে পড়ল না।'

'তাকালেই হয়ত দেখি,' রবিন বলল। 'সে-জন্যেই চোখে পড়ে না। চোখের সামনে যে জিনিস থাকে, সেটাই সহজে চোখে পড়ে না।'

'চোখে পড়ার দরকার নেই,' হঠাৎ বলে উঠল মুসা। 'জাহান্নামে যাক গুপ্তধন। আগে খাওয়া দরকার। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।'

হেসে উঠল সবাই। ছিন্ন হল টান টান উত্তেজনা, হালকা হয়ে গেল পরিবেশ।

'চল, আমাদের ওখানেই খাবে,' আমন্ত্রণ জানাল এড। 'ফোন করে বাড়িতে জানিয়ে দিয়ো।'

'উত্তম প্রস্তাব,' হেসে বললেন প্রফেসর। 'আমার মত বুড়োকে খাওয়াতেও নিশ্চয় মুখ কালো করবেন না মিসেস ডাই।'

আঠার

খাওয়ার পর কথা বলার জন্যে সবাই এসে বসল লিভিংরুমে।

'টিক আর নোবল একসঙ্গে কাজ করছে,' প্রফেসর বললেন। 'এখন ব্যাপারটা পরিষ্কার।'

'প্রমাণ করতে পারব না, স্যার,' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'যাক, সেটা পরে দেখা যাবে। আগে, ধাঁধা রহস্যের সমাধান হয় কিনা দেখি। বোঝাই যাচ্ছে, নোরিয়ার জন্যে একটা ধাঁধা তৈরি করেছিলেন বাওরাড, চেয়েছিলেন, স্ত্রী সেটার সমাধান করুক।'

'একশো বছর আগে চেষ্টা করলে হয়ত করা যেত,' ডিনো বলল। 'কিন্তু এখন সেটা অসম্ভব।'

গরম হয়ে এড বলল, 'গুপ্তধন বেরোক, এটা তুমি চাও না নাকি, চাচা?'

গাল ফুলিয়ে বলল ডিনো, 'বেশ, কর বের। আমি আর কোন কথা বলব না।'

বাওরাড ডাইয়ের চিঠিটা কোলের ওপর বিছিয়ে পাতলা জার্নালটা খুলল কিশোর। কাছে সরে এল রবিন, মুসা আর এড।

'পাউডার গালচ থেকেই শুরু করা যাক,' কিশোর বলল। 'স্লুস টিম্বার আর শ্রমিকের জন্যে পাউডার গালচে গিয়েছিলেন বাওরাড। খাবার কিনেছিলেন অনেক। তাতে মনে হয়, বেশ বড়সড় কাজের পরিকল্পনা করেছিলেন।

'তারপর গিয়েছিলেন ক্যাবরিলো আইল্যাণ্ডে। কোন একটা প্রস্তাব দেন দ্বীপের

মালিককে, তাতে রাজি হয় সে। তারপর নৌকায় মাল বোঝাই করে ফিরে আসেন। দ্বীপ থেকে কোন জিনিস আনেন এখানে।

'তার পর, ড্যানিয়েল ব্রাদার্সদের কাছ থেকে কেনেন দশটা বর্গাকৃতি মনুমেন্ট স্টোনস।

'আর সব শেষে, সান্তা বারবারার ডাইক কোম্পানির কাছ থেকে এনেছিলেন কোন জিনিস। এমন কিছু, যা জাহাজে দরকার হত। কারণ, একমাত্র জাহাজের মালই সরবরাহ করে ডাইক কোম্পানি। জিনিসটা, বা জিনিসগুলোর ওপর পিতলের প্লেট লাগানো, তাতে কোম্পানির নাম খোদাই করা।'

হেসে উঠল ডিনো। কথা বলবে না বলেছে বটে, কিন্তু কিশোর থামতেই প্রতিজ্ঞা ভুলে বলে উঠল, 'গবেষণা তো ভালই করেছ। এসব দিয়ে এখন কি ভূত ধরবে?'

তার কথার জবাব দিল না কেউ। কড়া চোখে একবার ডিনোর দিকে তাকিয়ে কিশোরের দিকে ফিরলেন মিসেস ডাই। 'তোমরা যাওয়ার পর সারা বাড়ি খুঁজেছি আমি। পিতলের কোন প্লেটে ডাইক কোম্পানির নাম দেখলাম না। জিনিসটা কি?'

'আমিও জানি না,' কিশোর বলল।

'বড় কিছু নিশ্চয়,' এড বলল।

'লুস টিম্বার আর শ্রমিক দিয়ে কি করল বাওরাড?' প্রফেসরের প্রশ্ন। 'কোথায় গেল এত কাঠ?'

'আর পাথরগুলোই বা কোথায়?' রবিনেরও প্রশ্ন। 'দশটা পাথর ছোট জিনিস না যে সহজে লুকিয়ে ফেলবে।'

'এইই!' কি মনে হতে চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'খনির শ্রমিকেরা সব চেয়ে ভাল কি পারে? কিশোর, তুমিই না বল, সহজ ব্যাখ্যাগুলোর ওপর জোর দিতে। ওরা সব চেয়ে ভাল পারে মাটি খুঁড়তে। বড় গর্ত খুঁড়ে, পাথরগুলোর ভার রাখার জন্যে টিম্বার ব্যবহার করেছে হয়ত ওরা। হয়ত মাটির তলার কোন ঘরে।'

পায়চারি করছিলেন প্রফেসর, মুসার কথায় থেমে গেলেন। 'গর্ত? মাটির তলার ঘরে?'

'কেন নয়?' জোর দিয়ে বলল মুসা। 'মাটির তলার ঘরই গুপ্তধন লুকানোর আসল জায়গা। হয়ত ডাইক কোম্পানি থেকে জাহাজের লণ্ঠন কিনে এনেছিল বাওরাড ডাই। অন্ধকার ঘরে কাজ করেছে তো, বেশি আলোর প্রয়োজন ছিল।'

'তাহলে ক্যাবরিলো আইল্যাণ্ড থেকে কি এনেছিলেন?' ভুরু নাচাল কিশোর। 'তাছাড়া, মাটির তলার ঘরে রাখলে নোরিয়ার জন্যে চমক হবে না, নতুন কোন ব্যবস্থা নয় ওটা। আগে আরও অনেকেই মাটির তলার ঘরে গুপ্তধন লুকিয়েছে।

নোরিয়ার চমকের ওপরই বেশি জোর দিয়েছেন বাওরাড, তারপর গুপ্তধন।'

আবার পায়চারি শুরু করলেন প্রফেসর। চলে গেলেন জানালার কাছে, ডিনো যেখানে বসেছে। 'এ-বাড়িতে ওরকম কোন ঘরের কথা জানেন, মিস্টার হ্যাংবার?'

'না,' কাটা জবাব। 'যত্তোসব।'

জানালা দিয়ে পুকুরটার দিকে তাকালেন প্রফেসর, আর কালো গাছগুলোর দিকে। ঘুরলেন হঠাৎ, চোখ উজ্জ্বল। 'মুসা, ঠিক বলেছ তুমি! স্কটল্যাণ্ডে পাহাড়-পর্বতও যেমন আছে, গুহারও অভাব নেই। মিসেস ডাই, চিঠিতে বলা হয়েছে, বাওরাড ব্যাড়িতে কি ভালবাসত মনে করে দেখার জন্যে। যদি…'

'…ছেলেবেলায় গুহার ভেতর খেলার কথা বলে থাকে?' প্রফেসরের কথাটা যেন মুখ থেকে কেড়ে নিল কিশোর। 'সেটা নোরিয়ার জানার কথা!'

'এখানেও হয়ত তেমন একটা গুহা বানিয়েছে,' প্রফেসর বললেন। 'ক্যাবরিলো আইল্যাণ্ড থেকে নিয়ে এসেছে পুরানো স্প্যানিশ আসবাবপত্র আর গালিচা, গুহায় সাজানোর জন্যে।'

'আর সেই সঙ্গে একটা আয়নাও!' যোগ করল রবিন।

জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল প্রফেসর। 'আমার মনে হয়, এইটাই জবাব,' তুড়ি বাজালেন তিনি। 'কায়দা করে বানিয়েছে গুহা, যাতে গুহামুখটা চোখ এড়িয়ে যায়। আর এড়াতে দেব না। কাল সকালে উঠেই আগে গুহাটা খুঁজে বের করব।'

'এখনই নয় কেন?' মুসা বলল। 'বাতি তো আছেই।'

মাথা নাড়লেন প্রফেসর। 'যা অন্ধকার, বাতি দিয়ে বের করা যাবে না। তাছাড়া সবাই এখন ক্লান্ত। দিনেই ভাল হবে।'

'হ্যাঁ,' মিসেস ডাই বললেন। 'গুপ্তধন তো পালাচ্ছে না। তাড়াহুড়োর দরকার নেই।'

'কিন্তু নোবল আর টিক পেছনে লেগে রয়েছে,' এড প্রতিবাদ করল। 'কখন কি করে ফেলে…।'

'রাতে ওরাও কিছু পাবে না,' প্রফেসর বললেন।

ছেলেরাও বুঝতে পারছে সেকথা। কিন্তু এত লম্বা একটা রাত অপেক্ষা করা খুব কঠিন, উত্তেজনায় ঘুমই হবে না ওদের।

'তাহলে ওই কথাই রইল,' তিনি বললেন। 'কাল সকালে সবাই মিলে খুঁজতে যাব আমরা।'

'সবারই মধ্যে আমি নেই,' দু'হাত নাড়ল ডিনো। 'যত্তোসব পাগলামি।'

প্রফেসর চলে গেলেন।

তিন গোয়েন্দা আর বোরিস ফিরে চলল রকি বীচে।

ট্রাকের পেছনে উঠেছে ছেলেরা। কিছুক্ষণ চলল নীরব যাত্রা। তারপর কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, বল তো, গুহার নির্দেশক কি দিয়ে দিতে পারে?'

'বড় পাথর,' মুসা বলল।

'কিংবা গাছ,' বলল রবিন। 'ডাইদের স্কটল্যাণ্ডের বাড়িতে আছে, তেমন দেখতে কোন গাছ।'

'হ্যাঁ, তা হতে পারে।'

'আয়না!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'পাথরে লাগানো থাকতে পারে, গাছে ঝোলানো থাকতে পারে। কোন বিশেষ জায়গায় দাঁড়ালে হয়ত নোরিয়ার চোখে পড়ত।'

'বাড়ির জানালায় থেকে?' নিজেকেই প্রশ্ন করল কিশোর। 'নাকি লজের টাওয়ারের মাথায় দাঁড়িয়ে?'

জবাব মিলল না।

রকি বীচে ঢুকল ট্রাক।

'একটা কথা মেলাতে পারছি না,' আনমনে বলল গোয়েন্দাপ্রধান। 'লকের গোপন রহস্যের কথা ভাবতে বলেছেন বাওরাড। গোপন রহস্য মানে সেই ভূত, যে লকে শত্রু ঢোকে কিনা নজর রাখে। এর সঙ্গে গুহার মিল পাচ্ছি না।'

'গুহাটা পেলেই হয়ত মানে বোঝা যাবে,' আশা করল মুসা।

'হয়ত।'

রবিন আর মুসাকে যার যার বাড়িতে দিয়ে এল বোরিস। তারপর ঢুকল স্যালভিজ ইয়ার্ডে।

এত বেশি উত্তেজিত হয়ে আছে কিশোর, ঘুম নেই চোখে। শেষে হলঘরে চাচা-চাচীর কাছে এসে বসল। গরম চকলেট খেতে খেতে জানাল, সারাদিন কি কি করেছে, কোথায় কোথায় গেছে। চাচা কোন মন্তব্য করলেন না। চাচী বললেন, হ্যাঁ, গুপ্তধনের সঙ্গে গুহার মিলই বেশি।

বিছানায় শুয়েও ঘুম এল না তার। উঠে গিয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখল ক্রিস্টমাসের আলো।

ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে গেল কিশোর। তড়াক করে উঠে বসল বিছানায়। চোখ মিটমিট করল কয়েকবার। জানালায় আলো নেই, বাইরে অন্ধকার। কিন্তু ঘড়িতে দেখা যাচ্ছে, সকাল আটটা। সকাল হয়েছে ঠিকই, বৃষ্টির জন্যে আলো ফুটতে পারছে না ঠিকমত। খুব জোরেসোরে নেমেছে।

কিন্তু বৃষ্টির কথা ভাবছে না কিশোর।

বিছানায় বসেই তাকিয়ে রইল দেয়ালের দিকে। ধাঁধার রহস্য ভেদ করে ফেলেছে সে।

উনিশ

কাপড় পরে মুসা আর রবিনকে ফোন করল কিশোর। পনের মিনিটের মধ্যে ইয়ার্ডে পৌছতে বলল। 'আমি একটা গাধা!' বিড়বিড় করল সে। 'আস্ত গর্দভ! অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল।' এডকে ফোন করল। সে ধরতেই বলল, 'এড? গুপ্তধন কোথায়, জানি। গাঁইতি, বেলচা আর রেনকোট নিয়ে তৈরি থাক। আমরা আসছি।'

নিচে নেমে তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নিল। দুধের গেলাসে সবে মুখ লাগিয়েছে, এই সময় বাজল টেলিফোন। প্রফেসর কেইন।

'কিশোর? গুহাটার কথা অনেক ভাবলাম। কি করে চেনা···।'

'গুহা-টুহা নেই, স্যার। জবাব এখন আমার জানা।'

'কী?' এত জোরে চিৎকার করে উঠলেন প্রফেসর, কান থেকে রিসিভার সরাতে হল কিশোরকে। 'গুহা নেই? তাহলে···কোথায়, কিশোর? জলদি বল।'

'ফ্যান্টম লেকে চলে আসুন। আমরাও যাচ্ছি। ওখানেই বলব।'

দশ মিনিট পরেই এসে হাজির হল রবিন আর মুসা। আগেই ট্রাক বের করে রেখেছে বোরিস। সামনের সিটে গাদাগাদি করে বসল চারজন।

'বল, কিশোর,' রবিন বলল।

'হ্যাঁ, বল,' প্রতিধ্বনি করল যেন রবিন।

মুচকি হাসল কিশোর। 'ঘুমিয়ে ছিলাম। রবিনের একটা কথা ভাবছিলাম ঘুমানোর আগে। সকাল বেলা হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে গেল সব।'

'কি বলেছিল রবিন?'

'বলেছিল, কোন বিশেষ গাছ লাগিয়েছে বাওরাড। হ্যাঁ, তা-ই করছে।'

'গাছ?' বুঝতে পারছে না মুসা।

'গাছ। যেটা দেখে বাড়ির কথা নোরিয়ার মনে পড়বে ভেবেছিল বাওরাড। ক্যাবরিলো আইল্যাণ্ড নিয়ে এসেছিল ওটা, বাঁকাচোরা ভূতের মত দেখতে এক সাইপ্রেস। ভূতুড়ে হ্রদে ভূত এনে লাগিয়েছিল।'

'তারমানে, ফ্যান্টম লেকে গিয়ে এখন পুরানো ভূতটাকে খুঁজে বের করলেই হল?' রবিন বলল।

'কিন্তু কোথায় খুঁজব?' মুসা বলল। 'গাছ কি একটা দুটো? ফ্যান্টম লেকে গাছের জঙ্গল।'

'ভাব ভালমত, মাথা খাটাও,' হাসল কিশোর। 'খনি-শ্রমিক, স্লুস টিম্বার, পাউডার গালচ। তুমিই তো বললে, ওরা সবচেয়ে ভাল পারে মাটি খুঁড়তে। গর্ত। আর স্লুস টিম্বারের ব্যাপারে একটা অতি জরুরি তথ্য উপেক্ষা করে গেছি আমরা। কেন ওই জিনিস আনতে গেল বাওরাড? কেন সাধারণ তক্তা নয়, বা মাইনিং টিম্বার নয়?'

'কেন, বল?'

'কারণ, স্লুস টিম্বার বিশেষ ভাবে কাটা হয়, পানি ধরে রাখার জন্যে। চতুর বাওরাড করেছে উল্টোটা। পানি ঠেকিয়ে রাখার জন্যে ব্যবহার করেছে।'

'কোথায়?' উত্তেজনায় প্রায় কাঁপছে রবিন।

'বিরাট গর্তটায়, শ্রমিকরা যেটা খুঁড়েছে। খোঁড়ার সময় পানি ওঠে, সেটা ঠেকানোর জন্যেই ব্যবহার হয়েছে স্লুস টিম্বার। পাথরগুলোকে ধাপে ধাপে সাজিয়ে সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করেছে। মুসা, তোমার কথাই ঠিক। ডাইক কোম্পানি থেকে লণ্ঠনই কেনা হয়েছে।'

'দ্বীপটা!' একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল রবিন আর মুসা।

'হ্যাঁ। এটাই নোরিয়ার চমক। সবাই ভেবেছে, দ্বীপওয়ালা পুকুরটা দেখেই বাওরাড জায়গা পছন্দ করেছে, বাড়ি করেছে, স্কটল্যাণ্ডের বাড়ির মত দেখায় বলে। আসলে তা নয়। দ্বীপটা বানানো হয়েছে, স্কটল্যাণ্ডে যেটা আছে সেটার নকল।

'নিশ্চয় ছোট একটা উপদ্বীপ মত ছিল প্রথমে, পুকুরে নেমে এসেছিল ওটা। সেটা কেটে মূল ভূখণ্ড থেকে আলাদা করার সময়ই ব্যবহার হয়েছে স্লুস টিম্বার, কাটা জায়গায় পাথরগুলো ফেলে আবার ছেড়ে দেয়া হয়েছে পানি। দ্বীপে একটা দণ্ডের মাথায় লণ্ঠনটা লাগিয়ে দিয়েছে বাওরাড। সাইপ্রেসটা পুঁতেছে স্কটল্যাণ্ডের ভূতের গুজব মনে করিয়ে দেয়ার জন্যে, অবশ্যই নোরিয়াকে।

'বাড়িতে যা ভালবাসত বাওরাড, সেটারই একটা খুদে সংস্করণ তৈরি করেছে ফ্যান্টম লেকে। ওটাই নোরিয়ার জন্যে চমক।' একটানা এতগুলো কথা বলে দম নেয়ার জন্যে থামল কিশোর। 'তারপর, লিটল মারমেইডের ক্যাপ্টেন আর দোসররা যখন উদয় হল, দ্বীপটাতে গুপ্তধন লুকিয়ে ফেলল সে। সূত্র হিসেবে রেখে গেল চিঠি, আর দ্বিতীয় জার্নালটা।'

বাওরাডের ধাঁধা, আর কিশোরের সমাধান ক্ষমতা স্তব্ধ করে দিয়েছে দুই সহকারীকে। কে বেশি চালাক? বাওরাড, না কিশোর পাশা, ভেবে ঠিক করতে পারছে না ওরা।

'দ্বীপটা প্রাকৃতিক নয় কেউ বুঝতে পারেনি?' অবশেষে বলল রবিন।

'না। খনির শ্রমিকেরা ছিল ভাসমান, আজ এখানে কাল ওখানে। যেখানেই

কাজ পেত, চলে যেত, অনেকটা যাযাবর। আমার স্থির বিশ্বাস, ওদের কাছ থেকে কেউ কোন সাহায্য পায়নি—যারা পরে গুপ্তধন খুঁজেছে। হয়ত কোন শ্রমিকেরই দেখা পায়নি তারা। বাওরাডের বংশধরেরাও ভেবেছে দ্বীপটা প্রাকৃতিক, ফলে নজর দেয়নি ওটার দিকে। শ্রমিকদের কথা ভাবতে পারেনি, কারণ, দ্বিতীয় জার্নালটাই হাতে পড়েনি কারও।'

'আমরা পেয়েছি!' বুকে চাপড় মারল মুসা। 'এবার গুপ্তধনও খুঁজে বের করব।'

'হ্যাঁ, করব,' ঘোষণা করল কিশোর।

'একটা কথা এখনও বুঝতে পারছি না, কিশোর,' রবিন বলল। 'আয়নার মধ্যে দেখ বলে কি বোঝানো হয়েছে?'

'পুকুরটাকে আয়না বোঝানো হয়নি তো?' বলল মুসা। 'পানিতেও তো প্রতিবিম্ব দেখা যায়।'

'ওখানে গেলেই বুঝতে পারব,' কিশোর বলল। 'পুকুর, না…।'

হঠাৎ ব্রেক কষল বোরিস। পেছনে ঠুকে গেল ছেলেদের মাথা। আলোচনায় এতই মগ্ন ছিল, পথের দিকে চোখ ছিল না কারও। এখন দেখল। দেখেই পাশের দরজা খুলে হুড়াহুড়ি শুরু করে দিল বেরোনোর জন্যে। বোরিস ইতিমধ্যে বেরিয়ে গেছে।

পথের আর একটা মোড় ঘুরলেই ডাই লজ। মোড়ের ওপাশে না গেলে বাড়িটা দেখা যায় না। ওখানে, পাহাড়ের পাথুরে কাঁধে একগুচ্ছ পাইন গাছের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রফেসরের স্টেশন ওয়াগন। ড্রাইভারের পাশের দরজা খোলা, সিটে বসে আছেন প্রফেসর। তাঁর গায়ের ওপর প্রায় ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে এড।

'কি হয়েছে, প্রফেসর?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল বোরিস।

'নাহ্… তেমন কিছু না,' চোয়ালে হাত বোলালেন প্রফেসর। ছেলেদের দিকে তাকালেন। 'টিক বানাউ। কয়েক মিনিট আগে এসেছি, দেখি, রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তার সঙ্গে কথা বলতে গেলাম। কিছুই শুনল না, ঘুসি মেরে আমাকে ফেলে দিয়ে বনে ঢুকে পড়ল।'

'টিক বানাউ?' কিশোর বলল। 'তাহলে এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করা যাবে না আর! এড, চল। কুইক।'

বিশ

বৃষ্টির মধ্যেই ওদেরকে পুকুরটার দিকে যেতে দেখলেন মিসেস ডাই [illegible]
প্রফেসরের কাঁধে গাঁইতি, বেলচা। ডেকে বললেন, 'এড, সাবধানে [illegible]

বেশি ভিজিস না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল ছেলেরা। দ্রুত ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে এসে দাঁড়াল পুকুরের পাড়ে। পানিতে পড়ে থাকা মসৃণ পাথরগুলো মৃদু চকচক করছে, এগুলো দিয়েই সিঁড়ি বানিয়েছে বাওরাড। এক সারিতে পাথরগুলোর ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল দলটা, দ্বীপে উঠল। পাইন গাছে ছাওয়া খুদে দ্বীপ। চওড়ায় বড়জোর শ'খানেক ফুট হবে। তার মধ্যেই দুটো ছোট পাহাড়, তিরিশ ফুট, আর চল্লিশ ফুট উঁচু।

'গুজব রয়েছে,' কিশোর বলল। 'পাহাড়ে দাঁড়িয়ে লেকের ওপর চোখ রাখে ভূত। কাজেই দ্বীপের ওই ওদিকটায় গাছ খুঁজতে হবে। যেহেতু পাহাড়ের ওপর দাঁড়ায় ভূত, সেহেতু ভূতের মত দেখতে গাছটাও রয়েছে কোন উঁচু জায়গায়।'

ঝরঝর করে পানি গড়িয়ে পড়ছে ওদের হ্যাট, কোট থেকে, গলা বেয়ে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে পানি। দ্বীপের একেবারে প্রান্তে যে পাহাড়টা, ওটার ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল ওরা। বীকনটা রয়েছে চূড়ায়, দণ্ডের মাথায় ঝুলছে লণ্ঠন।

লণ্ঠনটা পরীক্ষা করল মুসা। চেঁচিয়ে উঠল, 'এই তো, আছে। পিতলের প্লেট, ডাইক কোম্পানির নাম খোদাই করা।'

'গাছটা খোঁজ,' কিশোর বলল।

খোঁজার প্রায় দরকারই পড়ল না, তাকাতেই চোখে পড়ল। হাত তুললেন প্রফেসর। 'ওই তো।'

বীকন থেকে পনের ফুট দূরে। বাঁকাচোরা সাইপ্রেস, ক্যাবরিলো আইল্যাণ্ডে যে-রকম দেখে এসেছে ওরা, সে-রকম। বৃষ্টির মধ্যে সত্যিই যেন একটা ভূত, কিংবা বলা উচিত ভূতুড়ে মানুষ--কিম্ভূত মাথা, শুকনো লম্বা একটা হাত তুলে রেখেছে। সাগর থেকে এসে চ্যানেলে ঢুলে পড়া ভাইকিংদের দেখাচ্ছে যেন।

'দেখ,' দ্বীপের যে অংশটা মূল ভূখণ্ড থেকে কেটে খাল বানানো হয়েছে সেদিকে দেখাল মুসা। 'পাড়ে কত বড় বড় গাছ। এজন্যেই বাড়ি থেকে সাইপ্রেসটা দেখা যায় না।'

'এখন যায় না,' কিশোর বলল। 'তবে বাওরাড যখন লাগিয়েছিলেন তখন পুকুর পাড়ে গাছ এত বড় ছিল না। ছিল কিনা, তাতেও সন্দেহ আছে। তখন নিশ্চয় দেখা যেত। তবে সাইপ্রেস বাড়ে খুবই কম। একেবারে বামন-গাছ বলা চলে এগুলোকে। এক ফুট লম্বা হতেই একশো বছর লাগে।'

'হয়েছে,' হাত নাড়ল মুসা। 'উদ্ভিদ বিজ্ঞানে আগ্রহ নেই আমার। কোন জায়গা থেকে খুঁড়ব?'

সাইপ্রেসটার চারপাশে ঘুরল রবিন। 'খোঁড়ার চিহ্ন নেই, কিশোর। টিক

বানাউ আসেনি।'

'চল, মুসা,' বোরিসের কাঁধ থেকে গাঁইতি নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল এড 'গাছের গোড়ার চারপাশে···।'

বাধা দিল কিশোর, 'না এখানে নয়।'

সবগুলো চোখ একযোগে ঘুরে গেল তার দিকে।

'কিন্তু চিঠিতে বলা হয়েছেঃ ভাব লকের গোপন রহস্যের কথা,' প্রফেসর বললেন। 'তারমানে ভূত। ভূতটার কাছেই দেখতে বলা হয়েছে।'

'চিঠিতে তো আয়নার মধ্যেও দেখতে বলা হয়েছে,' মনে করিয়ে দিল কিশোর। 'ভূতটাকে আয়নার মধ্যে দেখতেই বলা হয়েছে, আমার বিশ্বাস।'

'কিন্তু এখানে আয়না কই!' চারপাশে তাকাতে লাগল মুসা।

'নেই। আয়না বলে আসলে আয়নার মত বোঝাতে চেয়েছে। আয়নায় প্রতিবিম্ব দেখা যায়। ওই প্রতিবিম্বকে ব্যবহার করেই হয়ত গুপ্তধন বের করতে বলেছে।' গাছটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। 'ভূত নির্দেশ করছে পুকুরের দিকে। দেখা যাক, পুকুরে ভূতের প্রতিবিম্ব, বা ছায়া দেখা যায় কিনা।'

সাইপ্রেসের কাছে দাঁড়িয়ে, ওটার নির্দেশিত দিকে তাকাল ছেলেরা।

'যা বৃষ্টি,' রবিন বলল। 'কিছুই তো দেখি না।'

'দেখি, এড, তোমার টর্চটা,' হাত বাড়াল কিশোর।

সাইপ্রেসের লম্বা বাহুটায় আড়াআড়ি ভাবে টর্চটা ধরল সে, সুইচ টিপল। বৃষ্টির চাদর ফুঁড়ে যেন বেরিয়ে গেল উজ্জ্বল আলোকরশ্মি। পড়ল গিয়ে সমতল একটা জায়গার ওপর, ঘন ঝোপ ওখানে। সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল সে, 'চল! জলদি চল।'

'প্রতিবিম্ব কোথায়···।' মুসা কথা শেষ করতে পারল না।

চেঁচিয়ে উঠল গোয়েন্দাপ্রধান, 'প্রতিবিম্ব চুলোয় যাক, জলদি এস,' বলেই ঢাল বেয়ে দৌড় দিল জায়গাটার দিকে। ঘন ঝোপঝাড়ের ভেতরে সমতল জায়গাটা এমনই, এমনিতে দেখে বোঝার কোন উপায় নেই, ওখানে মাটির নিচে কিছু লুকানো রয়েছে। এখন দেখা গেল, ডালপালা ভাঙা, মাটিতে একটা গর্ত। সদ্য খোঁড়া।

'নিয়ে গেছে!' কেঁদে ফেলবে যেন এড।

'তোমার আগেই কেউ আন্দাজ করে ফেলেছিল, কিশোর,' গুঙিয়ে উঠল মুসা।

গর্তের কিনার থেকে পিতলের একটা বোতাম কুড়িয়ে নিলেন প্রফেসর। 'টিক বানাউ! এজন্যেই আমাকে মেরে দৌড়ে পালিয়েছে। নিয়ে গেছে গুপ্তধন।'

'পুলিশকে জানানো দরকার,' বলেই দৌড় দিল বোরিস।

লজে ফিরে এল ওরা। ইয়ান ফ্লেচারকে ফোন করতে বলল মিসেস ডাইকে কিশোর। প্রফেসরকে বলল, 'স্যার, চলুন। যেখানে আপনাকে মেরেছিল, সেখানে ভালমত খুঁজে দেখি। কিছু ফেলেটেলে গেল কিনা। কোথায় গেছে হয়ত আন্দাজ করা যাবে।'

প্রফেসরের গাড়ির কাছে খুঁজতে লাগল ওরা। মাঝে মাঝে টর্চ জ্বালছে, ভাল করে দেখার জন্যে। কিছুই পাওয়া গেল না। গাড়ি থেকে খানিক দূরে একটা জায়গা দেখালেন তিনি। কাদা হয়ে আছে, তাতে বুটের ছাপ, চলে গেছে সোজা হাইওয়ের দিকে।

জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন প্রফেসর। 'নিশ্চয় গাড়ি রেখে এসেছিল। গেল বোধহয়! আর ধরা যাবে না।'

বুটের ছাপগুলো পরীক্ষা করল কিশোর। 'ছাপগুলো তেমন দাবেনি। স্যার, ওর হাতে কিছু ছিল? দেখেছেন?'

'না, ছিল না। হাত খালি। গুপ্তধনগুলো নিশ্চয় গাড়িতে রেখে কিছু নিতে ফিরে এসেছিল।' আফসোস করলেন, 'গেছে, পালিয়েছে। আর ধরা যাবে না।'

হ্যাঁ-না কিছু বলল না কিশোর। আবার স্টেশন ওয়াগনের কাছে ফিরে আসতে আসতে ঝট করে মাথা তুলল। 'ডিনো কোথায়?'

'ডিনো?' এড বলল। 'সারা সকালই দেখিনি। থাকে না কোনদিনই। মর্নিং ওয়াকে যায়।'

ঝিক করে উঠল কিশোরের চোখ। 'এড, মাত্র একবছর হল ও এসেছে। কিভাবে এল?'

'কিভাবে?...জাস্ট চলে এল। স্কটল্যাণ্ডে আমাদের আত্মীয়দের কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে। আমাদের পুরানো বাড়ির সবাইকে চেনে ও, পরিবারের সব কথা জানে।'

'ওরকম যে কেউ জেনে নিতে পারে,' মুসা বলল। 'কিশোর, টিক বানাউয়ের সঙ্গে কাজ করছে না তো ডিনো? নাকি সে-ই টিক, ছদ্মবেশে রয়েছে?'

'লম্বা-চওড়া তো একই রকম, থাকতে অসুবিধে নেই। তাছাড়া, গোড়া থেকেই গুপ্তধন খোঁজায় বাধা দিয়েছে আমাদের। দু'বার আমাদের কাছ থেকে জার্নাল ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছে টিক, দু'বারই তখন লজে অনুপস্থিত ছিল ডিনো। ভূতুড়ে শহরেও টিক বানাউ পালিয়ে যাওয়ার পর পরই এসে হাজির হয়েছিল সে।'

'আড়তে আমাদের নিয়ে গিয়েছিল,' রবিন বলল। 'কাজেই জানা ছিল আমরা কোথায় গেছি। ড্যানিয়েলদের ওখানে যা যা জেনে এসেছি, ও শুনেছে আমাদের মুখে। আমাদের ছাউনিতে আটকে রেখে ফিরে এসে স্মোকহাউসটা ভাঙা সহজ

ছিল তার জন্যে। তখনও জানত না সে, কোন ধরনের পাথর কিনেছিলেন বাওরাড।'

'কিন্তু ছাউনিতে তো শুধু নোবলকে দেখলাম,' প্রফেসর বললেন।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'কিন্তু নোবল দরজার তালা খোলার চেষ্টা করেছে প্রথমে। সে-ই জানালা আটকে থাকলে দরজা খুলতে যাবে কেন? তার জানাই থাকার কথা দরজা বন্ধ। আর···।' কি যেন ভাবল গোয়েন্দাপ্রধান। বন্ধুদের দিকে তাকাল। 'লজের ছাউনিতে আগুন লাগার সময় কি কাউকে পালাতে দেখেছি আমরা?'

পরস্পরের দিকে তাকাল রবিন, মুসা আর এড। কেউ দেখেনি।

'আমিও দেখিনি,' কিশোর বলল। 'আমরা ছুটে গেছি, কারণ, ডিনো আমাদের বলেছে সে চোর দেখেছে। কিন্তু সত্যি কি দেখেছে ডিনো?'

'তুমি কি বলতে চাইছ ডিনোই আগুন লাগিয়েছে?' রবিন জিজ্ঞেস করল। 'টিককে দেখেছে বলে সন্দেহমুক্ত হতে চেয়েছে? কারণ সে নিজেই টিক বানাউ বলে?'

এড মনে করিয়ে দিল, 'প্রফেসরও তো একটা লোককে দৌড়ে যেতে দেখেছেন।'

'এবং লোকটা নোবল,' বলল কিশোর। 'স্যার, সত্যি কি নোবলকেই দেখেছিলেন? নাকি ভুল করে বানাউকে নোবল বলেছেন?'

'হতেও পারে,' ধীরে ধীরে বললেন প্রফেসর। 'সারাক্ষণই নোবলের কথা ভাবছিলাম, তাছাড়া তাড়াহুড়া, উত্তেজনা, ভুল হতেই পারে মানুষের। ডিনো বলেছে, টিককে দেখেছে। আমার মনে হয়েছে, টিক নয়, নোবল। না-হে, এখনও মনে হচ্ছে আমার, নোবলকেই দেখেছি।'

'ডিনোই চোর,' বলে উঠল মুসা। 'ডিনোই তুলে নিয়ে গেছে···।'

বৃষ্টির মধ্যে গর্জে উঠল একটা কণ্ঠ, 'কি নিয়ে গেছে ডিনো?' রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওদের দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে আছে স্কটসম্যান।

'আ-আপনি!' ঢোক গিলল কিশোর। এতই চমকে গিয়েছে, স্টেশন ওয়াগনের হুড-এ ভর দিয়ে নিজেকে স্থির রাখতে হল। হাত থেকে পড়ে গেল টর্চ। তোলার জন্যে ঝুঁকল।

'বোরিস,' আদেশ দিলেন প্রফেসর, 'ধর ব্যাটাকে!'

সোজা হল কিশোর। চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। বিস্মিত। আবার ভর দিল প্রফেসরের গাড়িতে।

'না, বোরিসভাই,' বলল সে। 'ধরার দরকার নেই। আমার ভুল হয়েছে।'

একুশ

কিশোরের দিকে তাকিয়ে দ্বিধা করছে বোরিস।

'ওর কাছে থাক,' বললেন প্রফেসর। 'খবরদার, যেন পালাতে না পারে। ...কিশোর, কি ভুল করেছ? ভালই তো যুক্তি দেখাচ্ছিলে, ডিনো চোর।'

'আড়তে ও-ই আমাদের আটকেছিল, কিশোর,' মুসা জোর দিয়ে বলল।

'ছাউনিতে আগুন দিয়েছে। স্মোকহাউস গুঁড়িয়েছে,' রবিন বলল।

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ডিনো। 'কী? তোমরা আমাকে...।'

খপ করে ডিনোর হাত চেপে ধরল বোরিস। 'নড়বে না।'

'ছাউনি পুড়িয়েছে, তোমাদেরকে আড়তের ছাউনিতে আটকেছে, স্মোকহাউসে খুঁজেছে, গুপ্তধন খুঁজতে আমাদের বাধা দিয়েছে, সুরই ঠিক।' মাথা নাড়ল কিশোর, 'কিন্তু সে টিক বানাউ নয়। গুপ্তধনও পায়নি।'

'তুমি না বললে সব কিছুর মূলে টিক আর নোবল?' প্রফেসর বললেন।

'টিক বানাউয়ের কথা বলতে পারেন,' মাথা কাত করল কিশোর। 'কিন্তু নোবল নয়। গুপ্তধন চায়নি সে। বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্যই করেছে। চুরি করে হেডকোয়ার্টারে ঢুকেছিল জার্নাল নিয়ে গিয়ে আমাদের থামানোর জন্যে নয়, ওটার ছবি তুলতে। এটা ঠিক, টিক আর নোবলকে কাছাকাছি থাকতে দেখেছি আমরা। থাকবেই। কারণ টিক আর আমাদেরকে অনুসরণ করেছে নোবল। সান্তা বারবারায় আমাদের সঙ্গে জরুরি আলোচনা করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমরা তাকে বিশ্বাস করিনি, পাত্তা দিইনি, বরং পুলিশের ভয় দেখিয়েছি। এখন বোঝা যাচ্ছে, সেই ছেলেটাকে বোরিসের কাছে সে-ই পাঠিয়েছিল, আমরা বিপদে পড়েছি একথা জানাতে। আড়তে গিয়েছিল রবিন আর মুসাকে মুক্ত করতে।'

'তাহলে কি টিক বানাউ একা?' মুসার প্রশ্ন।

'হ্যাঁ,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর।

'তোমার কথার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝছি না,' এড বলল।

'টিক বানাউ লোকটা আজব। বোঝাতে চেয়েছে সে বাইরে থেকে এসেছে, এই এলাকায় নতুন, অথচ কাজেকর্মে বোঝা গেছে প্রায় সব কিছুই চেনে সে। রবিন হিসটোরিক্যাল সোসাইটি থেকে ফেরার পর পরই স্যালভিজ ইয়ার্ডে উদয় হয়েছে টিক। আমরা যেদিন ক্যাবরিলো আইল্যাণ্ডে গেছি, সেদিন হানা দিয়েছে সোসাইটিতে। কেন? পুরানো রেকর্ড জানতে, সান-প্রেস অফিসে না গিয়ে, সরাসরি চলে গেছে আলফ্রেড পেরিংটনের বাড়িতে। লেখকের খবর জানল

কিভাবে?'

'ঠিকই তো,' রবিন বলল। 'টিক জানল কি করে?'

'আলফ্রেড পেরিংটনের নাম জানে সে, রবিন, কারণ, আমাদের এই এলাকা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ টিক।' প্রফেসরের দিকে তাকাল কিশোর। 'ভূতুড়ে শহরে টিক গায়েব হওয়ার পর শুধু ডিনোই নয়, আপনিও হাজির হয়েছিলেন। এই এলাকার লোকাল হিস্টরিতে বিশেষজ্ঞ আপনি। আপনিই টিক বানাউ, এবং আজ সকালে গুপ্তধনগুলো তুলে নিয়ে গেছেন।'

হেসে উঠলেন প্রফেসর। 'সত্যি, কিশোর, একেবারে চমকে দিয়েছ আমাকে। ভাল অভিনয় জান।'

'না, অভিনয় করছি না আমি।'

'তাহলে ভুল করেছ। আমার সাইজ আর টিক বানাউয়ের সাইজ এক না।'

'লম্বায় একই। কিছু বেশি মোটা। ওটা কিছু না। নাবিকদের ভারি জ্যাকেট, পা-জ্যাকেট পরলেই আপনাকে ওরকম মোটা দেখাবে।'

'আজ সকালে তাহলে চুরি করলাম কখন? বিছানা থেকে উঠেই তোমাকে ফোন করেছি।'

'কাল সন্ধ্যায়,' কিশোর বলল। 'মুসা যখন রাতেই গুপ্তধন খুঁজতে যাবার কথা বলল, আপনি রাজি হননি। কারণ, আমার আগেই বুঝে ফেলেছেন, কোথায় গুপ্তধন লুকানো আছে। রাতে ফিরে এসেছেন আবার। সম্ভবত, আমার মতই টর্চের সাহায্যে জায়গা আবিষ্কার করেছেন। অন্ধকার ছিল, তার ওপর বৃষ্টি। পানিতে ছায়া দেখে, সেটা কোনখানে নির্দেশ করে বোঝা সম্ভব ছিল না। তাই টর্চ ব্যবহার করেছেন। খুঁড়ে তুলতে তুলতে সকাল হয়ে গিয়েছিল। ফেরার পথে লজে ফোন বাজতে শুনলেন। আড়ি পাতলেন গিয়ে। এড তখন আমার সঙ্গে কথা বলছে।

'বুঝে ফেললেন, আমি জেনে ফেলেছি কোথায় আছে গুপ্তধন। সকালে এখানে আপনার আসার কথা, যদি না আসেন সন্দেহ করব। তাই একটা চালাকি করলেন। কোথাও গিয়ে একটা ফোন করে আবার এসে এখানে গাড়িতে বসে রইলেন। ভাব দেখালেন, আহত। গল্প তৈরি করলেন, টিক বানাউ আপনাকে মেরে গুপ্তধন নিয়ে পালিয়েছে। পুলিশ রহস্যময় টিক বানাউকে খুঁজে সময় নষ্ট করবে, ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করবে না আপনাকে, এটাই ভেবেছিলেন।

'কাদার ওপর ওই বুটের ছাপও আপনার সৃষ্টি।'

সবার চোখ এখন প্রফেসরের দিকে।

সাইরেনের শব্দ শোনা গেল। পুলিশ আসছে।

'প্রমাণ করতে পারবে এসব?' হেসে জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর।

'পারব, স্যার। কারণ মস্ত একটা ভুল করে ফেলেছেন। আপনি বলেছেন, আজ সকাল আটটায় আপনি বাড়িতে ছিলেন। আমরা আসার কয়েক মিনিট আগে এখানে এসেছেন। জোর বৃষ্টি হচ্ছিল অনেক আগে থেকেই।'

'বৃষ্টি?' আবার হাসলেন প্রফেসর। 'তাতে কি…?'

'আপনার গাড়ির নিচের মাটি অনেক জায়গায় শুকনো,' প্রফেসরের হাসিটা ফিরিয়ে দিল কিশোর। 'ইঞ্জিন ঠাণ্ডা। আটটার অনেক আগে থেকেই গাড়িটা ছিল এখানে। বৃষ্টির আগে থেকে।'

চোখের পলকে ঘুরে বড় রাস্তার দিকে দৌড় দিলেন প্রফেসর। কাছে এসে গেছে সাইরেন। গাছের ধার দিয়ে ছুটেছেন তিনি, আচমকা বনের ভেতর থেকে তাঁর ওপর লাফিয়ে পড়ল একটা মূর্তি। তাঁকে নিয়ে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। বুকে চেপে বসল।

পৌঁছে গেল পুলিশের গাড়ি। ব্রেক কষল। লাফিয়ে নামল দু'জন পুলিশ, প্রফেসর আর তাঁর হামলাকারীকে ধরে ফেলল।

বোরিস, ডিনো আর ছেলেরা দৌড়ে এল সেখানে। ভুরু কুঁচকে প্রফেসর আর নোবলের দিকে তাকিয়ে আছেন চীফ ইয়ান ফ্লেচার।

'ব্যাপার কি, কিশোর?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'এই লোকটাই কি নোবল? চোর?'

'হ্যাঁ, আমিই নোবল,' ভেজা এলোমেলো চুল ঝাঁকাল তরুণ। 'কিন্তু আমি চোর নই। চোর হল গিয়ে আপনাদের এই সম্মানিত প্রফেসর।'

'নোবল ঠিকই বলেছে, চীফ,' কিশোর বলল। 'প্রফেসর হারম্যান কেইনই চোর।' সংক্ষেপে কয়েক কথায় সব বুঝিয়ে দিল ফ্লেচারকে। শেষে বলল, 'আমার মনে হয়, নোবল চোর ছিল না কখনই। গুপ্তধনের পেছনে লেগেছেন প্রফেসর, এটা জেনে গিয়েছিল হয়ত, আর প্রফেসরও বুঝেছিলেন সেকথা। তাই কায়দা করে তাকে ফাঁসিয়ে দিয়ে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন। পুলিশও বোকার মত নিয়ে গিয়ে বেচারাকে জেলে ভরেছে।'

'তুমি ঠিকই বলেছ,' নোবল বলল। 'তখনই কসম খেয়েছি আমি, প্রতিশোধ নেব। প্রফেসরকে ধরিয়ে দেবই।'

'মস্ত ঝুঁকি নিয়েছ,' চীফ বললেন। 'ওকে ধরতে না পারলে ভয়ানক বিপদে পড়তে। এমনিতেই প্যারোলে বেরিয়েছ। আবার চুরি করে লোকের বাড়িতে ঢুকেছ জানলে বড় রকমের শাস্তি হয়ে যেত।' প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে জ্বলে উঠল চোখ। 'প্রফেসর, জিনিসগুলো দিয়ে দিন ভালয় ভালয়। শাস্তি তাহলে কিছুটা রেয়াত হবে।'

হাত নাড়লেন প্রফেসর, কাঁধ ঝাঁকালেন নিরাশ ভঙ্গিতে। মলিন হাসি হাসলেন। 'কি আর করা? কিশোর পাশা আমাকে এক মস্ত মার দিল। গাড়ির পেছনের সিটের নিচে লুকিয়ে রেখেছি।'

গাড়িতে উঠল দু'জন পুলিশ। সিট সরাতে বেরোল একটা পা-জ্যাকেট, একটা নাবিকের টুপি, কাদামাখা বুট, ভারি ট্রাউজার, আর একটা রবারের মুখোশ, তাতে টিক বানাউয়ের কালো দাড়ি আর কাটা দাগ।

ওগুলোর দিকে নজর নেই কারও। তাকিয়ে আছে সিটের নিচে রাখা চকচকে জিনিসগুলোর দিকে। আঙটি, হার, ব্রেসলেট, মূল্যবান পাথর বসানো সোনার বাঁটওয়ালা ছোরা, পাথর খচিত সোনার কৌটা, আর কয়েকশো সোনার মোহর। জলদস্যুদের লুটের মাল।

'খাইছে!' নিঃশ্বাস ভারি হয়ে গেছে মুসার। 'কয়েক লাখ ডলারের মাল!'

'ফ্যানটাসটিক!' বললেন চীফ।

'বিশ্বাসই হচ্ছে না!' বিড়বিড় করল ডিনো।

হাসি চলে গেছে প্রফেসরের। চিৎকার করে বললেন, 'ওগুলো আমার, শুনছ? সব আমার। আমি চোর নই। বাওরাড ডাইই ছিল চোর। আমাদের কাছ থেকে চুরি করেছিল। আমি···আমি লিটল মারমেইডের ক্যাপ্টেনের বংশধর।'

'সেটা আদালত বিচার করবে,' কঠিন কণ্ঠে বললেন চীফ। 'প্রায় একশো বছর পর আপনার দাবি প্রমাণ করতে পারবেন কিনা, সন্দেহ। ক্যাপ্টেনও নিশ্চয় চুরি করেছিল। নাহলে সাধারণ এক সওদাগরী জাহাজের ক্যাপ্টেন এত দামি মাল পেল কোথায়? লুট করেছিল কিনা তা-ই বা কে জানে? আমার রায় বলতে পারি, এখন ওই জিনিস মিসেস ডাইয়ের প্রাপ্য। ওগুলো তুলে নেয়ার দায়ে না হলেও, লোকের বাড়িতে চুরি করে ঢোকার দায়ে, লোককে মারার দায়ে, জেলে আপনাকে যেতেই হবে।'

'নিরপরাধ নোবলকে ফাঁসানোর বিচার হবে না?' রবিন প্রশ্ন তুলল। 'নিশ্চয় হবে।'

'নিয়ে যাও,' নিজের লোককে আদেশ দিলেন চীফ।

পুলিশের গাড়িতে তোলা হল প্রফেসরকে।

গুপ্তধন নেয়ার জন্যে থলে আনতে ঘরে গেল এড। কয়েক মিনিট পরেই ফিরে এল। দৌড়াতে দৌড়াতে তার পেছনে এলেন মিসেস ডাই। 'গুপ্তধন তাহলে মিলল!' হাঁপাচ্ছেন তিনি। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না।

'এগুলো আমাদের, মা!' চেঁচিয়ে উঠল এড। 'আর গরিব থাকব না আমরা।'

'হাসলেন মিসেস ডাই। 'সেটা পরে দেখা যাবে,' তিন গোয়েন্দার দিকে চেয়ে

বললেন। 'অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে। তোমরা সত্যিই গোয়েন্দা, কাজের ছেলে!'

হাসি ছড়িয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দার মুখে।

'কিশোর,' মুসা বলল। 'একটা কথা বুঝতে পারছি না। ডিনো ছাউনি পোড়াতে গেল কেন? আর আমাদেরকেই বা আটকে রাখল কেন আড়তে?'

ডিনোর দিকে চেয়ে হাসল কিশোর। আরেক দিকে চোখ সরিয়ে নিল স্কটসম্যান। 'আমার মনে হয় ডিনো আংকেল বিয়ে করতে চায়। তার ভয়, গুপ্তধন পেয়ে ধনী হয়ে গেলে, তাকে আর বিয়ে করবেন না মিসেস ডাই।'

অবাক হয়ে ডিনোর দিকে তাকালেন মিসেস ডাই।

লাল হয়ে গেল স্কটসম্যানের চেহারা।

হাসি ফুটল মিসেস ডাইয়ের মুখে। 'ডিনো, কখনও কিন্তু বলনি আমাকে। বুঝিইনি কিছু।'

তাদের দিকে চেয়ে হেসে উঠল সবাই, এমনকি এডও।

আরও লাল হল ডিনো।

বাইশ

বিশাল ডেস্কে কনুই রেখে ঝুঁকে বসলেন বিখ্যাত চিত্রপরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার। চমকপ্রদ আরেক কাহিনী নিয়ে তাঁর অফিসে আবার এসেছে তিন গোয়েন্দা।

'প্রায় একশো বছর পর তাহলে পাওয়া গেল গুপ্তধন,' বললেন তিনি। 'আরেকবার অসম্ভবকে সম্ভব করলে। ভাল একটা ছবি তৈরি করা যাবে। এখন বল তো, প্রফেসর কেইন কি সত্যি লিটল মারমেইডের ক্যাপ্টেনের বংশধর?'

'হ্যাঁ, স্যার,' কিশোর জবাব দিল। 'ইতিহাসের প্রফেসর তিনি সত্যিই। জোয়ান বয়েসে ভাল নাবিক ছিলেন। ইতিহাস আর সাগরের নেশাই তাঁকে নিজের পরিবারের অতীত জানতে প্রেরণা জুগিয়েছে। জেনেছেন গুপ্তধনের কথা। সোসাইটিতে চাকরিই নিয়েছিলেন ওগুলো খুঁজতে সাহায্য হবে বলে। প্রথম জার্নালটা পড়ে বুঝেছিলেন, দ্বিতীয় আরেকটা আছে কোথাও।

'ওটা খোঁজার জন্যেই বার বার চুরি করে ঢুকেছেন ডাই লজে। পাননি। শেষে খোঁজ নিতে আরম্ভ করেন, কি কি জিনিস বিক্রি করেছেন মিসেস ডাই। জেনেছেন বাক্সটার কথা। খোঁজ করতে করতে চলে আসেন মিস্টার ব্যানারের মিউজিয়মে। মিস্টার ব্যানার তাঁকে চেনেন, কাজেই ছদ্মবেশ নিতে হয়েছে। আরও একটা কারণে

নিয়েছিলেন ছদ্মবেশ, যাতে কেউ বুঝতে না পারে, প্রফেসর কেইন গুপ্তধনের ব্যাপারে আগ্রহী। যাতে তাঁকে কেউ সন্দেহ না করে।

'আমরা গুপ্তধন খোঁজা শুরু করলে সুবিধে হল তাঁর। যোগ দিলেন আমাদের দলে। টিক বানাউ নামে সত্যি সত্যি কেউ আছে, এটা বোঝানোর জন্যে মিথ্যে গল্প বানিয়ে বললেন যে সোসাইটিতে চোর ঢুকেছিল। ভুল করেছেন। আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনি। কারণ, সোসাইটিতে ঢোকার কোন কারণই নেই টিক বানাউয়ের।'

'বেশি চালাকি করতে গিয়েই ভুল করে বসে অপরাধীরা,' মন্তব্য করলেন পরিচালক। 'ধরা পড়ে অনেক সময়।'

'প্রফেসরকে ঠিক অপরাধী বলা যায় না, স্যার,' রবিন বলল। 'আই মীন, ক্রিমিন্যাল মাইণ্ডেড যাকে বলে আরকি। লোভে পড়েই করেছেন কাজটা। ভুল বুঝতে পেরে পরে অনুশোচনাও করেছেন অনেক। অর্ধেক মাল তাঁকে দিয়ে দিয়েছেন মিসেস ডাই। প্রফেসর সেগুলো দান করে দিয়েছেন সোসাইটিকে। সোসাইটি সেগুলো ব্যক্তিগত যাদুঘরে সাজিয়ে রেখেছে, লোকের দেখার জন্যে।'

'হুঁ। লোকের মন যে কখন কি হয়, বোঝা মুশকিল,' বললেন পরিচালক। 'কিন্তু জেলে যাওয়া থেকে বাঁচতে পারবে না প্রফেসর।'

'না, তা পারবে না,' কিশোর বলল। 'মিসেস ডাই তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করেননি, আমরাও না। ডাই লজে যে তিনি চুরি করে ঢুকেছেন, কোন প্রমাণ নেই। শুধু নোবলকে ফাঁসানোর অপরাধেই জেল হবে তাঁর।'

মাথা দোলালেন পরিচালক। 'নোবল তাহলে শুধু প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে নয়, নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যেও প্রফেসরের পিছে লেগেছিল?'

'হ্যাঁ, স্যার,' মুসা বলল। 'বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। জার্নালের কভার নিয়ে স্যালভিজ ইয়ার্ড থেকে পালাতে দেখেছে টিক বানাউ-রূপী প্রফেসরকে। তারপর দেখেছে, শূন্য কভারটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে। এতেই বুঝেছে, আরেকটা জার্নাল আছে। তখনও জানত না, ওটা আমাদের কাছে। তাই লজে গিয়েছিল খোঁজার জন্যে। ডিনো তাকে দেখে তাড়া করে।'

'তারপর,' পরিচালক বললেন। 'কোনভাবে তোমাদের হাতে জার্নাল দেখে নোবল। চুরি করে হেডকোয়ার্টারে ঢুকে ছবি তুলে আনে ওটার, যাতে জানতে পারে কোথায় কি হচ্ছে। আসলে তোমাদের সাহায্য করতে চেয়েছে। কিন্তু প্রফেসরের বিরুদ্ধে বললে যদি তখন বিশ্বাস না কর এই ভয়ে বলেনি। ঠিক বলেছি না?'

'হ্যাঁ, স্যার,' রবিন মাথা ঝাঁকাল। 'তার ভয় ছিল, প্রফেসরকেই শুধু বিশ্বাস

করব আমরা। তাই আমাদের অনুসরণই করেছে, সামনে এসে কিছু বলেনি। প্রফেসরের বিরুদ্ধে প্রমাণ জোগাড়ের চেষ্টা করেছে!'

'অযথা হয়রানীর শিকার হয়েছে বেচারা,' কিশোর বলল। 'ইয়ান ফ্লেচার বলেছেন, ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে তাকে। সোসাইটি আবার তাকে চাকরিতে বহাল করেছে।'

'ভাল। খুব ভাল,' খুশি হলেন পরিচালক। দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকালেন তিনি, ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন ইন্টারভিউর সময় শেষ। 'আর বেশিক্ষণ আটকাব না তোমাদের। কিশোর, একটা ব্যাপারে খটকা লাগছে। ডিনোকে দেখে চমকে উঠে হাত থেকে টর্চ পড়ে যাবে, এত দুর্বল স্নায়ু তো তোমার নয়। অভিনয় করেছিলে, না?'

'ঠিকই ধরেছেন, স্যার, হাসল কিশোর। 'চমকে যাওয়াটা ভান। গাড়ির হুডে ভর দিয়েছি ইঞ্জিন গরম না ঠাণ্ডা বোঝার জন্যে। টর্চ ফেলেছি তোলার সময় নিচটা দেখে নিতে।'

'ইঞ্জিন ঠাণ্ডা হওয়াটা কোন ব্যাপার নয়,' পরিচালক বললেন। 'বৃষ্টিতে খুব অল্প সময়েই ঠাণ্ডা হয়ে যেতে পারে।'

'তা পারে,' স্বীকার করল কিশোর। 'বলেছি প্রফেসরকে ভড়কে দেয়ার জন্যে। গাড়ির নিচে দেখার আগেই বুঝে ফেলেছি, মিথ্যে কথা বলছেন তিনি। উল্টোপাল্টা কথা বলে মস্ত ভুল করেছেন।'

ভ্রূকুটি করলেন পরিচালক। 'কথাটা কি?'

'ডিনো তো আগুন লাগাল ছাউনিতে। এসে আমাদেরকে বলল, টিক বানাউকে দেখেছে। আর পরে প্রফেসর বললেন নোবলকে ছুটে যেতে দেখেছেন। আসলে কাউকে দেখেননি তিনি। তর্ক শুরু করলেন ডিনোর সঙ্গে। এমন তর্ক জুড়ে দিলেন, মনে হল তিনি শিওর, টিক বানাউ হতেই পারে না...।'

'নিশ্চয় পারে না,' প্রফেসর ভুলটা কোথায় করেছেন, বুঝে ফেললেন পরিচালক। 'প্রফেসর জানে, টিক বানাউকে ডিনো দেখতেই পারে না। কারণ প্রফেসর নিজেই টিক বানাউ। কিশোর, তোমাকে ফাঁকি দেয়া বড় কঠিন।'

'তখন বুঝতে পারিনি, স্যার। বুঝেছি পরে, বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রফেসরের সঙ্গে কথা বলছিলাম যখন। সে-সময়ও জোর করে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন, নোবলকেই দেখেছেন।'

সূক্ষ্ম এক চিলতে হাসি ফুটল পরিচালকের মুখে। 'তো, আমাদের রোমান্টিক নায়কের খবর কি? ডিনাম্যান হ্যাংবার?'

হাসল কিশোর। 'স্বীকার করেছে, মিসেস ডাইকে বিয়ে করতে চায়। ধনী হয়ে

গেলে তাকে আর বিয়ে করতে চাইবেন না মহিলা, সে-ভয়েই আমাদের পিছে লেগেছে, ঠেকাতে চেয়েছে। গুপ্তধনের লোভ বিন্দুমাত্র ছিল না।'

'মহিলা নিশ্চয় খুব সুন্দরী। তার কি মত?'

ঝিলিক দিয়ে উঠল মুসার ঝকঝকে সাদা দাঁত। 'ভেবে দেখবেন বলেছেন।'
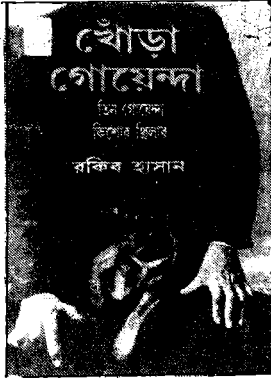
খোঁড়া গোয়েন্দা

প্রথম প্রকাশঃ জুলাই, ১৯৯০

'ইস্, কি বৃষ্টিরে বাবা!' বলল রেনকোট পরা মহিলা।

এক ঝলক ঝড়ো হাওয়া হয়ে গেল উইলশায়ার বুলভারের ওপর দিয়ে। টান দিয়ে কেড়ে নিতে চাইল মহিলার ছাতা, পারল না। কিন্তু পুরোপুরি উল্টে গেল ছাতাটা, মট মট করে ভাঙল তিনচারটা শিকের জোড়া। ধেয়ে গেল বাতাস, ঝাপটা মেরে বৃষ্টি দিয়ে ভিজিয়ে দিল জানালার কাচ।

বাস স্টপ-এ দাঁড়ানো রবিনের মনে হল, ছাতাটার জন্যে চিৎকার করে কাঁদবে মহিলা। চেয়ে আছে দোমড়ানো কাপড়ের দিকে। রবিনের দিকে এমন ভঙ্গিতে তাকাল, যেন সব দোষ তার। তারপর, হঠাৎ হাসল মহিলা। 'আক্কেল হয়েছে আমার।' ময়লা ফেলার ড্রামে ছুঁড়ে ফেলে দিল বাতিল ছাতাটা। 'ক্যালিফোর্নিয়ার বৃষ্টি কেমন জানি না আমি? কেন বেরোলাম?' বাস স্টপ লেখা সাইনবোর্ডের পাশের বেঞ্চে বসে পড়ল সে।

ভেজা ঠাণ্ডা কাঁপুনি তুলল শরীরে, কাঁধ বাঁকা করে ফেলল রবিন। এপ্রিলে এরকম বৃষ্টি আর দেখেনি কখনও। ঈস্টার মানডের দিন, সন্ধ্যা প্রায় ছ'টা বাজে। ঠাণ্ডা তো আছেই, ঝড়ো আবহাওয়ার কারণে অসময়েই অন্ধকার হয়ে এসেছে। সান্তা মনিকায় যাওয়ার জন্যে বেরিয়েছিল সে, মা পাঠিয়েছেন একটা ফ্যাব্রিক স্টোর থেকে পোশাকের নতুন ডিজাইন আনার জন্যে। স্কুল ছুটি। এরকম আবহাওয়া থাকলে মাঠে মারা যাবে ছুটিটা। বাসের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে অস্থির হয়ে উঠেছে সে।

'ওই দেখ, আসছে মানুষটা,' মহিলা বলল। 'আহারে, চোখে দেখে না।'

পথের দিকে তাকাল রবিন। বৃষ্টির শব্দকে ছাপিয়ে কানে এল লোকটার লাঠি ঠোকার ঠক ঠক। আরেক হাতে মগ, তাতে পয়সা।

'বেচারা!' আফসোস করল মহিলা। 'অন্ধ হওয়ার যে কি জ্বালা। প্রায়ই দেখি। ক'দিন হল এসেছে। রোজ ভাবি, কিছু পয়সা দেব।'

পার্স খুলে ভেতরে হাতড়াতে শুরু করল মহিলা। কাছে এল লোকটা। রবিন

দেখল, পাতলা শরীর তার, সামান্য বাঁকা হয়ে হাঁটে। কানের কাছে তুলে দিয়েছে কোটের কলার। ভুরুর ওপর টেনে দিয়েছে কাপড়ের টুপি। চোখে কাল চশমা। উইণ্ডব্রেকারের বুকের কাছে মলাটে লেখা রয়েছেঃ অন্ধকে দয়া করুন। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করবেন। ভিজে যাতে লেখাটা নষ্ট না হয় সে-জন্যে মলাটটা মুড়ে রেখেছে প্লাস্টিক দিয়ে।

'ইস্, কি জঘন্য আবহাওয়া,' মহিলা বলল। 'রাতও হয়ে এল।' উঠে দাঁড়িয়ে হাতের মুদ্রাটা ফেলে দিল অন্ধের মগে।

গলা থেকে বিচিত্র একটা শব্দ বেরোল লোকটার। লাঠি ঠুকে ঠুকে পরীক্ষা করছে কোথায় কি আছে। বেঞ্চটা কোথায়, আন্দাজ করে নিয়ে বসে পড়ল।

রবিন আর মহিলা দু'জনেই এক মুহূর্ত দেখল লোকটাকে। তারপর ফিরল রাস্তার ওপাশে ব্যাংকের আলোকিত জানালার দিকে।

ঝাড়ু দেয়ার পর মোছার কাজ সবে শেষ করেছে ব্যাংকের ঝাড়ুদার। চকচক করছে সব কাউন্টার। চেয়ারগুলো সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে জায়গামত। ঝাড়ুদার মোট দু'জন। একজনের গায়ে ওভারঅল, লম্বা এলোমেলো ধূসর চুল। সে পুরুষ। আরেকজন মহিলা, সে বেঁটে, মোটা। দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। ওখান থেকে লবি ধরে অফিস বিল্ডিঙে যাওয়া যায়।

হাতে চাবির গোছা নিয়ে তাড়াহুড়ো করে ব্যাংকের পেছন দিক থেকে এল সিকিউরিটি ম্যান। ব্যাংকের দরজার কাচ লাগানো পাল্লা খুলে দিল, ঝাড়ুদারদের বেরোনোর জন্যে। দু'চারটা কথা বলল ওদের সঙ্গে।

লবি পেরিয়ে গিয়ে এলিভেটরে ঢুকল দুই ঝাড়ুদার। আবার অন্ধের দিকে ফিরল রবিন। টুপির নিচ দিয়ে বেরিয়ে আছে ধূসর চুল। গালে অযত্নে বড় হওয়া দাড়ি। চওড়া কুৎসিত একটা কাটা দাগ গালের ওপর থেকে ঢুকে গেছে দাড়ির ভেতর। বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটেছিল নিশ্চয়, ভাবল রবিন, আর বোধহয় তাতেই দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে লোকটা।

সামনে বাঁকা হয়ে উঠতে গেল লোকটা। পা বেঁধে গেল লাঠিতে। আধ-বসা অবস্থায়ই শরীরটা ঝাঁকুনি দিয়ে কাত হয়ে গেল একপাশে।

'আরি!' লাফ দিয়ে এগোল মহিলা। লোকটার হাত চেপে ধরল, যাতে পড়ে না যায়।

হাত থেকে মগ ছুটে গেল লোকটার। মাটিতে পড়ল। ঝনঝন করে সমস্ত পয়সা ছড়িয়ে পড়ল এদিক ওদিক।

'আমার পয়সা!' প্রায় কেঁদে উঠল অন্ধ।

'দিচ্ছি দিচ্ছি, তুলে দিচ্ছি,' তাড়াতাড়ি বলল মহিলা। 'আপনি বসে থাকুন।'

ভেজা চত্বর থেকে মুদ্রাগুলো কুড়াতে শুরু করল মহিলা। খাঁজ আর পানি নিষ্কাশনের ড্রেনগুলোতে খুঁজতে গেল রবিন। ময়লা ফেলার ড্রামের কাছে মগটা গিয়ে পড়েছে, তুলে এনে তাতে মুদ্রাগুলো ফেলল মহিলা।

'সব পাওয়া গেছে?' ককিয়ে উঠল লোকটা, 'আমার সারাদিনের কামাই!'

তিনটে মুদ্রা পেয়েছে রবিন, সেগুলো মগে ফেলে বলল, 'মনে হয় না আর আছে।'

মগটা অন্ধের হাতে ধরিয়ে দিল মহিলা। হাতের তালুতে ঢেলে পয়সাগুলোয় আঙুল বোলাতে লাগল লোকটা, সব আছে কিনা বোঝার চেষ্টা করছে। আগের মতই বিচিত্র একটা শব্দ করে বলল, 'হ্যাঁ, ঠিকই আছে।'

'বাস ধরবেন?' মহিলা জিজ্ঞেস করল। 'ওই যে, আসছে।'

'নাহ্। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, ম্যাডাম। আমি এই কাছেই থাকি।'

রাস্তার ওপাশে তাকাল রবিন। আবার ফিরে এসেছে ঝাড়ুদার লোকটা। ব্যাংকের দরজায় খটখট করছে। হাতে চাবির গোছা নিয়ে পেছন থেকে এল গার্ড। দরজা খুলে দিল। সংক্ষিপ্ত কথা হল দু'জনের মাঝে। তারপর ব্যাংকে ঢুকল ঝাড়ুদার।

উঠে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে চত্বর ধরে রওনা হল অন্ধ।

'আহা বেচারা!' জিভ দিয়ে চুকচুক করল মহিলা। 'কতদূর যেতে হবে কে জানে।'

'এই যে, শুনুন,' রবিন ডাকল। 'এই সাহেব।'

শুনল না লোকটা। লাঠি ঠুকতে ঠুকতে চলেছে।

'এইই!' গলা চড়াল রবিন। এগিয়ে গিয়ে চত্বর থেকে একটা মানিব্যাগ কুড়িয়ে নিল।

ততক্ষণে একটা সাইড স্ট্রীটের কাছে পৌঁছে গেছে লোকটা। লাঠির ডগা ঠুকে অনুমান করল কোথায় রয়েছে, তারপর নেমে গেল সাইড স্ট্রীটে। হেডলাইটের আলো পড়ল তার গায়ে। বেশ জোরে ছুটে আসছে একটা গাড়ি। স্টপ সাইন দেখে ব্রেক কষল, চাকা পিছলে গেল ভেজা পথে। প্রায় একই সঙ্গে চিৎকার করে উঠল রবিন আর মহিলা। আবার জোরে ব্রেক কষল কারের ড্রাইভার, কিঁইইচ করে আর্তনাদ করে উঠল টায়ার। পাশ কাটাতে চাইল। সরতে গিয়েও পারল না লোকটা। ধাক্কা দিয়ে তাকে রাস্তায় ফেলে দিল গাড়িটা।

থেমে গেছে গাড়ি। লাফিয়ে বেরিয়ে এল ড্রাইভার। দৌড় দিয়েছে রবিন, মহিলাও ছুটে আসছে তার পেছনে। পড়ে থাকা লোকটার ওপর একসাথে এসে ঝুঁকল তিনজনে।

হাঁটু গেড়ে পাশে বসে লোকটার হাত ধরার চেষ্টা করল ড্রাইভার।

'নাআআ!' চেঁচিয়ে উঠল অন্ধ। ঘুসি মারল। ঝটকা দিয়ে মুখ সরিয়ে ফেলল ড্রাইভার।

'আ-আমার চশমা!' রাস্তা হাতড়াচ্ছে অন্ধ।

কালো চশমাটা তুলে নিল মহিলা। ভাঙেনি। ধরিয়ে দিল অন্ধের হাতে।

চশমা পরে লাঠি খুঁজতে শুরু করল অন্ধ।

গাড়ির ড্রাইভার এক যুবক। হেডলাইটের আলোয় তার মুখের দিকে তাকাল রবিন, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা, ভয়ে। লাঠিটা তুলে রাখল সে অন্ধের হাতের তালুতে।

লাঠিতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল অন্ধ। মাথা নাড়ল, ঝাঁকি দিল, হাঁটতে পারবে কিনা বোধহয় আন্দাজ করে নিল, এগোতে শুরু করল আবার সাইড স্ট্রীট ধরে। এখন খোঁড়াচ্ছে। পা ফেলেই গুঙিয়ে উঠছে ব্যথায়।

'এই মিস্টার, শুনুন,' ডাকল ড্রাইভার।

'পুলিশকে ফোন করা দরকার,' মহিলা বলল। 'লোকটা অনেক ব্যথা পেয়েছে।'

চলার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে অন্ধ। লাঠি ঠুকছে, খোঁড়াচ্ছে, গোঙাচ্ছে, কিন্তু হাঁটছে আগের চেয়ে জোরে।

দৌড় দিল রবিন। থামতে বলছে।

একসারি দোকানের ওপাশে একটা গলিতে ঢুকে পড়ল লোকটা। পিছু নিল রবিন। এত অন্ধকার, প্রায় কিছুই দেখা যায় না। সামনে হাত বাড়িয়ে যেন বাতাস হাতড়ে হাতড়ে রবিনও এগোল অনেকটা অন্ধের মতই। বেশ কিছুটা দূরে একটা বাড়ির পেছনের দরজার ওপরে বাল্ব জ্বলছে। তলায় একটা ময়লা ফেলার ড্রাম। মলাটের একটা বাক্স পড়ে আছে ড্রামের পাশে, ভিজে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। আরেকটা রাস্তা চোখে পড়ল রবিনের। ঘুরে আরেকদিক দিয়ে গিয়ে উইলশায়ার বুলভারে উঠেছে।

কিন্তু অন্ধকে দেখতে পেল না। বাতাসে মিলিয়ে গেছে যেন।

দুই

'অন্ধ না-ও হতে পারে,' রবিন বলল। 'চোখে না দেখলে এত তাড়াতাড়ি পালাল কি করে?'

'কেউ কেউ পারে,' বলল কিশোর। 'চোখ হারালে কানের ক্ষমতা বেড়ে যায়।

প্রায় চোখওয়ালা লোকের মতই চলতে পারে তখন। চোখওয়ালাদের অন্ধকারে চলতে অসুবিধে, অন্ধের সেই অসুবিধেও নেই।'

পরদিন সকালে, পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে আগের দিন সন্ধ্যার কথা আলোচনা করছে তিন গোয়েন্দা। বৃষ্টি শেষ। উজ্জ্বল, পরিষ্কার সকাল। যে মানিব্যাগটা কুড়িয়ে পেয়েছিল রবিন, সেটা পড়ে আছে ওঅর্কশপের ওঅর্কবেঞ্চের ওপর।

'ধরে নিলাম অন্ধ নয়। তাহলেও দৌড় দেবে কেন?' রবিনের প্রশ্ন। 'এমন ভাব দেখাল, যেন আমাদের ভয় পেয়েছে।' এক মুহূর্ত ভাবল সে। 'সবাই বোধহয় কাল বোকামি করেছি আমরা। গলি থেকে ফিরে এসে দেখি মহিলা চলে গেছে। বাস আসতেই হয়ত উঠে পড়েছে। কারের ড্রাইভার তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। অন্ধকে পাইনি, একথা জানাতেই গাড়িতে উঠে চলে গেল। হাতে মানিব্যাগটা নিয়ে গাধার মত দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। একবারও মনে হয়নি, আমার নাম, অন্ধ লোকটার নাম তাকে জানিয়ে রাখা উচিত ছিল।'

'একে বোকামি বলা যায় না,' কিশোর বলল। 'ওরকম জরুরি পরিস্থিতিতে অনেকেই অমন করবে।'

কাজ করতে করতে রবিনের কথা শুনছে সে। হপ্তাখানেক আগে পুরানো একটা নষ্ট টেলিভিশন সেট কিনে এনেছিলেন রাশেদ পাশা, সেটা মেরামত করছে। বাতিল পার্টসগুলো বদলে নতুন লাগাচ্ছে। ক'দিন ধরেই করছে কাজটা, এখন শেষবারের মত ফাইন টিউনিং করে সকেটে ঢোকাল প্লাগ।

সুইচ অন করতেই মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল। 'হুঁ, ঠিক হয়েছে মনে হয়।'

'হবেই,' হেসে বলল মুসা। 'কার হাত লেগেছে দেখতে হবে না।'

জবাব না দিয়ে একটা নবে মোচড় দিল গোয়েন্দা প্রধান। পুরানো যন্ত্রপাতি মেরামতের হবি আছে কিশোরের, অসাধারণ মেধার পরিচয় দেয়। তিনটে মিনি ওয়্যারলেস সেট বানিয়েছে, যেগুলো অনেক কাজে লাগে তিন গোয়েন্দার। ওঅর্কশপের এক কোণে দাঁড়ানো ছাপার মেশিনটাও বাতিল হিসেবে কিনে আনা হয়েছিল, সারিয়ে নেয়ার পর এখন দিব্যি কাজ চলে। হেডকোয়ার্টারের ছাতে লাগানো পেরিস্কোপ 'সর্বদর্শন' তৈরির কৃতিত্বও অনেকখানিই তার। ট্রেলারে ঢোকার গোপনপথগুলোর পরিকল্পনাও সে-ই করেছে।

'মনে হচ্ছে,' আবার বলল মুসা। 'হেডকোয়ার্টারের জন্যে একটা টিভিও হয়ে গেল আমাদের···।'

তার কথায় বাধা দিল টেলিভিশনের ঘোষকঃ '···সকালের খবর নিয়ে উপস্থিত হচ্ছি আপনাদের সামনে।'

সংবাদ-পাঠকের ছবি ফুটল পর্দায়। 'গুড মর্নিং' জানিয়ে শুরু করল। প্রথমেই

জানাল ঝড়ের খবর। প্রশান্ত মহাসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপটি বিশেষ কোন ক্ষতি না করে লস অ্যাঞ্জেলেস আর দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া থেকে দূরে সরে গেছে। তবু আগামী কিছুদিন আবহাওয়া অস্থির থাকবে।

'...ম্যালিবুর পাহাড়ে ধস নেমেছে,' বলে চলেছে সংবাদ পাঠক। 'কাদা-পানিতে একাকার হয়ে গেছে বিগ টুজুংগা ক্যানিয়ন। ময়লা সাফ করতে ব্যস্ত এখন ওখানকার অধিবাসীরা।

'এক দুঃসাহসী ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে সান্তা মনিকার থ্রিফট অ্যাণ্ড সেভিংস কোম্পানিতে। ঝাড়ুদারের ছদ্মবেশে কাল সন্ধ্যায় ব্যাংকে ঢুকে বসেছিল ডাকাত। ব্যাংকের সিকিউরিটি গার্ডকে বোর্ড রুমে আটকে রেখে অপেক্ষা করছিল ওরা। আজ সকালে আটটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে টাইম লক খুলে দেয়া হয়, কর্মীদের ঢোকার জন্যে, ব্যাংকের একজিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট মার্ক জনসনকে ভল্ট খুলতে বাধ্য করে ওরা। নগদ প্রায় আড়াই লক্ষ ডলার আর সেফ-ডিপোজিট বক্সে রাখা দামি মালামালসহ নিরাপদেই পালিয়ে গেছে ডাকাতেরা। আমাদের সাংবাদিকেরা চলে গেছে ঘটনাস্থলে। দুপুরের খবরে বিস্তারিত জানাতে পারব আশা করি।'

সুইচ অফ করে দিল কিশোর।

'সর্বনাশ!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'দি সান্তা মনিকা থ্রিফট অ্যাণ্ড সেভিংস! ওখানেই তো ছিলাম কাল সন্ধ্যায়, অন্ধ লোকটা রাস্তা পেরোচ্ছিল...।' থেমে গেল সে। উত্তেজিত। 'কিশোর, একটা ডাকাতকে বোধহয় দেখেছি!'

রবিনের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে অন্য দু'জন।

'হ্যাঁ, দেখেছি। বাস স্টপ থেকে ব্যাংকের ভেতরটা দেখা যাচ্ছিল। ঝাড়ুদার দু'জন বেরিয়ে গিয়ে এলিভেটরে উঠল, একজন পুরুষ, একজন মহিলা। কিছুক্ষণ পর লোকটা এসে খটখট করলে দরজা খুলে দেয় সিকিউরিটি গার্ড।'

'ফিরে এল?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'সেই ঝাড়ুদার লোকটাই?'

'মনে তো হল...সেরকমই লাগল...,' সন্দেহ জাগল রবিনের চোখে। 'নাহ্, শিওর না।...হাত থেকে মগ ফেলে দিল অন্ধ, পয়সাগুলো সব ছড়িয়ে পড়ল। আমি আর মহিলা কুড়িয়ে তুলে মগটা দিলাম লোকটার হাতে, তখন ব্যাংকের দরজায় দাঁড়াতে দেখলাম ঝাড়ুদারকে।'

'তারমানে অন্য লোকও হতে পারে?'

'কি বুদ্ধি করেছে ব্যাটারা! খাইছে!' মুসা বলল। 'ঝাড়ুমোছা শেষ করে ওপরতলায় চলে গেল ঝাড়ুদারেরা। তখন লোকটার ছদ্মবেশে অন্য কেউ এসে দরজায় দাঁড়ালো। সিকিউরিটি ম্যান দরজা খুলে দিল। তারপর তাকেই আটকে

রেখে ডাকাতেরা ব্যাংকটাকে একেবারে নিজের বাড়ি বানিয়ে ফেলল। অ্যালার্ম বাজল না। আরামসে কাটিয়ে দিল সারাটা রাত, পরদিন সকালে কর্মচারীরা আসার অপেক্ষায় রইল।'

'রবিন, ঝাড়ুদার লোকটা কোত্থেকে এসেছিল দেখেছ?' কিশোর জানতে চাইল। 'এলিভেটর থেকে বেরিয়ে লবি দিয়ে, নাকি রাস্তা থেকে?'

মাথা নাড়ল রবিন। 'দেখিনি। দরজায় দাঁড়ানো দেখলাম। ভেবেছি, এলিভেটর থেকে নেমেই বুঝি এসেছে। এখন মনে হচ্ছে, রাস্তা থেকেও এসে থাকতে পারে। আমার ধারণা, ঝাড়ুদারদের কেউ নয়।'

'চমৎকার,' খুশি হল কিশোর। 'ভাবনার খোরাক পাওয়া গেল।' ওঅর্কবেঞ্চে পড়ে থাকা মানিব্যাগটা তুলে নিল। 'তুমি বললে, রাস্তা ধরে এসেছিল অন্ধ লোকটা। মগটা ফেলল এমন সময়, যখন ঝাড়ুদার আসছে। ওর পয়সা কুড়াতে ব্যস্ত হলে তোমরা, অবশ্যই মাথা নুইয়ে রাখতে হয়েছে। মাটি থেকে কিছু তুলতে গেলে নোয়াতেই হবে। তোমরা পয়সা কুড়ানোয় ব্যস্ত, ডাকাতটা ঠিক সেই সময় এল। কিছু বুঝতে পারছ।'

ঢোক গিলল রবিন। 'অন্ধও ডাকাতের দলের!'

মানিব্যাগটা উল্টেপাল্টে দেখছে কিশোর। 'সুন্দর। উটপাখির চামড়ায় তৈরি। নেইম্যান-মারকাস কোম্পানির জিনিস। শহরের সব চেয়ে দামি স্টোরগুলোর একটা।'

'এটা তো খেয়াল করিনি,' রবিন বলল। 'আমি শুধু দেখেছি, ভিখিরি লোকটার কোন টেলিফোন আছে কিনা। যাতে ফোন করে তার ব্যাগটা ফিরিয়ে দিতে পারি। নেই।'

ব্যাগটার ভেতরে কি আছে বের করতে লাগল কিশোর। 'একটা ক্রেডিট কার্ড, নগদ বিশ ডলার, একটা টেমপোরারি ড্রাইভিং লাইসেন্স। অন্ধ এক ভিখিরি ড্রাইভিং লাইসেন্স দিয়ে কি করে?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'ঠিক। অন্ধ নয় লোকটা। ভিখিরিও নয়।'

'ভিকটর সাইমন,' লাইসেন্সে লেখা নামটা পড়ল কিশোর। 'একশো বিরাশি সাইপ্রেস ড্রাইভ ক্যানিয়ন। ম্যালিবু।'

'সুন্দর জায়গা,' মুসা বলল। 'ওখানে থাকে। খুব ধনী ভিখিরি মনে হচ্ছে।'

'অন্ধের ঠিকানা না-ও হতে পারে এটা,' বলল কিশোর। 'হয়ত সে পকেটমার, চুরি করেছে। কিংবা পথে-টথে পেয়েছে কোথাও। রবিন, টেলিফোন ডিরেক্টরিতে ভিকটর সাইমনের নাম আছে?'

'খুঁজেছি। পাইনি।'

উঠে দাঁড়াল কিশোর। ব্যাগটা নাড়তে নাড়তে বলল, 'এটার ব্যাপারে আগ্রহী হবে পুলিশ। হয়ত, এই ব্যাগ ফেলে যাওয়াটা তেমন কিছু নয়। অন্ধের তাড়াহুড়ো করে পালিয়ে যাওয়াটাও কিছু মিন করে না। আর সাইপ্রেস ক্যানিয়নও এখান থেকে দূরে নয়। পুলিশকে জানানোর আগে ওখানে গিয়ে একবার খোঁজ করা দরকার, কি বল?'

'নিশ্চয়ই,' রবিন একমত।

সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা। প্যাসিফিক কোস্ট হাইওয়ে ধরে চলল উত্তরে, ম্যালিবুর দিকে। বিখ্যাত বীচ কমিউনিটির প্রধান বাজার এলাকা পেরোল আধ ঘন্টার মধ্যেই।

সরু একটা পথ সাইপ্রেস ক্যানিয়ন ড্রাইভ, কোস্ট হাইওয়ে থেকে বেরিয়ে এঁকেবেঁকে সরে গেছে দু'শো মিটার। তারপর হাইওয়ের সঙ্গে প্রায় সামান্তরালে এগিয়েছে। ওটা ধরে সাইকেল চালাতে চালাতে হাইওয়ের যানবাহনের শব্দ কানে আসছে ছেলেদের। বাঁয়ে গাছের ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ছে সমুদ্র। ডানে পাহাড়ের ঢাল নেমে গিয়ে পথ পেরিয়ে আবার উঠেছে ওপাশে। পর্বতের চূড়ার ওপরে ঝকঝকে আকাশ ঘন নীল।

'এখানে কেউ থাকে বলে তো মনে হয় না,' কাদাভরা পথ ধরে বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর বলল রবিন। 'একটা বাড়িও দেখলাম না। লাইসেন্সের ঠিকানাটাও নকল না তো?'

'জমাট বাঁধছে রহস্য,' গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মুচকি হাসল মুসা। 'অন্ধের কি দরকার ড্রাইভিং লাইসেন্স? তা-ও ভিখিরি। তার পরেও আবার নকল।'

হঠাৎ ঝুপ করে যেন নিচে পড়ে গেছে পথটা। জায়গাটাকে দেখে মনে হয় পাহাড়কে আঙুল দিয়ে টিপে ওখানটায় বসিয়ে দিয়েছে কোন মহাদানব। সরু একটা নহর বইছে ওখানে। খাদের মত জায়গাটার ওপাশ থেকে আবার উঠে গেছে পথ। ওখানে উঠে থামল ছেলেরা। সামনে একটা গিরিখাত। শুকনো মৌসুমে বোধহয় শুকনোই থাকে, কিন্তু এখন বাদামী ঘোলাটে পানির তীব্র স্রোত বইছে। পথের বাঁয়ে গিরিখাতের একেবারে ধার ঘেঁষে পুরানো একটা গোলাবাড়ি জাতীয় বাড়ি, দোতলায় বড় বড় জানালা। ছাঁইচে লাগানো একসারির টিউব লাইট। এক প্রান্তে বড় করে সাইনবোর্ড লেখাঃ নুমেরি'জ্ ইন।

'নুমেরির সরাইখানা,' বাংলায় বিড়বিড় করল কিশোর।

'রেস্টুরেন্ট মনে হচ্ছে?' রবিন বলল।

পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে লাইসেন্সে লেখা ঠিকানাটা দেখল আবার

কিশোর। 'একশো বিরাশি নম্বর। হ্যাঁ, ঠিকই আছে। ওই যে, নতুন মেইলবক্সটার নম্বর লেখা রয়েছে।'

পেছনে গাড়ির শব্দ শোনা গেল। নিচু জায়গায় জমে থাকা পানি ছিটিয়ে এল একটা লাল স্পোর্টস কার। গাড়ির চালক হালকা পাতলা, ধূসর চুল, বিষণ্ন চেহারা, ছেলেদেরকে যেন চোখেই পড়ল না। নুমেরি'জ্ ইন-এর কাঁচা চত্বরে কাদা জমে আছে। সেখানে গিয়ে থামল গাড়ি। নেমে একটা লাঠি বের করল চালক। তাতে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে উঠল বাড়ির সিঁড়িতে। প্রায় ভাঙা একটা স্ক্রীন ডোর টান দিয়ে খুলে চলে গেল ওপাশে, পেছনে বন্ধ হয়ে গেল পাল্লা।

'খোঁড়া!' ফিসফিসিয়ে বলল মুসা। 'কাল রাতে খোঁড়াতে দেখেছ না লোকটাকে?'

'অ্যাক্সিডেন্টের পর। গাড়ির ধাক্কায় পায়ে আঘাত লেগেছিল হয়ত।'

'এই লোকটা কি ওই লোকটার মত?' কিশোর জিজ্ঞেস করল। 'দেখতে?'

শ্রাগ করল রবিন। 'সাইজ-টাইজ তো একই রকম। বয়েসও এক। একজনের সঙ্গে আরেকজনের এরকম মিল থাকতেই পারে।'

'বেশ। আমি যাচ্ছি।'

'গিয়ে কি করবে?' মুসা বলল। 'হ্যামবার্গার কিনবে?'

'পাওয়া গেলে। কিংবা ঠিকানা জিজ্ঞেস করব। আসলে জানার চেষ্টা করব লোকটা কে? রবিন, লুকিয়ে পড়। তোমাকে চিনে ফেলতে পারে। গণ্ডগোল করতে পারে।'

'আমিও থাকি,' মুসা বলল। 'গণ্ডগোল করে যারা, তাদের পছন্দ করি না আমি।'

'ভয় পাও?' হাসল রবিন।

'না। বুড়ো হয়ে স্বাভাবিক মৃত্যু আমার কাম্য।'

'বাহ্, ভাল কথা শিখেছ আজকাল,' কিশোরও হাসল। রাস্তার ধারে দুই বন্ধুকে রেখে সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে চলে এল চত্বরে। দেয়ালে ওটা ঠেস দিয়ে রেখে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল বারান্দায়। ছোট বারান্দা পেরিয়ে এসে দাঁড়াল স্ক্রীন ডোরের সামনে। হাতল ধরে টানতেই খুলে গেল পাল্লা।

ভেতরে আবছা অন্ধকার। পালিশ করা শক্ত কাঠের মেঝে, গাঢ় রঙের কাঠের প্যানেলিং। নাক বরাবর সামনে চওড়া দরজার ওপাশে বিশাল একটা ঘর, শূন্য। ওটার সামনের দেয়াল পুরোটাই জানালা। বাইরের গাছপালা, রোদে আলোকিত সাগর, সব চোখে পড়ে। কিশোর অনুমান করল, একসময় ওটা রেস্টুরেন্টের মেইন ডাইনিং রুম ছিল। বোঝা যায়, রেস্টুরেন্ট আর নয় এখন বাড়িটা।

প্রশস্ত একটা প্যাসেজওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে সে, যেটাকে বড় ঘরটার লবি বলা চলে। লবির প্রান্তে ছড়ানো একটা জায়গায় অবহেলায় পড়ে রয়েছে কফি বানানোর সরঞ্জাম, কাঠের কাউন্টার, টুল, বুদ, ধুলোয় ঢাকা। কফি শপ ছিল ওটা এককালে। ডানের দেয়ালে দেখা যাচ্ছে বেশ কয়েকটা দরজা। নানারকম বাক্স স্তূপ হয়ে আছে কফি শপ আর লবিতে। বড় ঘরটার কাঠের মেঝেতে রয়েছে আরও কিছু বাক্স। একটা বাক্স খোলা।

ধীরে ধীরে এগোল কিশোর। ডাক দিতে যাবে এই সময় কানে এল ক্রেডল থেকে রিসিভার ওঠানোর শব্দ। স্থির দাঁড়িয়ে কান পাতল। বড় ঘরটায় কেউ রয়েছে, দেখতে পাচ্ছে না সে, টেলিফোন করছে।

কথা শোনা গেল, 'ভিকটর বলছি।'

এক মুহূর্ত নীরবতার পর আবার কথা, 'হ্যাঁ, জানি, দামি। দাম বেশি তো হবেই, এটা একটা কথা হল নাকি। খরচ করতে রাজি আছি আমি।'

ঠিক এই সময় কিশোরের পিঠে শক্ত কিছু চেপে ধরা হল।

'স্বর্গে যাওয়ার ইচ্ছে না থাকলে নড়ো না,' পেছন থেকে ভাঙা ইংরেজিতে বলল কেউ। 'দু'টুকরো করে ফেলব।'

তিন

মাথার ওপর হাত তুলল কিশোর। ঘাড়ের কাছে শিরশির করছে। 'আমি…আমি…।'

'চুপ কর,' শান্তকণ্ঠে আদেশ হল।

কাঠের মেঝেতে পায়ের শব্দ। চওড়া দরজায় দেখা দিলেন ধূসর চুল মানুষটা। হাতের লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে মাথা সামান্য কাত করে তাকালেন কিশোরের দিকে। ভুরু কোঁচকানো। 'কি হয়েছে, কিম? ছেলেটা কে?'

ভ্রূকুটি করল কিশোর। লোকটাকে কোথায় দেখেছে। কণ্ঠস্বর, ওভাবে মাথা কাত করে কথা বলার ভঙ্গি…কোথায় দেখেছে? কবে?

'চুরি করে ঢুকেছে এখানে,' জবাব দিল কিম। 'এখানে দাঁড়িয়ে আড়িপেতে আপনার কথা শুনছিল।'

'আমি শুধু ঠিকানা জানতে এসেছি,' নিরীহ কণ্ঠে বলল কিশোর। 'সাইনবোর্ড দেখলাম, নুমেরি'জ্ ইন। রেস্টুরেন্ট, তাই না? চুরি করে ঢুকিনি। দরজা খোলাই ছিল।'

'ছিল,' হাসলেন তিনি। লাঠিতে ভর দিয়ে দিয়ে এগিয়ে এলেন কাছে।

'রেস্টুরেন্ট ছিল আগে। তা দরজা খোলা ছিল, না?'

রক্তিম গাল তাঁর। চোখা পাতলা নাক। রোদে পোড়া মুখের চামড়া। কালচে-ধূসর ঘন ভুরুর নিচে চোখ দুটো নীল। 'রিল্যাক্স, ইয়াং ফ্রেণ্ড, ভয়ের কিছু নেই। ইচ্ছে করলেও কিম তোমাকে গুলি করতে পারবে না।'

সাবধানে হাত নামাল কিশোর। ফিরে তাকাল কিমের দিকে।

'তুমি মনে করেছিলে পিস্তল ঠেকিয়েছি,' নিজের চালাকিতে খুব সন্তুষ্ট কিম। বাড়ি এশিয়ায়, চেহারা দেখেই বোঝা যায়। কিশোরের সমান লম্বা, স্বাস্থ্যও প্রায় তার মতই, মুখের চামড়া মসৃণ। হাতে একটা কাঠের চামচ, সেটাই ঠেকিয়ে রেখেছে কিশোরের পিঠে। 'দেখলে তো, পিস্তল নয়। টেলিভিশন দেখে শিখেছি।'

'ও নিসান জাং কিম, ভিয়েতনামে বাড়ি।' পরিচয় দিলেন ধূসর-চুল ভদ্রলোক। 'অল্প দিন হল এসেছে এদেশে। সুযোগ পেলেই টেলিভিশনের সামনে গিয়ে বসে, ইংরেজি শেখার চেষ্টা করে। এখন তো দেখি আরও অনেক কিছুই শিখছে।'

বাউ করল ভিয়েতনামী। 'ওপর তলায় আটকা পড়লে কি করতে হবে জান?' কিশোরকে বলল সে। 'বিছানার চাদর ছিঁড়ে পাকিয়ে দড়ি বানাতে হবে। সেটা বেয়ে নেমে গেলেই হল। আর যদি বিছানা না-ই পাও, নাগালের মধ্যে পাইপ পেয়েই যাবে।'

আরেকবার বাউ করে কফি শপের দিকে চলে গেল কিম। কৌতূহলী চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইল কিশোর।

'কি যেন "শুধু" জানতে এসেছিলে?' জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।

'অ্যাঁ, ও! ও, হ্যাঁ...এদিকে একটা নদী আছে। নদীর ওপারেও কি আছে রাস্তাটা? নদী পেরোনোর ব্যবস্থা আছে?'

'রাস্তা এপারেই শেষ। আর নদী পেলে কোথায়, ওটা তো গিরিখাত। এখন পেরোনোর চেষ্টাও কর না, নির্ঘাত মরবে। যা স্রোত।'

'অ,' আনমনে বলল কিশোর, কথা শুনছে বলে মনে হল না। লবির কোণে রাখা একটা বাক্সের দিকে চেয়ে আছে। ওটার ওপরে ছ'টা বই, একই বইয়ের ছ'টা কপি। কালো মলাটের ওপর উজ্জ্বল লাল রঙে লেখা নাম। কভারের ছবি—নীল পায়রার বুকে ছুরি বিদ্ধ। বইটার নাম 'ব্লু পিজিয়ন'।

'ভিকটর সাইমন!' হঠাৎ বলে উঠল কিশোর। এগিয়ে গিয়ে একটা বই তুলে পেছনটা উল্টে দেখল। পেছনের কভারে একটা ফটোগ্রাফ।

'এ-তো আপনার ছবি!' বলল সে। 'আপনিই ভিকটর সাইমন। টেলিভিশনে দেখেছি আপনাকে।'

'দেখতে পার। কয়েকবার সাক্ষাৎকার দিয়েছি।'

'ব্লু পিজিয়ন পড়েছি আমি,' নিজের কানেই অদ্ভুত লাগছে কিশোরের কণ্ঠস্বর। ভীষণ উত্তেজিত। 'সাংঘাতিক বই! দারুণ লেখা! কিলার'স গেমও পড়েছি। মিস্টার সাইমন, আপনার তো ব্যাংক ডাকাতির দরকার পড়ে না!'

'করেছি ভাবছ নাকি!' হাসলেন সাইমন। 'নদীর খোঁজ নিতে এখানে আসনি তুমি। কেন এসেছ?'

লাল হল কিশোরর গাল। 'আমি…আমি…সরি, মিস্টার সাইমন, মিথ্যে কথা বলেছি। আপনার মানিব্যাগ হারানো গেছে?'

তাকিয়ে আছেন সাইমন। জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢোকালেন। চাপড় দিয়ে দেখলেন অন্যান্য পকেটগুলো। 'আরে! নেই তো। তুমি পেয়েছ?'

'রবিন পেয়েছে, আমার বন্ধু!' সংক্ষেপে সব জানাল কিশোর।

'আশ্চর্য! একেবারে ডেভিস ক্রিস্টোফারের সিনেমার মত। …কি ব্যাপার? হাসছ যে?'

'উনি আমাদের বন্ধু, স্যার। আমাদের কেসের কাহিনী লেখে রবিন, গল্প ভাল হলে সেটা দিয়ে ছবি করে ফেলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার।'

'কি ধরনের কেস? আর তোমার বন্ধু রবিন এখন কোথায়?'

'রাস্তায়। নিয়ে আসছি।' ছুটে ঘর থেকে চত্বরে বেরোল কিশোর। পার্কিং লটে এসে হাত নেড়ে ডাকল, 'এই, তোমরা এস।' কাছে এল দুই সহকারী গোয়েন্দা।

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'মিস্টার ভিকটর সাইমন। জান তিনি কে?'

পরস্পরের দিকে তাকাল মুসা আর রবিন। মাথা নাড়ল মুসা। 'জানি না।'

হাসল কিশোর। 'ব্লু পিজিয়নের লেখক। কিলার'স গেম, শক ট্রিটমেন্টও তিনিই লিখেছেন। টিভিতে দেখাল না তাঁর সাক্ষাৎকার? একটা বই সিনেমাও হতে যাচ্ছে, কিলার'স গেম।'

'ও, হ্যাঁ,' মাথা দোলাল মুসা। 'মনে পড়েছে। কিলার'স গেম-এর কথা সেদিন বাবা আলোচনা করছিল। ইনিই ভিকটর সাইমন?'

'হ্যাঁ,' কণ্ঠের উত্তেজনা যায়নি এখনও কিশোরের। 'নিউ ইয়র্ক সিটিতে গোয়েন্দা ছিলেন তিনি অনেকদিন, রিপোর্টেও থেকেছেন। প্লেন চালাতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলেন। একটা পা ভেঙে গিয়েছিল। পা সারার জন্যে ঘরে বসে থাকতে হয় অনেকদিন। তখনই ঠিক করলেন, বই লিখবেন। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেও ফেললেন শক ট্রিটমেন্ট। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বেস্টসেলার হয়ে গেল বইটা। এই সেই ভিকটর সাইমন, গোয়েন্দা-কাম-লেখক। চল, চল,

দেখা করবে না তার সঙ্গে? রবিন, মানিব্যাগটা আছে তো?'

'তোমাকেই তো দিয়েছিলাম,' রবিন বলল। 'ভুলে গেছ?'

'অ্যাঁ, ও তাই তো,' নিজের পকেট চাপড়াল কিশোর। 'আছে। চল।'

লেখকের সঙ্গে দুই সহকারীর পরিচয় করিয়ে দিল গোয়েন্দাপ্রধান। ওদেরকে বড় জানালাওয়ালা ঘরটায় নিয়ে এলেন সাইমন। কয়েকটা ফোল্ডিং চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন। একটা টেবিল ঘিরে রাখা হয়েছে চেয়ারগুলো। টেবিলটার ওপরের অংশ কাচের তৈরি। টেবিল, চেয়ার, টেলিফোনটা ছাড়া আর কোন আসবাবপত্র নেই ঘরে।

'মাত্র গত হপ্তায় এসে উঠেছি,' জানালেন সাইমন। 'আমি আর কিম।'

'এখানে থাকবেন?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ।' খোঁড়াতে খোঁড়াতে লবিতে গিয়ে কিমকে ডাকলেন তিনি।

কফির সরঞ্জাম নিয়ে এল ভিয়েতনামী। তাকে জিজ্ঞেস করলেন লেখক, 'ছেলেদের জন্যে কিছু আছে ফ্রিজে?'

'লেমোনেড। একেবারে খাঁটি জিনিস, নেচারাল ফ্লেভার।'

হাসল কিশোর। 'নেচারাল ফ্লেভার' শব্দটাও নিশ্চয় টেলিভিশন থেকে শিখেছে কিম, লেমোনেডের বিজ্ঞাপন দেখে।

'লেমোনেড চলবে?' ছেলেদের জিজ্ঞেস করলেন সাইমন।

মাথা ঝাঁকাল তিনজনে।

রান্নাঘরে চলে গেল কিম। বাড়ির একেবারে দূরতম কোণে রান্নাঘরটা, কফি শপ ছাড়িয়ে ওপাশে।

'বিজ্ঞাপনগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে ও,' হেসে বললেন লেখক। 'স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আলোচনাগুলো শোনে। ইস্, খাবার যা এনে হাজির করে না, ভয়ঙ্কর।'

পুরানো রেস্টুরেন্টের কথা তুললেন এরপর সাইমন। কি করে এখানে এলেন, এটাকে মেরামত করে কি করবেন, এসব। বসবাসের যোগ্য সুন্দর একটা বাড়ি বানানোর ইচ্ছে আছে তাঁর। বললেন, 'কফি শপটাকে করব ডাইনিং রুম। লবির একধারে একটা স্টোর আছে, ওটাকে কিমের বেডরুম বানানো হবে। আর ওর বাথরুমটা করব ওই যে ওই ওদিকে, সিঁড়ির নিচে।'

লবির দেয়াল ঘেঁষে উঠে যাওয়া সিঁড়িটা দেখল ছেলেরা। সিঁড়ির মাথায় একটা গ্যালারি, অনেক বড়। ওখান থেকে এ ঘর দেখা যায়, যেখানে ওরা বসেছে। ঘরটার ছাত অনেক ওপরে, প্রায় দোতলার সমান উঁচুতে। এই ঘরটাই বাড়ির প্রায় অর্ধেক। বাকি অর্ধেকের নিচের তলায় রয়েছে লবি, স্টোররুম, কফি শপ, রান্নাঘর। আর ওগুলোর ওপরে রয়েছে দোতলার অন্যান্য ঘর, সবগুলোর

দরজা দিয়েই গ্যালারিতে আসা যায়।

'অনেক কিছুই ভেঙেচুরে গেছে,' সাইমন বললেন। তবে কাঠামোটা অত্যন্ত মজবুত, আর্কিটেক্ট আর একজন বিল্ডিং কন্ট্রাকটরকে দেখিয়ে তবেই কিনেছি। সাগরের ধারে এরকম জায়গায় এত বড় বাড়ি কিনতে খরচ কত পড়েছে কল্পনা করতে পার?'

'নিশ্চয় অনেক,' কিশোর বলল।

মাথা ঝাঁকালেন লেখক। 'আরও অনেক খরচ আছে। তবে মেরামত হয়ে গেলে দেখার মত বাড়ি হবে। এত বড়, উঁচু একটা ঘর পেয়েছি। সাগর দেখা যায়। ছাতে একটা ফুটোও নেই। থাকলে এরকম জায়গায়ই থাকা উচিত। অথচ তেইশটা বছর কি এক খুপরিতে যে কাটিয়েছি, ব্রুকলিনের এক অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে। বৃষ্টি হলেই ছাত দিয়ে পানি পড়ত। সব সময় হাতের কাছে কয়েকটা বালতি রাখতে হত, বৃষ্টি নামলেই ফুটোর তলায় বসানোর জন্যে।'

হাসলেন সাইমন। 'কেউ কেউ যে বলে ধনী হওয়ার চেয়ে গরিব থাকা ভাল, ওগুলো গাধা। আরে ব্যাটা পয়সাই যদি না থাকল আরামে থাকবি কি করে?'

লেমোনেড নিয়ে হাজির হল কিম।

মানিব্যাগটা বের করে কাচের সুন্দর টেবিলটায় রাখল কিশোর।

তুলে নিলেন সাইমন। 'অন্ধ ভিখিরি ফেলে গেছে, না? টাকার ঠেকা নেই ওর, মনে হচ্ছে। একটা পয়সাও খরচ করেনি।'

'কিন্তু সে ভিক্ষে করছিল,' রবিন বলল। 'হাতে টিনের মগ। তাতে পয়সা।'

চিন্তিত দেখাল তাঁকে। 'পেল কি করে ব্যাগটা? যদি অন্ধই হবে···।'

'ঠিক বলেছেন, স্যার,' কিশোর বলল। 'চোখে দেখে না, রাস্তায় পড়া থাকলে দেখল কি করে? তবে, ব্যাগটার ওপর লাঠি লাগলে বোঝার কথা···এটা কোথায় রেখেছিলেন?'

'পেশাদারি গন্ধ পাচ্ছি তোমার কথায়? এখুনি নোটবুক আর পেন্সিল বের করবে না তো? ও, কেসের কথা বললে না তখন? কি কেস? গোয়েন্দাগিরির তালিম নিচ্ছ নাকি?'

'তালিম নয়, গোয়েন্দাই আমরা,' বলতে বলতে পকেট থেকে কার্ড বের করে দিল কিশোর।

কার্ডটা দেখে আনমনে মাথা দোলালেন সাইমন। 'হুঁউঁ। ভাল।'

সামনে ঝুঁকল রবিন। 'আমরা সন্দেহ করছি, ব্যাংক ডাকাতির সঙ্গে অন্ধ ভিখিরির সম্পর্ক আছে। কাল কি সান্তা মনিকায় গিয়েছিলেন আপনি? ওখানেই কোথাও মানিব্যাগটা ফেলেছেন? নাকি আপনার পকেট মেরে দিয়েছে?'

'না,' চেয়ারে হেলান দিলেন লেখক। 'কাল সকালেও এটা আমার পকেটে ছিল। মনে আছে। বাড়ি থেকে বেরোচ্ছিলাম, তখন দেখেছি। তারপর আর এটার খোঁজ করিনি। তোমরা মনে করালে। মনে হয় নিকারোদের ওখানেই কোথাও ফেলেছি। কাল ওখানে ছাড়া আর কোথাও যাইনি। কি করে পড়ল জানি না। ভিড়ের মধ্যে যাইনি, কারও সঙ্গে ধাক্কাও লাগেনি, পকেটমারা গেল কখন? কোন অন্ধকেও দেখিনি, তাহলে মনে থাকত।'

'নিকারো?' মুসা বলল। 'উপকূলের ওদিকে, না? শখের মাছশিকারিদের নৌকা ভাড়া দেয় যারা? নিকারো'জ্ অ্যাণ্ড কোং?'

মাথা ঝোঁকালেন সাইমন। 'আমার স্পীডবোট ওখানেই রাখি। এখান থেকে সব চেয়ে কাছের ম্যারিনা ওটাই। বোট নিয়ে বেরোনোর দরকার হলে ওদের ওখানে চলে যাই। মিসেস নিকারোর ওখানে চাকরি করে দুটো ছেলে। নৌকায় করে আমাকে বয়ার কাছে নিয়ে যায়, ওখানেই আমার বোট বাঁধা থাকে। কাল বোটে করে কিছুক্ষণ হাওয়া খেয়ে এসেছি। পকেট থেকে ব্যাগটা কোনভাবে পড়ে গিয়ে থাকতে পারে। পার্কিং লটে, কিংবা ডকের কাছে।'

'এবং অন্ধ সেটা কুড়িয়ে নিয়েছে,' মুসা বলল।

'ওটা নিয়ে তারপর চলে গেছে সান্তা মনিকায়,' রবিন বলল। 'ঠিক সময়ে গিয়ে হাজির হয়েছে বাস স্টপে, ঝাড়ুদারের ছদ্মবেশে যখন ডাকাত ঢুকেছে ব্যাংকে। মগ ফেলাটা তার একটা ছুতোই, যাতে আমরা পয়সা কুড়ানোয় ব্যস্ত থাকি, ব্যাংকের দিকে চোখ না দিতে পারি।'

'না-ও হতে পারে,' বললেন সাইমন। 'ভিজে পিচ্ছিল হয়ে গিয়েছিল মগটা, হাত থেকে সত্যি হয়ত ছুটে গিয়েছিল, অভিনয় নয়। মগ ফেলার মধ্যে তেমন কোন গুরুত্ব দেখি না।'

'চলে যাওয়ার সময় ব্যাগটা পড়ে গিয়েছিল,' কিশোর বলল। 'রবিন সেটা পেয়ে তাকে ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছিল, এই সময় একটা গাড়ি এসে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল লোকটাকে।'

'অস্বাভাবিক নয়। অন্যের জিনিস তার কাছে ছিল, সেটা পড়ল আরেকজনের কাছে। যদি তাকে চোর মনে করে বসে? যদি পুলিশ এসে ধরে, জিজ্ঞেস করে কি করে পেল সে? ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। তাড়াহুড়ো করে ছুটে চলে যাচ্ছিল হয়ত সে-কারণেই। মগ পড়া, মানিব্যাগ পড়া, পালিয়ে যাওয়া, কোনটাই প্রমাণ করে না সে ডাকাতির সঙ্গে জড়িত। কিন্তু এসব কথা পুলিশকে গিয়ে জানাচ্ছ না কেন? ইচ্ছে করলে আমার নামও বলতে পার ওদের। পুলিশকে সাহায্য করতে পারলে খুশিই হব।'

'যাব,' হতাশ মনে হল কিশোরকে। 'আপনি ঠিকই বলেছেন, অন্ধ ভিখিরির ব্যাপারটা কাকতালীয়ও হতে পারে। আমার দুঃখ, কেসটা শুরু হওয়ার আগেই শেষ হয়ে গেল।'

'তাই? শোন, কষ্ট করে ব্যাগটা নিয়ে আসায় খুব খুশি হয়েছি।'

'না না, কষ্ট আর কি?' তাড়াতাড়ি বলল মুসা।

লেখককে ব্যাগ থেকে নোট বের করতে দেখে হাত নাড়ল রবিন, 'না না, আমাদেরকে কিছু দেবেন না, প্লীজ।'

'তাহলে কি পুরস্কার দেয়া যায়?' জিজ্ঞেস করলেন সাইমন। 'আমার বোটে চড়ে হাওয়া খেতে যাবে? পরের বার যখন যাব আমি?'

'খালি জানাবেন,' আনন্দে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে মুসার। 'আধ ঘন্টার মধ্যে হাজির হয়ে যাব।'

'বেশ, তোমাদের ফোন নাম্বার দাও।'

বাড়ির ফোন নাম্বার জানাল মুসা। রবিন আর কিশোরও জানাল যার যারটা।

বারান্দায় ওদেরকে এগিয়ে দিয়ে গেলেন গোয়েন্দা–কাম–লেখক। ওরা সাইকেলে উঠে রওনা হওয়ার পরও দাঁড়িয়ে রইলেন।

'দারুণ লোক,' মুসা বলল।

'হ্যাঁ,' একমত হল কিশোর। 'আমাদের দেখে খুব খুশি হয়েছেন। লোকটাকে নিঃসঙ্গ মনে হল। ক্যালিফোর্নিয়ায় কেমন লাগছে কে জানে, নিউ ইয়র্ক থেকে এসেছেন তো?'

মুখ খুলতে যাচ্ছিল রবিন, একটা গাড়ি দেখে থেমে গেল। বাদামি রঙের একটা সেডান। ওদের পাশ কাটিয়ে গিয়ে মিস্টার সাইমনের বাড়ির সামনের চত্বর থামল। গাড়ি থেকে নেমে বারান্দায় উঠল একজন বয়স্ক লোক, সাইমন তখনও ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন।

কি কথা হল, শোনা গেল না।

দু'জনে ঢুকে গেলেন ভেতরে।

'কিশোর,' রবিন বলল। 'কেসটা বোধহয় শেষ হয়নি।'

'কেন?' মুসার প্রশ্ন।

'সিকিউরিটি ম্যান। যে ব্যাংকে ডাকাতি হয়েছে ওটার সিকিউরিটি গার্ড, ওকেই দেখেছি কাল সন্ধ্যায়। এই লোক মিস্টার সাইমনের বাড়িতে কেন?'

চার

'বুঝতে পারছি না!' কিশোর বলল। 'ভিকটর সাইমনের টাকার অভাব হবার কথা নয়। তাঁর সব বই বেস্টসেলার।'

'কিন্তু ব্যাংক ডাকাতিতে যদি জড়িতই না হবেন,' প্রশ্ন তুলল রবিন। 'সিকিউরিটি গার্ড এখানে কেন?'

'জানি না।'

বিকেলের শুরু। হেডকোয়ার্টারে আলোচনায় বসেছে তিন গোয়েন্দা। ওরা সাইপ্রেস ক্যানিয়ন ড্রাইভে থাকতে থাকতেই আবার ফিরে গেছে সিকিউরিটি ম্যান। সেই কথাই আলোচনা করছে এখন।

'কাল রাতে অন্ধ লোকটা খুঁড়িয়েছে,' রবিন বলল। 'মিস্টার সাইমনও খোঁড়ান।'

'অন্ধ লোকটা কি অ্যাক্সিডেন্টের আগে খুঁড়িয়েছিল?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'খেয়াল করিনি।'

'খোঁড়ানোর ব্যাপারটা হয়ত কাকতালীয়,' বলল মুসা। 'মানিব্যাগ পাওয়াটাও। মিস্টার সাইমনের বাড়িতে গার্ডের যাওয়াটাকেও যদি সে-রকম কিছু ধরা যায়, অনেকগুলো কাকতালীয় ব্যাপার হয়ে গেল না?'

'পুলিশের কাছে যাচ্ছি না কেন আমরা?' রবিন বলল। 'মিস্টার সাইমনও তাই বললেন। ডাকাতিতে জড়িত থাকলে বলতেন কি?'

'অনেক অপরাধী বলে ওরকম,' বলল মুসা। 'নিজেকে নির্দোষ বোঝানোর জন্যে।'

'পুলিশ আমাদের কথা বিশ্বাস করবে না,' কিশোর বলল। 'অন্তত মিস্টার সাইমনের ব্যাপারে। আমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারছি না। তাঁর যে সুনাম, এই জিনিস নষ্ট করতে চাইবে না কোন সুস্থ মস্তিষ্কের লোক। তবে মনে হচ্ছে এই ডাকাতির সঙ্গে কিছু একটা যোগাযোগ রয়েছে তাঁর। মিস্টার রোজার হয়ত আমাদের সাহায্য করতে পারবেন।'

'মিস্টার রোজার?' চিনতে পারল না রবিন।

ডেস্কে রাখা একটা খবরের কাগজ টেনে নিল কিশোর। সান্তা মনিকা ইভনিং আউটলুকের একটা সংখ্যা। সেদিনই বেরিয়েছে। বাড়ি ফেরার পথে নাস্তা খেতে থেমেছিল তিন গোয়েন্দা, তখন পত্রিকাটা কিনেছে সে।

'ব্যাংকের সিকিউরিটি গার্ডের নাম ড্যানি রোজার,' জানাল কিশোর। 'এই

পত্রিকায় লিখেছে।' টেলিফোন ডিরেক্টরির জন্যে হাত বাড়াল সে। অল্পক্ষণেই পেয়ে গেল যা খুঁজছে।

'হুঁম। একজন ড্যানি রোজারের নাম আছে। তিনশ' বারো ডলফিন কোর্টে থাকে। সৈকতের ধারে।'

'কিশোওর!' বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল। 'আরে এই কিশোর, কোথায় তুই?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিশোর। 'চাচী। সেই সকালের পর থেকে আর আমাকে দেখেনি তো। অস্থির। কত খাবার আর কাজ জমিয়ে রেখেছে কে জানে!'

'আমার মা-ও নিশ্চয় রেগে ভোম,' বলল মুসা। 'বহুত কাজ ছিল। ফেলে রেখে পালিয়েছি। গেলেই এখন ঘর মোছাবে কিংবা বাগানের ঘাস কাটাবে।'

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম,' কিশোর বলল। 'আমরা মিস্টার রোজারের সঙ্গে দেখা করব। সম্ভব হলে আজ বিকেলেই। তোমরা আসতে পারবে? রকি বীচ মার্কেটে, সন্ধ্যা সাতটায়। ওখান থেকে যাব তার বাড়িতে।'

'পারব মনে হয়,' জবাব দিল মুসা।

'আমিও পারব,' হেসে বলল রবিন। 'কাল তো আর ইস্কুল নেই যে পড়া লাগবে। সন্ধ্যায় দেখা হবে।'

ট্রেলার থেকে বেরিয়ে এল ওরা।

বিকেলটা স্যালভিজ ইয়ার্ডে কাজ করতে হল কিশোরকে। সকাল সকাল রাতের খাওয়া সেরে সাইকেল নিয়ে বেরোল।

সাতটার পাঁচ মিনিট আগে এল মুসা আর রবিন। সান্তা মনিকায় চলল তিনজনে।

পথের শেষ মাথায় ছোট ছোট কয়েকটা বাড়ির একধারে খুঁজে পাওয়া গেল তিনশ' বারো নাম্বার। রাস্তার নাম ডলফিন কোর্ট। ড্রাইভওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে বাদামি সেডান, সকালে যেটা দেখেছিল ছেলেরা। বাড়ির সামনের দিকে অন্ধকার, পেছনের একটা জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে। সাইকেল রেখে গিয়ে জানালা দিয়ে উঁকি দিল ওরা। ওটা রান্নাঘর।

লোকটা আছে। একা। জানালার ধারে বসে আছে। সামনে একগাদা খবরের কাগজ। হাতের কাছে টেলিফোন। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে টেবিলক্লথের দিকে। সকালের চেয়ে বয়স্ক লাগছে এখন তাকে। চুল পাতলা। চোখের নিচে কালি।

চুপচাপ দেখল ছেলেরা। তারপর ঘুরে, সামনের দরজায় বেল বাজাতে চলল কিশোর।

ড্রাইওয়েতে পথ রোধ করল পিস্তলধারী এক লোক। 'কি চাই?'

তাদের দিকে নিশানা করেনি পিস্তল, শান্ত, সংযত কণ্ঠ। শঙ্কিত হল কিশোর। লোকটার ঠাণ্ডা ভাবভঙ্গি দেখেই বুঝল, বিপজ্জনক লোক। চোখে সানগ্লাস।

হাত নেড়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল মুসা, 'চুপ!' বলে তাকে থামিয়ে দিল লোকটা।

জানালা খুলে গেল। মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল রোজার, 'রক, কে?'

পিস্তল নেড়ে রক বলল, 'এই ছেলেগুলো চুরি করে জানালা দিয়ে দেখছিল।'

'হুঁ?' অবাক মনে হল রোজারকে। কিছুটা কৌতূহলী। আবার বলল, 'হুঁ?' এবার সতর্ক।

'ঘরে ঢোক,' আদেশ দিল পিস্তলধারী। 'ওদিকে। হ্যাঁ, হাঁট।'

আবার রান্নাঘরের পেছনে নিয়ে আসা হল ওদেরকে। পেছনের দরজা দিয়ে ঢোকানো হল।

'এসব কি?' রোজার জিজ্ঞেস করল। 'সকালে তিনটে ছেলের কথা বলেছিলেন মিস্টার সাইমন। তোমরাই দেখা করতে গিয়েছিলে, না? তোমাদেরকে পথেও দেখেছি আমি।'

'হ্যাঁ, মিস্টার রোজার,' জবাব দিল কিশোর।

'বস,' চেয়ার টেনে দিল রোজার।

'ঘটনাটা কি, ড্যানি?' জানতে চাইল রক। 'ওরা কারা?'

'এখনও জানি না। তোমার পিস্তল সরাও। ভয় লাগে, কখন গুলি ছুটে যায়।'

দ্বিধা করল রক। তারপর পাজামার নিচের দিক তুলে, হাঁটুর নিচে বাঁধা হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল পিস্তলটা।

চোখ মিটমিট করল মুসা। কিছু বলল না। টেবিলের কাছে বসেছে ওরা।

'মিস্টার সাইমন বললেন,' রোজার বলল। 'তোমাদের একজন নাকি একটা সন্দেহজনক লোককে ব্যাংকের কাছে দেখেছ।'

'ঘটনাটা কি, খুলে বলবে?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রক।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল রোজার। 'খবর শোননি? আজ সকালে ব্যাংকে ডাকাতি হয়েছে।'

'ডাকাতি? কই, শুনিনি তো। কি করে ঘটল? এই ছেলেগুলো কে? কিছুই বুঝতে পারছি না।'

দ্রুত, সংক্ষেপে সব জানাল রোজার। শেষে বলল, 'আর আমি গাধাই ব্যাটাদের ঢুকতে দিয়েছি। পুলিশের সন্দেহ, আমিও জড়িত। করবেই, আমি যেমন গর্দভ। ভাল করে তাকালাম না কেন লোকটার মুখের দিকে? তাহলেই তো চিনতে

পারতাম।'

'উকিলের কাছে যাও,' রক বলল। 'ব্যবস্থা একটা করে দেবে। তুমি অপরাধী না হলে জোর করে তো পুলিস কিছু করতে পারবে না। কিন্তু এই ছেলেগুলো কেন এসেছে? জানালা দিয়ে উঁকি মারছিল কেন?'

গম্ভীর হয়ে গেল রোজার। 'নিশ্চয় ওরাও সন্দেহ করছে।' কিশোরের দিকে কাত হল সে। 'প্রথমে ভাবলাম, মিস্টার সাইমন সাহায্য করতে পারবেন। গত হপ্তায় টিভিতে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন তিনি। একটা মূল্যবান কথা বলেছিলেন তখন। বলেছিলেন, মাঝে মাঝে নিরপরাধ লোক অহেতুক বিপদে পড়ে, কারণ, ভুল সময়ে ভুল জায়গায় হাজির থাকে তারা। সোজা কথা কপাল খারাপ। আমার বেলায়ও তাই হয়েছে। মিস্টার সাইমনের কথা মনে পড়ল। ব্যাংকের একজন সেক্রেটারিও তাঁর কাছে যাবার পরামর্শ দিয়েছে আমাকে। ডাউনটাউন ক্রেডিট রিপোর্টিং সার্ভিস থেকে ঠিকানা জোগাড় করে দিয়েছে। টেলিফোন ডিরেক্টরিতে নাম নেই তার। আমার বিশ্বাস, অনেক বিখ্যাত লোকেরই থাকে না। দেখা করতে গেলাম...।'

'একেবারে বক্তৃতা শুরু করেছ,' বাধা দিয়ে বলল রক। 'মিস্টার সাইমন কে, সেটাই তো জানি না।'

কেশে গলা পরিষ্কার করল কিশোর। 'তিনি একজন লেখক। শখের গোয়েন্দা। আজ সকালে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তাঁর একটা মানিব্যাগ ব্যাংকের বাইরে রাস্তায় এক লোক ফেলে যায়, সেটা কুড়িয়ে পায় রবিন মিলফোর্ড,' রবিনকে দেখাল সে।

'ডাকাতটাকে দরজা খটখট করতে দেখেছি আমি, মিস্টার রোজার,' রবিন বলল। 'তালা খুলে আপনি তাকে ঢুকতে দিয়েছেন।'

'আজ সকালে মিস্টার সাইমনের বাড়ি থেকে ফেরার পথে,' মুসা বলল। 'আপনাকে যেতে দেখেছি। সন্দেহ হয়েছে। ভেবেছি, সাইমনের সঙ্গে আপনার কোন যোগাযোগ আছে। ডাকাতির সঙ্গে...।' থেমে গেল সে। 'সরি, খোলাখুলি বলে ফেললাম।'

'আমি শুধু তাঁর সাহায্য চাইতে গিয়েছিলাম,' রোজার বলল। 'কিন্তু তাঁর এখন সময় নেই। নতুন একটা বই লেখায় হাত দিয়েছেন। লস অ্যাঞ্জেলেসের কয়েকজন প্রাইভেট ডিটেকটিভের নাম-ঠিকানা দিয়েছেন। পরামর্শ দিয়েছেন, গোয়েন্দার চেয়ে এখন উকিলের সঙ্গে দেখা করা আমার জন্যে জরুরি। বিকেলে কয়েকজনকে ফোন করেছি। ফিস্ জান? পিলে চমকে গেছে আমার। গোয়েন্দার ফিস্ আরও বেশি। কোনটার খরচ জোগানোরই সাধ্য আমার নেই।'

চেয়ারে সোজা হয়ে বসল কিশোর। 'মিস্টার রোজার, আগে আপনার ওপর সন্দেহ ছিল আমার। এখন নেই। আপনাকে সাহায্য করতে পারব। আমরা গোয়েন্দা।'

পকেট থেকে কার্ড বের করে দিল সে।

'তোমরা ছেলেমানুষ···।'

বাধা দিয়ে বলল কিশোর, 'বয়েস কম হতে পারে, কিন্তু সত্যিই আমরা গোয়েন্দা। পুলিশ পারেনি, এমন অনেক জটিল রহস্যের সমাধান আমরা করেছি। বিশ্বাস না হলে পুলিশ চীফ ইয়ান ফ্লেচারকে ফোন করুন। মিস্টার রোজার, আমি বুঝতে পারছি আপনি ডাকাতিতে জড়িত নন।'

রবিন আর মুসাও একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল।

'মিস্টার রোজার,' আবার বলল কিশোর। 'আপনি ইচ্ছে করলে আমাদের সাহায্য নিতে পারেন।'

দ্বিধায় পড়ে গেছে সিকিউরিটি ম্যান। 'কিন্তু তোমাদের বয়েস এত কম!'

'এটা কি কোন বাধা?'

অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসল রোজার, আঙুল মটকাল। 'কি জানি। সত্যিকার গোয়েন্দা সংস্থাকেই ভাড়া করা উচিত···কিন্তু···কিন্তু···।'

'তাতে কত খরচ লাগবে ভেবে দেখেছ?' রক বলল।

টেবিলের কাছে একটা চেয়ারে বসেছে সে, রোজারের চেয়ে বয়েস কম। জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে। ভ্রূকুটি করল। আঙুল চালিয়ে ব্যাকব্রাশ করল সোজা সুন্দর চুল। সানগ্লাস খুলে নিয়ে রাখল জ্যাকেটের পকেটে। তারপর বলল, 'এত ভাবছ কেন বুঝতে পারছি না। তোমাকে অপরাধী বলতে হলে, আগে প্রমাণ জোগাড় করতে হবে পুলিশকে।'

'আমিই তো আমাকে অপরাধী মনে করছি। নিজের হাতে চাবি দিয়ে তালা খুলে ডাকাত ঢুকতে দিয়েছি।'

'এ-জন্যে তোমাকে জেলে পাঠাতে পারবে না পুলিশ। আর এতই যদি ভাবনা, এই ছেলেগুলোকেই ভাড়া কর। কেন যেন মনে হচ্ছে আমার, ওরা তোমাকে সাহায্য করতে পারবে। কি করে করবে, জানি না।'

'সাধ্যমত চেষ্টা করব আমরা,' কথা দিয়ে ফেলল মুসা।

'যেচে পড়ে আমার উপকার করতে চাইছ তোমরা,' রোজার বলল। 'আজকাল ক'জন করে এরকম? বেশ···করলাম ভাড়া। নেব তোমাদের সাহায্য। তবে বেশি পয়সা দিতে পারব না, আগেই বলে দিচ্ছি।'

'শখে গোয়েন্দাগিরি করি আমরা, মিস্টার রোজার,' রবিন বলল। 'পয়সা নিই না।'

পাঁচ

'খুব খারাপ অবস্থা আমার!' রোজার বলল। প্লাস্টিকের টেবিলক্লথের ডিজাইনে আঙুল বোলাচ্ছে। উদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে তাকাল তিন গোয়েন্দার দিকে। 'এই ডাকাতি কেসের মীমাংসা যতদিন না হবে, আমাকে কাজে যেতে মানা করে দিয়েছে ওরা। মুখ ফুটে ডাকাত বলে না, তবু বুঝতে তো পারি। আচ্ছা, তোমরাই বল, আমাকে কি ডাকাত মনে হয়? আমার ঘর দেখে মনে হয় এটা ডাকাতের আড্ডা?'

ডাকাত কি না বোঝার জন্যেই যেন রোজারের দিকে তাকাল ছেলেরা, রান্নাঘরে চোখ বোলাল আরেকবার। হাসল কিশোর। না, লোকটাকে ডাকাত কিংবা ডাকাতের সহযোগী ভাবতে পারছে না সে। আর ঘরটাকেও ডাকাতের ঘর বলে মনে হচ্ছে না।

'হায়, হায়!' চেঁচিয়ে উঠল রক, 'আমার মাল! মুদী···।'

তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল সে। দড়াম করে বন্ধ হল পেছনের দরজার পাল্লা।

'গোড়া থেকেই শুরু হোক, কি বলেন, মিস্টার রোজার?' কিশোর বলল। 'সব খুলে বলুন আমাদের। নুতন কিছু হয়ত বেরিয়েও যেতে পারে। এমন কিছু, যা আগে আপনার মনে দাগ কাটেনি।'

নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রোজার। 'মিস্টার সাইমন বলেছেন, কোন অ্যালিবাই না থাকলে, দোষী প্রমাণ করা যত সহজ, নির্দোষ প্রমাণ করা তারচে অনেক কঠিন।'

'আপনার কি সত্যিই কোন অ্যালিবাই নেই? ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখুন। আপনি ডাকাতদের একজন হলে, গত কয়েক দিনে আপনার বেশ কিছুটা সময় আলাপ-আলোচনা আর পরিকল্পনায় ব্যয় হওয়ার কথা। অন্য ডাকাতদের সঙ্গে চেনা-পরিচয় করতেও সময় লাগে। গত দুই হপ্তা আপনি কি কি করেছেন, মনে আছে? বলতে পারবেন ঠিকমত?'

বিষণ্ন হয়ে মাথা নাড়ল রোজার।

'আপনার বন্ধু রকের কথা বলুন। এখানেই থাকেন? তিনি কি বলতে পারবেন, গত কিছুদিন আপনি কোথায় কোথায় গিয়েছেন, কি কি করেছেন?'

আবার মাথা নাড়ল রোজার। 'এখানেই থাকে রক, তবে বাড়িতে বেশি সময় থাকে না। সিসটেম টি এক্স ফোর-এর ফিল্ড রিপ্রেজেনট্যাটিভ সে। ওটা একটা কম্পিউটার কোম্পানি। নানা অফিসে যায় সে, বোঝানোর চেষ্টা করে কম্পিউটার

দিয়ে কাজের কত সুবিধে। বিজ্ঞাপন করে আরকি। গত পুরোটা হপ্তা, এমনকি উইকএণ্ডেও বাইরে ছিল রক। ফ্রেজনোর একটা ফার্ম টি এক্স বিলিং সিসটেম কিনছে, তাদের সঙ্গেই কাজ করেছে ওই কদিন। ফিরেছে এই খানিক আগে। আজকাল বাড়িতে ফিরেও খুব একটা কথা বলে না আমার সাথে। তবে টি এক্স ফোর-এ যখন একসঙ্গে কাজ করতাম, অবস্থা অন্যরকম ছিল তখন।'

'আপনি টি এক্স ফোর-এ কাজ করতেন?'

'করতাম। আগে ওটার নাম ছিল রিং-বার অফিস মেশিন কোম্পানি, পরে হাত বদল হয়, নামও।' গর্বের আভাস দেখা গেল রোজারের চেহারায়, 'রিং-বারদের ওখানে তিরিশ বছরের বেশি চাকরি করেছি আমি। প্রথমে ছিলাম ওদের ডাক বিভাগে, তারপর চলে গেলাম ক্রয় বিভাগে। ধীরে ধীরে চাকরিতে উন্নতি হল। ডিপার্টমেন্টের বারোজনের মধ্যে আমি হলাম দ্বিতীয়, অর্থাৎ বিভাগীয় প্রধানের পরেই আমার স্থান। সে-সময় আমার ছেলেরা বড় হচ্ছে। বাসা ভাল, ছেলেরা আরামেই থাকত। বাসা বদলের দরকার হয়নি।'

উঠে লিভিং রুমে চলে গেল রোজার। ফিরে এল একটা বাঁধানো ফটোগ্রাফ নিয়ে। তাতে তার যুবক বয়েসের ছবি, ঘন কালো চুল। পাশে দাঁড়ানো গোলগাল চেহারার মোটামুটি সুন্দরী এক মহিলা। দু'জনের পাশে দাঁড়ানো দুটো বাচ্চা।

'আমার স্ত্রী, নীনা,' মহিলার ছবির ওপর আঙুল রেখে বলল রোজার। 'বিশ্বযুদ্ধের কিছুদিন পর বিয়ে করেছিলাম আমরা। হার্টফেল করে মারা গেছে বছর কয়েক আগে...।' গলা ধরে এল তার।

সমবেদনা জানাল কিশোর।

'বড় একা লাগে এখন,' রোজার বলল। 'বাচ্চারাও বড় হয়ে যার যার মত চলে গেছে। সানিডেল-এর এক ইলেকট্রোনিক কোম্পানিতে চাকরি করে ছেলেটা, প্রোডাকশন কো-অরডিনেটর। মেয়েটা বিয়ে করেছে। স্বামী কাজ করে বীমা কোম্পানিতে। বেকারসফিল্ডে থাকে, দুটো বাচ্চা।

'ভাল আছে দু'জনেই। কিন্তু আমার কাছ থেকে অনেক দূরে। আরও কাছাকছি থাকত যদি! ওরা চলে গেল, খালি হয়ে গেল বাড়িটা। একা একা খুব খারাপ লাগত। শেষে আরেকজনকে ভাড়া দেব ঠিক করলাম। কিছু পয়সাও আসবে, সঙ্গীও পাব। রককে বললাম। বলতেই রাজি হয়ে গেল সে। উঠে এল এখানে...।'

দরজা খুলে গেল। একটা থলেতে কতগুলো প্যাকেট নিয়ে ঢুকল রক। থলে থেকে খুলে প্যাকেটগুলো গুছিয়ে রাখতে লাগল রেফ্রিজারেটরে।

'কাল রাতে কি কি ঘটেছে, খুলে বলবেন?' অনুরোধ করল কিশোর।

'বেশ, যদি তাতে কোন কাজ হয়, বলছি। অস্বাভাবিক কিছু মনে হয়নি

প্রথমে। প্রায় বছরখানেক ধরে চাকরি করছি ব্যাংকে। দুপুরে যাই, দু'চারটা টুকিটাকি কাজ সারি, তেমন ইমপরট্যান্ট কিছু নয়। কাজটা নিয়েছিই আসলে সময় কাটে না বলে...টি এক্স ফোর থেকে রিটায়ার করার পর। নইলে কম্পিউটার কোম্পানির একজন অফিসার ব্যাংকের দারোয়ান হয়?'

'যা-ই হোক, অফিস ছুটি হওয়ার পর ঝাড়ুদার আসে, আমি দেখাশোনা করি। বেশিক্ষণ লাগে না ওদের। ছ'টার মধ্যে সেরে ফেলে। ওরা বেরিয়ে গেলে তালা লাগাই, আরেকবার চেক করে দেখি সব ঠিক আছে কিনা। তারপর বাড়ি যাই। নাইট গার্ড নেই ওই ব্যাংকে। ভল্টে টাইম লক লাগানো, কাজেই গার্ডের দরকার পড়ে না। জোর করে কেউ খুলতে গেলেই পুলিশ স্টেশনে অ্যালার্ম বেজে উঠবে।'

'সে-জন্যেই আপনাকে আটক করেছিল ডাকাতেরা,' রবিন বলল। 'নইলে টাইম লকের জন্যে কিছু করতে পারত না ওরা। ভেতরে ঢুকলেই, ঘন্টা।'

'হ্যাঁ। তিনজন এসেছিল, টাইম লক সিসটেমের কথা ভাল করেই জানত। নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে থেকে চোখ রাখছিল। ঝাড়ুদারেরা কাজ শেষ করে বেরিয়ে গিয়ে এলিভেটরে উঠল। তারপর এল এক ডাকাত। দরজা ধাক্কা দিল। লবিতে তখন আলো খুব সামান্য। দেখলাম ওভারঅল পরা একজন দাঁড়িয়ে আছে, টুপির নিচে ধূসর চুল। টুপিটা চোখের ওপর টানা। ভাবলাম জ্যাকই বুঝি ফিরে এসেছে। কোন দরকারে। দরজা খুললাম। ও ভেতরে ঢোকার পর চিনলাম, জ্যাক নয়। হাতে পিস্তল। আর কিছু করার নেই তখন আমার।

'ওর পর পরই ঢুকল আরও দুজন। মাথায় পরচুলা, নকল দাড়ি, নকল গোঁফ। বোর্ড রুমে ঢুকতে বাধ্য করল আমাকে। রাস্তা থেকে ঘরটা দেখা যায় না। আমাকে সারারাত আটকে রাখল। ভল্টের ধারেকাছেও ঘেষল না। সকালে স্টাফরা আসতে লাগল। একজন করে ঢোকে, আর ধরে এনে তাকে বোর্ডরুমে আটকায়। তারপর এলেন মার্ক জনসন, ভল্টের লক কম্বিনেশন তিনি জানেন। বোঝা গেল, ডাকাতেরা তাঁকে চেনে। টাইম লক অফ করিয়ে ভল্ট খুলতে তাঁকে বাধ্য করল ওরা।'

মুসার পাশের চেয়ারে এসে বসল রক রেনাল্ড। 'নিশ্চয় তোমার ওপর চোখ রেখেছে কেউ। ব্যাংকের কাছাকাছিই থাকে সে, বা থাকত। কিংবা তোমার পরিচিত কেউ।'

'পরিচিত কেউ হলে চিনতাম,' রোজার বলল। 'তিনজনের একজনকেও চিনি না। দেখিইনি কখনও।'

উঠে গিয়ে চুলায় কেটলি বসাল রক। 'আমাদের পড়শীদের কেউও হতে পারে। নিশ্চয় ছদ্মবেশে গিয়েছিল। পড়শীদের ওপর চোখ রাখতে বল

ছেলেগুলোকে।'

'রাখাটা কি জরুরি?'

সামনে ঝুঁকল কিশোর। 'পড়শী কিংবা বন্ধু-বান্ধবকে সন্দেহ করা কঠিন। কিন্তু মিস্টার রোজার, বোঝা যাচ্ছে, ডাকাতেরা আপনাকে চেনে, ব্যাংকে আপনার কখন কি কাজ ভালমত জানে। গত ক'দিন ধরে কেউ নজর রেখেছে আপনার ওপর, টের পেয়েছেন? আপনার কাজকর্ম সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন কেউ?'

'না,' একেবারে মুষড়ে পড়েছে রোজার।

কেটলিতে কফি ফুটছে। একটা কাপে ইনসট্যান্ট কফি রেখে তাতে গরম পানি ঢালল রক। টেবিলের কাছে বসে চুমুক দিল কাপে। কিশোরের দিক থেকে রোজারের দিকে ফিরল, আবার তাকাল কিশোরের দিকে।

'আপনাকে নির্দোষ প্রমাণ করতে হলে আসল অপরাধীকে খুঁজে বের করতে হবে আগে,' কিশোর বলল। 'সে-জন্যে সূত্র দরকার।'

'সূত্র? সূত্র কোথায় পাবে?'

'জানি না। তবে আশা করছি, পাওয়া যাবে। এখন এ-ব্যাপারে আলোচনা করছি না আপনার সঙ্গে। তদন্ত চালিয়ে যাব আমরা। দু'এক দিনের মধ্যেই খবর জানাব আপনাকে। ইতিমধ্যে, অস্বাভাবিক কোন কিছু আপনার চোখে পড়লে জানাবেন। আমাদের কার্ডের পেছনে টেলিফোন নাম্বার আছে।'

'জানাব।'

বেরিয়ে এল ছেলেরা। পেছনে দরজা বন্ধ হয়ে গেলে রবিন বলল, 'সূত্র ? ওই মানিব্যাগের কথা ভাবছ?'

'খুবই সামান্য, তবু সূত্র তো বটে,' জবাব দিল কিশোর। 'আপাতত ওটা ধরেই তদন্ত চালাতে হবে আমাদের। আর একটা ব্যাপারে শিওর হয়ে গেলাম, রোজার কিংবা মিস্টার সাইমন অপরাধী নন। তবে, অন্ধ লোকটা ডাকাতদের কেউ না হলে, মানিব্যাগ ধরে তদন্ত করে লাভ হবে না আমাদের।'

'হোক বা না হোক,' হাত নাড়ল মুসা। 'কথায় কথায় পিস্তল বের করে, এমন লোকের সামনে না পড়লেই আমি খুশি।'

ছয়

পরদিন সকাল ন'টায় রকি বীচ ছাড়ল রবিন মিলফোর্ড। কোস্ট হাইওয়ে ধরে সাইকেল চালাল দক্ষিণে, সান্তা মনিকায় যাবে। থ্রিফট অ্যাণ্ড সেভিংস কোম্পানির আশেপাশের স্টোরগুলোতে খোঁজখবর নেবে অন্ধ লোকটার, আর এসেছে কিনা

জিজ্ঞেস করবে। তারপর আবার রকি বীচে ফিরে যাবে লাইব্রেরিতে, যেখানে পার্ট-টাইম চাকরি করে।

রবিনকে চলে যেতে দেখল কিশোর আর মুসা। তারপর ওরা রওনা হল উত্তরে। সাড়ে ন'টা নাগাদ ম্যালিবু ছাড়ল। শহরের পর থেকে উঠে গেছে পাহাড়ী পথ, পাহাড়ের পিঠের ওপাশ থেকে আবার ঢালু হয়ে নেমেছে। নিকারো অ্যাণ্ড কোম্পানিটা ওখানেই।

জেটির কাছে এসে থামল ওরা। হাইওয়ে ধরে যাবার সময় হাজারবার দেখেছে এই জায়গা ওরা। এর আগে কখনোই নজর দেয়নি তেমন। কিছু ক্যাম্প দেখা যাচ্ছে একধারে। পথের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকটা ভ্যান। জেটির দক্ষিণে সৈকতের এক প্রান্তে মাছ ধরছে কিছু লোক, তাদের মাঝে মহিলাও আছে কয়েকজন। এই ঠাণ্ডার মাঝেও ওয়েটসুট পরে ঢেউয়ের ওপরে সার্ফিং করছে কিছু লোক।

'চমৎকার ঢেউ আজ,' মুসা বলল। সে নিজে খুব ভাল সার্ফার, লোকগুলোকে দেখে সার্ফবোর্ড নিয়ে তারও সাগরে নামতে ইচ্ছে করছে।

কিন্তু ওসবে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই কিশোরের। সে তাকিয়ে আছে জেটিতে বাঁধা একটা ফিশিং বোটের দিকে। ছোট্ট নাম বোটটার, 'টিনা'। পনেরো মিটার লম্বা। পাইলটের জন্যে হুইল-হাউস আছে, যারা মাছ ধরবে তাদের জন্যে খোলা ডেক। ডেকের হ্যাচ খোলা। নীল উইণ্ডব্রেকার পরা এক তরুণ ঝুঁকে ইঞ্জিনে কি যেন করছে।

বোটটার উল্টোদিকে, জেটির উত্তরে একটা ভেলা বাঁধা রয়েছে, গ্যাংওয়ে দিয়ে তাতে নামার ব্যবস্থা। ভেলার সঙ্গে বাঁধা একটা দাঁড়টানা নৌকা। জেটি থেকে দূরে গভীর পানিতে ভাসছে বয়ায় বাঁধা সাদা একটা সুন্দর মোটরবোট। ককপিট ঢেকে রাখা হয়েছে তেরপল দিয়ে।

'নিশ্চয় ওটাই মিস্টার সাইমনের বোট,' কিশোর বলল।

'হুঁম্,' সার্ফারদের ওপর থেকে চোখ সরাচ্ছে না মুসা।

'তুমি থাক এখানে। সাইকেল দেখ।'

'হুঁম্।'

হাসল কিশোর। রাস্তা পেরোল।

রাস্তা থেকে একটা ড্রাইভওয়ে সোজা নেমে গেছে জেটিতে। বাঁয়ে একটা ছোট পার্কিং লট, শূন্য, একটা গাড়িও নেই। ডানে আরেকটা ড্রাইভওয়ে চলে গেছে একটা বাড়ি পর্যন্ত। টালির মত করে লাগানো কাঠের ছাত বাড়িটার, ধূসর রঙ বিবর্ণ হয়ে এসেছে। কাঠের দেয়াল সাদা রঙের। কারপোর্টে দাঁড়িয়ে আছে

একটা স্টেশন ওয়াগন।

বাড়ি আর জেটির মাঝামাঝি ছোট একটা কেবিন। তিন দিকে বড় বড় জানালা, আর একদিকে দরজা, ডকের দিকে ফেরানো। ওটা অফিস। জানালা দিয়ে কিশোর দেখল, ভেতরে বসা ধূসর-চুল কালো পোশাক পরা এক মহিলা হিসেবের খাতা দেখছে। কাছেই বসা এক তরুণী, কোঁকড়া লাল চুল, টেলিফোনে কথা বলছে।

অফিসের কাছে এসে কাচের এপাশ থেকে তরুণীর দিকে চেয়ে হাসল কিশোর, তারপর দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল।

অফিসে নোনা পানি, রবারের বুট, সাগরের শ্যাওলা আর ছত্রাকের মিশ্র গন্ধ। একধারে দেয়াল ঘেঁষে রাখা একটা কাঠের বেঞ্চ। ওটার সামনে টেবিলে রাখা মাছ-ধরার ওপর লেখা ছোট ছোট পুস্তিকা। চ্যানেল আইল্যাণ্ডস, আর উপকূলের কাছাকাছি কোথায় কোথায় ভাল বেড়ানোর জায়গা আছে, মাছ ধরা যাবে, তারও উল্লেখ রয়েছে ওগুলোতে।

হাত দিয়ে মাউথপিস ঢেকে কিশোরকে বলল তরুণী, 'এক মিনিট।'

'আমার তাড়াহুড়ো নেই,' কিশোর জানাল।

মুখ তুলে তাকাল বয়স্ক মহিলা। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। কেন যেন ভয় লাগে ওই চোখের দিকে তাকালে। কালো চোখের তারা স্থির, কিশোরের মনে হল তার মনের কথা সব পড়ে ফেলছে মহিলা। আনমনা হাসি। একবার তাকিয়েই আবার খাতায় চোখ ফেরাল সে।

অস্বস্তি বোধ করছে কিশোর। ফিরে চাইল ডকের দিকে। টিনার ইঞ্জিন পরীক্ষা শেষ করেছে উণ্ডব্রেকার পরা তরুণ। হ্যাচ লাগিয়ে ডেকের কিনারে এসে লাফ দিয়ে নামল জেটিতে। শিস দিতে দিতে এগিয়ে এল অফিসের দিকে।

'ও-কে,' কথা বলছে লাল-চুল তরুণী। 'তাহলে শনিবার দিন। তেতাল্লিশ। আরও বেশি হলে জানাবেন, ঠিক আছে?'

রিসিভার রেখে এগিয়ে আসা তরুণকে দেখল এক মুহূর্ত। তারপর ফিরল কিশোরের দিকে। 'কি সাহায্য করতে পারি?'

'একটা মানিব্যাগ পেয়েছেন?' কোন রকম ভূমিকা করল না কিশোর। 'কেউ দিয়ে গেছে আপনাদের কাছে? মিস্টার সাইমন তাঁর মানিব্যাগ হারিয়েছেন, দু'এক দিন আগে।'

'মিস্টার সাইমন? এসেছিলেন নাকি? কই, দেখিনি তো।' উইণ্ডব্রেকার পরা লোকটাকে ঘরে ঢুকতে দেখে জিজ্ঞেস করল মেয়েটা, 'বিল, মিস্টার সাইমনকে নিয়ে গিয়েছিলে? নৌকাটায় খুঁজে দেখ তো আছে কিনা।'

'নেই,' জবাব দিল তরুণ। 'দু'দিন আগে এসেছিলেন। বোটে তুলে দিয়ে এসেছিলাম, তারপর আবার ডকে ফিরিয়ে এনেছি। নৌকায় মানিব্যাগ পড়লে অবশ্যই দেখতাম।'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল সে, 'মিস্টার সাইমন এলেন না কেন? টেলিফোনও তো করতে পারতেন?'

'উনি ব্যস্ত। গত দু'দিনে আরও দু'জায়গায় গিয়েছেন। কোথায় ফেলেছেন মনে করতে পারছেন না। তাঁকে বলেছি, আমি খুঁজে দেখব। ফোন করেননি তার কারণ, ফোন করলে পাত্তা দেয় না লোকে। দায়সারা গোছের একটা জবাব দিয়ে রেখে দেয়।'

অন্ধ এক ভিখিরিকে দেখেছেন মিস্টার সাইমন, সবে বানিয়ে বলতে যাচ্ছিল কিশোর, বলে উঠল বয়স্ক মহিলা, 'মানিব্যাগের কথা জিজ্ঞেস করছ? আশ্চর্য! কাল রাতে মানিব্যাগ স্বপ্নে দেখেছি আমি।'

তরুণী হাসল। 'আমার শাশুড়ি খুব আজব মানুষ। তার স্বপ্ন প্রায়ই ফলে যায়। ভয়ঙ্কর মহিলা।'

'স্বপ্ন দেখলেই ভয়ঙ্কর হয়ে যায় নাকি মানুষ?' মহিলার কথায় বিদেশী টান, রেগে যাওয়ায় জোরাল হল। 'তোমাদেরকে কতবার বলেছি, স্বপ্ন দেখলে ভয় পাই আমি। কাল রাতে দেখলাম, আজব একটা লোক এল। মাটি থেকে একটা মানিব্যাগ কুড়িয়ে নিয়ে চট করে পকেটে রেখে দিল।

'লোকটা অদ্ভুত। ধূসর চুল, মৃত্যুর আগে আমার কাসটে লিনির যেমন ছিল। তবে কাসটেলিনির মত ছোট আর বুড়ো নয় লোকটা। বয়েস আরও কম, চোখে কালো চশমা। মুখে কাটা দাগ, মনে হয় কেউ কেটে দিয়েছে ছুরি দিয়ে। হাতের লাঠি অন্ধের মত ঠকঠক করছিল। বুঝতে পারছিল আমি ওকে দেখছি। আমার জন্যে ও বিপজ্জনক, আমি জানি। সাংঘাতিক এক দুঃস্বপ্ন, অথচ কত বাস্তব।' তরুণীর দিকে তাকাল মহিলা। 'খুব ভাবনা হচ্ছে আমার, এলসি।'

বিচিত্র একটা শব্দ, কিশোরের মনে হল লোকটার গলা চেপে ধরা হয়েছে। ফিরে তাকাল সে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে বিল। মৃদু কাঁপছে।

'কি হল, বিল?' এলসি জিজ্ঞেস করল। 'ওরকম চেহারার কাউকে চেন নাকি?'

'না না, আমি চিনব কোত্থেকে?' কথাটা বেশ জোরেই বলে ফেলল বিল। 'মিসেস নিকারো এমন ভাবে বলে না, যেন একেবারে সত্যি সত্যি দেখেছে।'

'তোমার কথা বুঝতে পারছি।'

এক মুহূর্ত কেউ কিছু বলল না। তারপর দুই মহিলাকেই ধন্যবাদ জানিয়ে

অফিস থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। রাস্তা পেরিয়ে দ্রুত চলে এল মুসার কাছে। তখনও স্বপ্নিল চোখে সার্ফারদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে গোয়েন্দা সহকারী।

'মনে হয় আসল জায়গায় ঢিল মেরেছি!' কিশোর জানাল। 'অফিসের বৃদ্ধা মহিলা মিসেস নিকারো। আর তরুণী তার ছেলের বৌ। সে বলল, তার শাশুড়ির স্বপ্ন নাকি সব ফলে যায়।'

'তারমানে বলতে চাইছ, ঘটনা ঘটার আগেই সেটা স্বপ্নে দেখে মহিলা?'

'হয়ত। যা ঘটে গেছে, সেটাও বোধহয় দেখে। এবার দেখেছে, একটা মানিব্যাগ কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে রাখছে এক লোক, অন্ধ, হাতে লাঠি। গালে কাটা দাগ। লোকটা নাকি মহিলার জন্যে বিপজ্জনক।'

'যাহ্, বানিয়ে বলছ!'

'মোটেও না। মহিলা যা বলল, তা-ই বললাম। ভয় পাচ্ছে। ভয় ওই লোকটাও পেয়েছে, উইণ্ডব্রেকার পরা, খানিক আগে ইঞ্জিনে কাজ করছিল যে। মহিলার স্বপ্নের কথা শুনেই আঁতকে উঠেছে। নিশ্চয় অন্ধ লোকটার কথা কিছু জানে সে। এবং সেটা প্রকাশ করতে চায় না। আমাদের এই রহস্যের সঙ্গে সম্পর্ক আছে তার।'

সাত

মুসা নিজেই প্রস্তাব দিল, জেটির কাছে থেকে বিলের ওপর নজর রাখবে। বলল, 'যদি কিছু করে, দেখতে পারব। তোমাকে চিনে ফেলেছে সে। আমাকে চেনে না, কাজেই কাছাকাছি থাকা সহজ হবে। খেয়ালই করবে না।'

'খুব সাবধান,' সতর্ক করল কিশোর।

'থাকব।'

সাইকেল নিয়ে রওনা হয়ে গেল কিশোর। রাস্তা পেরিয়ে সৈকতের দিকে চলল মুসা। তাপর সাইকেল ঘুরিয়ে চলে এল একটা খিলানের নিচে, পানির কিনারে। খিলানের সঙ্গে শেকল পেঁচিয়ে তালা দিয়ে রাখল সাইকেল। ভাবসাব এমন, যেন নিকারোদের ব্যাপারে কোন আগ্রহই নেই। যে-ই দেখুক, ভাববে, সাইকেল রাখার নিরাপদ জায়গা খুঁজছে।

সৈকত ধরে কিছুদূর এগোল সে, কয়েকজন মাছশিকারির পাশ কাটাল। তারপর একটা শুকনো জায়গা বেছে বসে পড়ল বালিতে। চোখ রাখল টিনার ওপর। আবার বোটে উঠেছে বিল। পেতল ঘষছে।

সুন্দর কাটছে সকালটা। খিলানের কাছে সৈকতে খেলতে এল একদল

ছেলেমেয়ে। ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলল মুসা। কথায় কথায় জানল, ওরা কাছাকাছিই থাকে। আরও জানল, হাইওয়ের ধারে ছোট একটা বাড়িতে বাস করে বিল। আরও দু'জন বন্ধু থাকে তার সাথে। বিদেশী ভাষায় কথা বলে। সহজেই এত তথ্য জানতে পেরে খুশি হল মুসা। ভাবল, কিশোরও এরচেয়ে বেশি কিছু করতে পারত না।

কাছের একটা ছোট বাজার থেকে স্যাণ্ডউইচ কিনে লাঞ্চ সারল মুসা। আবার ফিরে এসে বসল আগের জায়গায়। দুপুর গড়িয়ে বিকেল। পাঁচটা বাজল। পাঁচটার সামান্য পরে জেটি থেকে রাস্তায় গিয়ে উঠল বিল। পিছু নিল মুসা।

রাস্তার দিকে মুখ করে আছে ছোট কটেজটা। পুরানো। দেখে মনে হয় ধসে পড়বে যে-কোন সময়। বালিতে অসংখ্য খুঁটি গাড়া, তার ওপর রয়েছে বাড়িটার পেছনের ভার। ঢুকে গেল লোকটা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুসা ভাবতে লাগল, এবার কি করবে? কি করে জানবে বিলের সঙ্গে অন্ধ ভিক্ষুকের কি সম্পর্ক?

পুরানো একটা ট্রাক বিকট গর্জন তুলে ছুটে এল হাইওয়ে ধরে। কটেজের কাছে এসে থামল। নামল এক যুবক। হাত নেড়ে ড্রাইভারকে ধন্যবাদ জানিয়ে, রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে ঢুকল বাড়িতে। ট্রাক চলে গেল নিজের পথে।

কয়েক মিনিট পর এল তৃতীয় আরেকজন, সে-ও যুবক। পুরানো একটা বুইক চালিয়ে। বাড়ির পাশে ঘাসে ঢাকা একটুকরো সমতল জমিতে গাড়িটা পার্ক করে রেখে গিয়ে বাড়িতে ঢুকল সে, দড়াম করে বন্ধ করল সামনের দরজা।

সৈকতে মাছশিকারির সংখ্যা কমে এসেছে। পশ্চিমে ডুব দেয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে যেন সূর্য। মুসা ঠিক করল, আর দশ মিনিট, তারপর বাড়ি রওনা হবে।

কথাটা ভেবে সে শেষও করতে পারল না, খুলে গেল কটেজের দরজা। তিনজনেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাইওয়ে ধরে এগোল। পিছু নিল মুসা। নিকারোদের বাড়ি পেরোল তিন যুবক, উঠতে শুরু করল আঁকাবাঁকা একটা ড্রাইভওয়ে ধরে। চূড়ায় একটা বাড়ি, সাগরের দিকে মুখ। সাইনবোর্ড রয়েছেঃ প্যাসিফিক মোটেল।

প্রায় চূড়ার কাছে পৌছে গেছে তিনজন, এই সময় একটা গাড়ি এসে মোড় নিয়ে মোটেলের ড্রাইভওয়ে ধরে উঠতে শুরু করল। ওটার পর পরই এল আরেকটা গাড়ি, প্রথমটাকে অনুসরণ করল। তারপর এল আরেকটা, দাঁড়িয়ে গেল পথের ধারে। তৃতীয় গাড়ি থেকে একজন মহিলা আর একজন পুরুষ নেমে ড্রাইভওয়ে ধরে হেঁটে উঠতে লাগল। ঠিক তাদের পেছনেই এল মোটরসাইকেল আরোহী দুই তরুণ, ইঞ্জিনের প্রচণ্ড গর্জন তুলে উঠে চলল ড্রাইভওয়ে দিয়ে।

দেখছে আর ভাবছে মুসা, অবাক হওয়ার মত কিছু আছে কি? যখন এক ভ্যান বোঝাই তরুণ তরুণী এসে হাজির হল, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে, এবার কিছু একটা করা দরকার। ছোট একটা সেডান এসে রাস্তার পাশে থামতেই হাইওয়ে পেরোল সে। গাড়ি থেকে নামল মাঝবয়েসী এক দম্পতি। তাদের সঙ্গে দুটো ছেলে, তেরো থেকে পনেরোর মধ্যে ওদের বয়েস। দম্পতির পেছনে হেঁটে চলল ছেলেদুটো। ওদের কয়েক গজ পেছনে রইল মুসা।

পরিবারটার পিছু পিছু চূড়ায় উঠে এল সে। ঘুরে এগোল মোটেলের পেছনে পার্কিং লট আর সুইমিং পুলের ধার দিয়ে। পেছন দিকের সব দরজা খোলা। ওদের মাথার ওপরে বাড়ির ছাঁইচে ইতিমধ্যেই হেসে উঠেছে উজ্জ্বল আলো। পুলের চারপাশে আর পার্কিং লটের কালো রঙ করা চত্বরের কিছুটা জুড়ে সাজানো হয়েছে ফোল্ডিং চেয়ার। পুল থেকে দূরে একটা খোলা জায়গায় রয়েছে বিল আর তার দুই বন্ধু, তাদের সামনে মস্ত ইজেলে বিশাল তিনটে ফটোগ্রাফি। সাদা-কালো একটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে সাদা-চুল একজন মানুষ, পরনে নানারকম কাজ করা ইউনিফর্ম। আরেকটা রঙিন ছবি, একটা শহরের ওপর পড়েছে সোনালি উজ্জ্বল রোদ। তৃতীয় ছবিটা দেখে চমকে গেল মুসা। এটাও একজন লোকের, ধূসর চুল, গালে কাটা দাগ, চোখে কালো চশমা। রবিনের অন্ধ ভিখারির প্রতিকৃতি।

অস্বস্তি লাগছে মুসার। এখানে তার কোন অধিকার নেই। পালিয়ে যাওয়ার জোর ইচ্ছেটা দমন করল কিশোরের কথা ভেবে, কিশোর অসন্তুষ্ট হবে। নিশ্চয় কোন ধরনের সভার আয়োজন হয়েছে এখানে, যাতে অন্ধ লোকটার কথা আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর এই সভায় টিকেটের প্রয়োজন নেই, যে খুশি আসতে পারে, মুসার অন্তত তা-ই মনে হল। তার দিকে তাকাচ্ছেও না কেউ। সন্দেহজনক কিছু না করলে তাকাবে বলেও বোধহয় না।

একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে। পাশে এসে বসল মোটাসোটা এক লোক। ওপরে ওঠার পরিশ্রমে বেজায় হাঁপাচ্ছে। তার দিকে চেয়ে খাতির-জমানো-হাসি হাসল মুসা।

আরও লোক আসছে। সব চেয়ার ভরে গেল। এরপরও যারা এল, মোটেলের সিঁড়িতে, সুইমিং পুলের ধারের দেয়ালে উঠে বসতে লাগল। মোটেলের ভেতরে কোন আলো নেই। ব্যাপার কি?—ভাবল মুসা। গরমের সময় ছাড়া এই মোটেল খোলে না নাকি?

অন্ধকার হয়ে আসছে, এই সময় একটা টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল বিল। ছবিগুলোর সামনে রাখা হয়েছে টেবিলটা। মোটেলের অফিসের পেছন থেকে মার্চ করে এগিয়ে এল তার এক বন্ধু, হাতে নীল মখমলের পতাকা, সোনালি বর্ডার,

মাঝে একগুচ্ছ সোনালি ওকপাতা।

গান শুরু করল এক মহিলা। যোগ দিল আরেক মহিলা। তাদের সঙ্গে গলা মেলাল এক লোক। তারপর একে একে সবাই। উঠে দাঁড়িয়ে গাইছে। মুসাও গাওয়ার ভান করছে। সুরটা তার অপরিচিত, কখনও শোনেনি। লড়াইয়ের গানের মত মনে হল তার। শেষ হল গান। গুঞ্জন শুরু হল। কেশে উঠল মুসা। চেয়ারে বসার মচমচ। টেবিলের সামনে থেকে সরে এল বিল।

তার জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল এক স্প্যানিশ ভদ্রলোক, বৃদ্ধ। দেশী ভাষায় কথা শুরু করল। মনে মনে গুঙিয়ে উঠল মুসা। স্প্যানিশ বোঝে না সে।

মোলায়েম ভঙ্গিতে আরম্ভ করেছিল, ধীরে ধীরে গলার জোর বাড়ল বক্তার। মুঠো তুলে ঝাঁকাতে লাগল, যেন শাসাচ্ছে উপস্থিত জনতাকে। কিংবা এই মোটেলের সীমানার বাইরে কোন জনগোষ্ঠীকে।

বক্তৃতা শেষ হতেই তুমুল করতালি আর চিৎকার করে তাকে সমর্থন করল জনতা। তারপর বক্তৃতার জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল অল্পবয়েসী এক মহিলা, মাথায় লম্বা সোনালি চুল। জনতার দিকে মুখ করে চেঁচিয়ে কিছু বলল, মুসার মনে হল, শ্লোগান। আবার হাততালি, চিৎকার, শিস। মাটিতে পা ঠুকল কেউ কেউ।

মহিলা হাত তুলতেই চুপ হয়ে গেল জনতা। কথা শুরু করল সে। ভাষা না বুঝলেও মুসার অনুমান করতে কষ্ট হল না, জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা চলছে। ফ্লাডলাইটের আলোয় জ্বলছে যেন বক্তার চোখ। মাঝে মাঝেই হাত তুলে ইঙ্গিত করছে অন্ধ লোকটার ছবির দিকে, হুল্লোড় করে উঠছে জনতা।

বক্তৃতা শেষ হলে আবার কোলাহল। মহিলা সরল। আবার সে-জায়গায় এসে দাঁড়াল বিল। ধীরে ধীরে চুপ হয়ে গেল জনতা। তারপর, মুসাকে আতঙ্কিত করে দিয়ে লোক বাছাই করতে আরম্ভ করল সে, যাদেরকে বক্তৃতা দিতে হবে। যাদেরকে ইশারা করল, এক এক করে বক্তব্য রাখল তারা। প্রথম সারি থেকে বলল একজন লোক, তারপর মাঝখান থেকে এক মহিলা, শেষে সিঁড়িতে বসে থাকা এক কিশোর। স্প্যানিশ ছাড়া আর কিছু বলছে না। কি বলল তিনজনে, এক বর্ণ বুঝতে পারল না মুসা।

হঠাৎ মুসার দিকে হাত তুলল বিল। সব ক'টা চোখ ঘুরে গেল তার দিকে।

মাথা নাড়ল মুসা। কিন্তু তাকে ঠেলে তুলে দিল পাশে বসা মোটা ভদ্রলোক।

দুঃস্বপ্ন দেখছে যেন মুসা। ভাবনাও চলছে না আর, জমে গেছে যেন মগজ।

কিছু বলল বিল। হেসে উঠল জনতা। ওদের মুখের দিকে তাকাল সে। সবাই তাকিয়ে আছে তার দিকে, অপেক্ষা করছে।

দৌড়ে পালাতে ইচ্ছে করছে তার। দ্রুত তাকাল এদিক ওদিক। চেয়ারগুলোর

পাশ দিয়ে গিয়ে ড্রাইভওয়েতেও পৌছতে পারবে না, তার আগেই ধরা পড়ে যাবে। সে গুপ্তচর, এটা যদি বুঝে যায় ওরা...

মোলায়েম গলায় কিছু বলল পাশে বসা ভদ্রলোক। প্রশ্ন করল? নাকি হুমকি?

আচমকা গলা চেপে ধরল মুসা। হাঁ করে বিচিত্র একটা শব্দ করল। মাথা নাড়ল জোরে জোরে।

'ও!' বলল পাশে বসা লোকটা। 'ল্যারিনজাইটিস!'

মাথা ঝাঁকাল মুসা, জোর করে হাসল। আবার হেসে উঠল জনতা। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল সে, বসে পড়ল। তার পিঠ চাপড়ে সহানুভূতি জানাল ভদ্রলোক। অন্যদিকে চোখ ফেরাল জনতা। আরেকজন লোকের দিকে হাত তুলল বিল। সেই লোকটা উঠে কিছু বলল।

বক্তৃতার পালা শেষ। একটা ঝুড়ি নিয়ে এগোল বিল আর তার এক বন্ধু, দু'জনে দু'দিকে ধরেছে। এগোল সারির ভেতর দিয়ে। থামছে প্রতিটি লোকের সামনে। উঠে দাঁড়িয়ে জ্বালাময়ী কণ্ঠে জনতাকে কি সব বলছে সেই অল্পবয়েসী মহিলা। বোধহয় মুক্ত হস্তে দান করার অনুরোধ জানাচ্ছে।

মুসার সামনে যখন এল ঝুড়িটা, অনেক টাকা জমে গেছে। সে-ও ফেলল একটা ডলার। ড্রাইভওয়ে থেকে চেঁচিয়ে কি যেন বলল একজন। চোখের পলকে কোথাও উধাও হয়ে গেল ঝুড়ি।

দেখতে দেখতে জনতার সামনে দুটো গিটার আর একটা অ্যাকর্ডিয়ন নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল বিল আর তার দুই বন্ধু। গিটারে টোকা দিল বিল। বেজে উঠল অ্যাকর্ডিয়ন। মিষ্টি সুরে গান ধরল অল্পবয়েসী মহিলা।

তার সঙ্গে গলা মেলাল অনেকে। আঞ্চলিক গান, সুরে বোঝা যায়।

মোটর সাইকেলের ইঞ্জিনের শব্দ কানে এল। ফিরে চেয়ে মুসা দেখল, উঠে এসেছে একজন পুলিশ, হাইওয়ে পেট্রলম্যান।

হাত নাড়ল গায়িকা। থেমে গেল সঙ্গীত।

মোটর সাইকেল স্ট্যাণ্ডে তুলে চেয়ারগুলোর পাশ দিয়ে ঘুরে গিয়ে টেবিলের কাছে দাঁড়াল পুলিশ অফিসার। হাত তুলে বলল, 'সরি, বাধা দিলাম। কিছু মনে করবেন না। আপনাদের লীডার কে?'

'আমি,' বিল বলল। 'কি ব্যাপার, অফিসার? রিহারসালের অনুমতি নিয়েই এসেছি মিস্টার বারকেনস্টিনের কাছ থেকে।'

'বারকেনস্টিন?' অফিসের দিকে তাকাল অফিসার। 'মোটেলের মালিক?'

'হ্যাঁ। কম্যুনিটি রুম ভাড়া নিয়েছি। রসিদ দেখতে চান?'

'না, বিশ্বাস করছি। কিন্তু ওটা তো কম্যুনিটি রুম নয়। তাছাড়া বারকেনস্টিন

বলেনি জায়গাটা নিরাপদ নয়? মোটেল বন্ধ কেন, জানেন? এর নিচের মাটি আলগা, অতিবৃষ্টিতে এরকম হয়েছে। যে কোন সময় ধস নামতে পারে। আসলে কি করছেন এখানে, বলুন তো? এত লোক কেন?'

নিষ্পাপ হাসি ফুটল বিলের ঠোঁটে। 'একটা গানের দল গঠন করেছি আমরা, কান্ট্রি সং ফেডারেশন। রিহারসাল দিচ্ছি, কলিসিয়ামে সাতাশতম কান্ট্রি মিউজিক জাম্বোরিতে প্রতিযোগিতা করব।'

জনতার ওপর চোখ বোলাল অফিসার। 'এত লোক? সবাই…সবাই যাবেন প্রতিযোগিতা করতে?'

'অ্যামেচারদেরই প্রতিযোগিতা হয় ওখানে,' ধৈর্যের সঙ্গে জবাব দিল বিল। 'লোক কম-বেশির প্রশ্ন নেই। আপনি বলছেন ধস নামবে, মিস্টার বারকেনস্টিন তো তা বললেন না। তিনি বলেছেন ঠিকই আছে। তাছাড় এখন আর রিহারসাল ক্যান্সেল করা যাবে না। দূর থেকে এসেছে ওরা, এমন কি ল্যাগুনা থেকেও এসেছে অনেকে। খোলা জায়গায়ই তো প্র্যাকটিস করছি। মোটেল যদি বসেও যায়, আমাদের কিছু হবে না।'

'সেটা আপনি বলছেন। আপনার কথায় তো আর হবে না,' গলা চড়াল অফিসার। জনতার দিকে ফিরল, 'সরি, আপনাদের চলে যেতে হবে এখান থেকে। যত তাড়াতাড়ি পারেন। সাংঘাতিক বিপদ হতে পারে। তাড়াহুড়ো করবেন না। আস্তে আস্তে শৃঙ্খলা বজায় রেখে নেমে যান। যান, উঠুন। না না, চেয়ার গোটানোর দরকার নেই। যেমন আছে থাক।'

অফিসারের কথা মানল জনতা। উচ্ছৃঙ্খল হল না। শান্ত হয়ে সারি দিয়ে নেমে যেতে শুরু করল। ড্রাইভওয়ে দিয়ে নামার সময় মুসার কানে এল, বিল বলছে, 'এত তাড়াহুড়ো করছেন কেন? যাচ্ছি তো। গিটারটা তো নিতে দেবেন?'

আট

'কি যে করছে ওরা আল্লাই জানে,' মুসা বলল। 'তবে বাজি রেখে বলতে পারি, ফোক সং-টং সব বাজে কথা।'

পরদিন সকালে হেডকোয়ার্টারে মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে ও।

'বাজিতে হেরেও যেতে পার,' বলল কিশোর। সামনে ডেস্কের ওপর রাখা লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস-এর একটা সংখ্যা। 'সাতাশ তারিখে কলিসিয়ামে সত্যিই মিউজিক জাম্বোরি হচ্ছে।'

রবিন বসেছে টুলে। আগের দিন সান্তা মনিকায় গিয়ে অন্ধ লোকটা সম্পর্কে

কিছুই জানতে পারেনি সে। কোলের ওপর বিছানো একটা ওয়ার্ল্ড ম্যাপ, পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে মুসা আর কিশোরের আলোচনা শুনছে।

'এই শোন,' হঠাৎ মুখ তুলল রবিন। 'মুসা, তুমি কাল যে পতাকা দেখে এসেছ, ওটা মেকসিকান নয়। মেকসিকান পতাকা লাল, সাদা আর সবুজ। ওটা স্প্যানিশও নয়, এমনকি সেন্ট্রাল আমেরিকার কোন দেশেরও নয়।'

'হয়ত দেশের পতাকা নয় ওটা,' বলল কিশোর। 'কোন সংগঠনের ব্যানার হতে পারে।'

আবার ম্যাপের পাতায় মনোনিবেশ করল রবিন। খানিক পরে চেঁচিয়ে উঠল, 'মেসাডি'ওরো!'

'কী?' মুসা অবাক। 'কি বললে?'

'মেসা ডি'ওরো। দক্ষিণ আমেরিকার একটা ছোট্ট রাজ্য। এই যে, দেখ ম্যাপটা। পাশে আরও দুটো ম্যাপ। একটা সবুজ, মাঝখানে স্টেট-এর সীল, আরেকটা নীল, মাঝে একগুচ্ছ সোনালি ওকপাতা। সবুজ রঙেরটা দেশের অফিশিয়াল ফ্ল্যাগ, আর নীলটার নিচে লেখা রয়েছে ওল্ড রিপাবলিক। নোট লেখা রয়েছে, দেশের কিছু কিছু অঞ্চলে নীল পতাকাটাকে বিশেষ ছুটির দিনে এখনও ব্যবহার করে রক্ষণশীল গোষ্ঠী।' দুই বন্ধুর দিকে তাকাল একবার রবিন, আবার মুখ নামাল ম্যাপের দিকে। 'প্রশান্ত মহাসাগরের তীরেই অবস্থিত মেসা ডি'ওরো। বন্দর আছে। কফি আর পশম রপ্তানি করে। রাজধানীটাও একটা বন্দর, নাম ক্যাবো ডি র‍্যাযোন। এর দক্ষিণের উঁচু অঞ্চলে বার্লির চাষ হয়। লোক সংখ্যা পঁয়ত্রিশ লাখ।'

'তাই?' মুসা বলল। 'আর কিছু?'

'ম্যাপ বইতে বেশি তথ্য থাকে না। যা দিয়েছে এইই বেশি, তা-ও ভাল ম্যাপ বলে।'

'হুঁম্‌ম্‌,' মাথা দোলাল কিশোর। 'মুসা, কাল যেটা দেখে এসেছ সেটাও বোধহয় কোন ধরনের সাংগঠনিক দল। দেশের কোন কাজের জন্যে টাকা সংগ্রহ করছে। কিন্তু নেতা সুবিধের নয়। পুলিশকে মিথ্যে কথা বলেছে। বোঝাই যায়। নইলে পুলিশ আসায় সতর্ক হয়ে যেত না। তাছাড়া, মিসেস নিকারো অন্ধ লোকটাকে স্বপ্নে দেখার কথা বলায় চমকে উঠেছে বিল।' মুসার দিকে চেয়ে ভুরু নাচাল সে। 'কাল রাতে আসলে কি করছিল ওরা? ওদের সঙ্গে কি ব্যাংক ডাকাতির কোন সম্পর্ক আছে, না সভা করাটা ভিন্ন আরেক রহস্য? একটা ব্যাপার পরিষ্কার, সভা করার আসল কারণ পুলিশকে জানতে দিতে চায়নি ওরা।'

'চায়নি বলেই যে অপরাধ করেছে, সেটা না-ও হতে পারে,' বলল রবিন।

'তবে ব্যাপারটা অদ্ভুত। পুলিশ জানলে অসুবিধে হবে মনে করে, অথচ কোনরকম গোপনীয়তার আশ্রয় নেয়নি। সোজা গিয়ে বসে পড়েছে মুসা, কেউ বাধা দেয়নি।'

ভ্রূকুটি করল কিশোর। নিচের ঠোঁট ধরে জোরে টান দিয়ে ছেড়ে দিল। এর অর্থ, প্রশ্নের উত্তর জানার চেষ্টায় পুরোদমে চালু করে দিয়েছে মগজ।

'এমনও হতে পারে, আমি যার ছবি দেখেছি,' মুসা বলল। 'রবিন সেই লোককে দেখেনি। দু'জনই অন্ধ, তবে আলাদা লোক।'

'বেশি কাকতালীয়,' বলল কিশোর। 'তুমি যার ছবি দেখেছ তার গালেও কাটা দাগ। মিসেস নিকারো স্বপ্নে দেখা লোকটার চেহারার বর্ণনা দিতে চমকে উঠেছে বিল, তারমানে ওই লোক তার পরিচিত। আর পরিচিত লোকটা ছবির লোক ছাড়া আর কে? কিন্তু মেসা ডি'ওরোর সঙ্গে ওদের কি সম্পর্ক? ব্যাংক ডাকাতি কি ওরাই করেছে?'

'হতে পারে বিল বিদেশী এজেন্ট, আর অন্ধ লোকটা তার কনট্যাক্ট,' মুসা বলল। 'স্পাই হলে পুলিশের কাছে অবশ্যই নিজের পরিচয় গোপন রাখার চেষ্টা করবে। গায়ক সেজে বসাটা বিচিত্র কিছু নয়।'

'টেলিভিশন খুব বেশি দেখ তুমি,' বলল রবিন।

'গল্পের চেয়েও আশ্চর্য ঘটনা ঘটে বাস্তবে,' কিশোর বলল। 'বিলের ব্যাপারে প্রায় কিছুই জানি না আমরা এখনও। কাজেই কি যে ঘটছে অনুমান করা মুশকিল। তবে, মেসা ডি'ওরো সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে হবে আমাদের।'

ঘড়ি দেখল রবিন। 'দশটায় লাইব্রেরিতে যেতে হবে। বইপত্র ঘেঁটে দেখব তখন।'

'কিশোওর!' মেরিচাচীর ডাক শোনা গেল। 'এইই কিশোওর!'

হাসল মুসা। 'যাও, আজও কাজ চাপাবে ঘাড়ে।'

দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা।

ওঅর্কশপের বাইরেই অপেক্ষা করছেন মেরিচাচী। দেখেই বলে উঠলেন, 'এই কিশোর, ডাকলে জবাব দিস না কেনরে?' বলেই তাড়াতাড়ি স্বর নরম করে ফেললেন, 'ওই যে, বোরিস ডাকছে তোকে। মাল তুলবে। মুসা, বাবা, তুমিও একটু যাও, সাহায্য কর ওদের। ওই দেখ না, কি সব জিনিস নিয়ে এসেছে তোমার আংকেল। কতগুলো ভাঙা চেয়ার-টেবিল। কখন যে কোত্থেকে কি নিয়ে আসে...।'

'আনুক না, অসুবিধে কি?' কিশোর বলল। 'বিক্রি তো হয়ে যায়।'

'তা যায়। তোর চাচার চেয়েও বোকা লোক আছে দুনিয়ায়। এই তো, কাল এক মহিলা ওগুলোর অর্ডার দিয়ে গেল। আজ আবার পৌঁছে দিতে হবে। সান্তা

মনিকার ডেলটন অ্যাভেন্যুতে নাকি একটা বাচ্চাদের স্কুল খুলবে। খুলুক, আরও বেশি করে খুলুক, আমাদের ভালই···আরে, রবিন, তুমি কোথায় যাও?'

'চাকরি,' তাড়াতাড়ি জবাব দিল রবিন। 'আর দশ মিনিট সময় আছে।'

'তাহলে দেরি করছ কেন? কখনও কাজে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করবে না। অফিসে লেট করে যাওয়া কোনমতেই উচিত নয়। যাও, যাও।'

মাল তুলতে বেশিক্ষণ লাগল না। ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে কিশোর, সে আর সুজাও যাবে সান্তা মনিকায়।

চাচীকে রাজি করাতে কষ্ট হল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই দক্ষিণে রওনা হল ট্রাক।

সাগরের ধারে একটা সাইড স্ট্রীটের পাশে নার্সারি স্কুলটা। ট্রাক রাখল বোরিস। ওখান থেকেই দেখা যায় ওশেন ফ্রন্ট সিনিয়র সিটিজেন সেন্টারটা। একতলা একটা বাড়ি, চারপাশে লন, বসার জন্যে বেঞ্চ আছে। চারজন বৃদ্ধ এক জায়গায় বসে তাস খেলছে। কাছেই আরেকজন লাঠিতে ভর দিয়ে খেলা দেখছে। চোখে-মুখে হতাশার ছাপ স্পষ্ট। দেখে দুঃখ হল কিশোরের। লোকটা আর কেউ নয়, ড্যানি রোজার।

'সারারাত ঘুমায়নি মনে হয়,' মুসা বলল।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'ওই চারজন তাকে এড়িয়ে যাচ্ছে না?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। কারও ওপর সন্দেহ ঝুলে থাকাটা এজন্যেই খুব খারাপ। এসপার-ওসপার হয়ে যাওয়া ভাল।'

'লোকটাকে চেন নাকি?' জিজ্ঞেস করল বোরিস।

'আমাদের মক্কেল।'

'তাহলে আর ওর ভাবনা নেই,' হাত ঝাড়ল বোরিস। 'সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ট্রাক থেকে নেমে স্কুলের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল বোরিস। বেল টিপল। মুসা তাকিয়ে আছে সেন্টারের দিকে, হঠাৎ 'আরি!' বলে উঠল।

'কি হল?' কিশোর জানতে চাইল।

'ওই মেয়েটা,' বলতে বলতে মাথা নুইয়ে ফেলল মুসা। যাতে তাকে দেখতে না পায়।

ফুটপাত ধরে সুন্দরী এক মেয়েকে হাঁটতে দেখল কিশোর। অল্প বয়েস। মাথায় লম্বা সোনালি চুল, হাঁটার তালে তালে নাচছে। পরনে স্ল্যাকস আর গায়ে বেঢপ এক সোয়েটার। পাশে পাশে প্রায় দৌড়ে চলেছে একটা সেইন্ট বার্নার্ড কুকুর, হাঁ করা মুখ, জিভ বেরিয়ে পড়েছে।

'কে? চেন নাকি?'

'কাল মীটিঙে ছিল,' মুসা বলল। 'বক্তৃতা দিয়েছে। জন তার সমর্থন পেয়েছে খুব।'

'হুঁম!' সোজা হয়ে বসল কিশোর। তীক্ষ্ণ হল দৃষ্টি। খুঁটিয়ে দেখছে মেয়েটাকে। 'বাহ্, খুব ভাল তো...মিস্টার রোজারের কাছে যাচ্ছে...আরে, হাতও মেলাচ্ছে দেখি।'

'কীই?' মাথা তুলল মুসা।

কুকুরের শেকল ছেড়ে দিয়ে রোজারের দুই কাঁধে হাত রাখল মেয়েটা। উষ্ণ হেসে চুমু খেল লোকটার গালে।

খুশি মনে হল রোজারকে।

'খাইছে! রোজার, ব্যাংক ডাকাতি, প্যাসিফিকে মোটেলের সভা, মিস্টার সাইমনের মানিব্যাগ, অন্ধ লোক, সবই দেখি একই সুতোয় গাঁথা!'

'সুতো কি ওই মেয়েটা?'

'নিশ্চয়ই,' মুসা বলল। 'খুব সহজ ব্যাপার। ওই গায়ক গোষ্ঠীর সদস্য মেয়েটা। রোজারকেও চেনে বোঝা যাচ্ছে। তার কাছ থেকে ব্যাংকের খবরাখবর ওই মেয়েই নিয়েছে। অন্ধটা হল ডাকাত দলের সর্দার। ব্যাংকে যে তিনজন ঢুকেছিল, তাদের মধ্যে মেয়েটাও থাকতে পারে। ছদ্মবেশ নিয়েছিল। তাই চিনতে পারেনি রোজার। কিংবা হয়ত শুধু ইনফর্মারের কাজই করেছে মেয়েটা।'

'হতেও পারে,' আনমনা হয়ে গেছে কিশোর। 'কিন্তু সভার অন্য লোকগুলো কারা? সবাই ডাকাত হতে পারে না।'

'ওরা...ওরা।' জবাব দিতে পারল না মুসা। 'ওরা হয়ত নির্দোষ। ডাকাতগুলো ওদের ব্যবহার করছে...।' কি কাজে ব্যবহার করছে বলতে না পেরে চুপ হয়ে গেল সে।

'আড়াই লাখ ডলারে হল না, আরও টাকা দরকার? একেবারে চাঁদা তুলতে শুরু করল?' নিজেকেই প্রশ্ন করল কিশোর

'হ্যাঁ, কেমন জানি ব্যাপারটা!'

'কিন্তু মেয়েটার সঙ্গে রোজারের পরিচয় হল কিভাবে? দেখি, একলা পেলে জিজ্ঞেস করব।'

হাসছে মেয়েটা। হিবিসকাস ঝোপের সঙ্গে শেকল জড়িয়ে ফেলেছে তার কুকুর, ছুটতে পারছে না, তাই দেখেই হাসি।

'তুমি থাক,' কিশোর বলল। 'মেয়েটার পিছু নেব আমি। দেখব, কোথায় যায়। মাথা নোয়াও, মাথা নোয়াও। এদিকেই আসছে।'

মেঝেতে বসে পড়ল মুসা। শুনতে পেল, মেয়েটা বলছে, 'আয়, আয়, আর জ্বালাসনে। আবার ওদিকে ফেরে!'

জুতোর গোড়ালির খটাখট আওয়াজ তুলে ট্রাকের পাশ দিয়ে চলে গেল মেয়েটা।

আস্তে দরজা খুলে নেমে গেল কিশোর।

নয়

পথের শেষ মাথায় পৌছে ডানে মোড় নিল মেয়েটা। চোখের আড়াল হয়ে গেল। দ্রুত পা চালাল কিশোর। মোড় ঘুরতেই আবার দেখল ওকে, পুরানো একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে ঢুকছে।

ধীরে এগোল কিশোর। একটা সুইমিং পুলকে তিনদিক থেকে ঘিরে রেখেছে বাড়িটা। চতুর্থ দিকে সাদা রঙ করা লোহার বেড়া। মেয়েটাকে দেখা যাচ্ছে না। তবে একটা দরজা খোলা দেখতে পেল। বেড়ার বাইরে দাঁড়িয়ে দ্বিধা করছে কিশোর, এই সময় দরজা দিয়ে ছুটে বেরোল সেইন্ট বার্নার্ড।

'টিমি, জলদি আয়! টিমি, এই টিমি!'

ছুটে গিয়ে পুলের এক প্রান্তে একটা ফুলের বেডের ওপর বসল কুকুরটা।

'আরে এই শয়তান, জলদি আয়! বাড়িওলি দেখলে আমাকে সুদ্ধ বের করবে।'

গেট খুলে চত্বরে ঢুকল কিশোর। গেটের পাশের মেইলবক্সের দিকে তাকিয়ে রইল চিন্তিত ভঙ্গিতে।

'কাউকে খুঁজছ?' মেয়েটা জিজ্ঞেস করল।

'না, মানে···না,' যেন বলতে ভয় পাচ্ছে। 'ইয়ে···।'

'কি?'

'সান্তা মনিকা ইভনিং আউটলুক। গ্রাহক হবেন?'

'সরি। কাগজ পড়ার সময় নেই আমার।'

পকেট থেকে ছোট প্যাড আর পেন্সিল বের করল কিশোর। 'রাখুন না? না হয় খালি রোববারেরটাই রাখুন?'

'থ্যাংকস। লাগবে না।'

'ও,' খুব হতাশ মনে হল কিশোরকে। 'আজকাল কাগজই রাখতে চায় না লোকে। পড়ে না।'

'দিনকাল খুব খারাপ তো। বাঁচার তাগিদেই হিমশিম খেতে হয়, পড়ার সময়

কোথায়,' হাসল মেয়েটা। কুকুরটা এসে বসল তার পায়ের কাছে। 'তো, কি পাবে? একশোজনকে গ্রাহক করতে পারলে একটা সাইকেল পুরস্কার?'

'একজনই পারি না, একশো পাব কোথায়? আপনার কি মনে হয়? এ-বাড়িতে আর কেউ হবে?'

'বাড়িতে তো এখন কেউ নেই। সবাই কাজে গেছে। বিষ্যুৎবার তো।'

'ও,' ঠোঁটের এক কোণ ঝুলে পড়ল কিশোরের। হতাশ ভঙ্গিতে বসে পড়ল পুলের কিনারে রাখা একটা চেয়ারে। 'লোকের কাছে জিনিস বিক্রি যে কত কঠিন···আপনি···আপনি···।'

'কি ব্যাপার? কি হয়েছে তোমার?'

'না না, কিছু হয়নি। আমাকে···এক গেলাস পানি খাওয়াতে পারেন?'

হেসে উঠল মেয়েটা। 'পারব না কেন? বস। নিয়ে আসছি।'

খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল ও, কুকুরটা গেল পেছনে। খানিক পরেই একটা জগ আর গেলাস নিয়ে বেরোল মেয়েটা, দরজা বন্ধ করে কুকুরটাকে আটকে রাখল ভেতরে।

কাছে এসে বলল, 'পাজি কুকুর। কিছুতেই সামলাতে পারি না।'

মেয়েটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে গেলাসে চুমুক দিল কিশোর। ওর পাশে আরেকটা চেয়ারে বসল মেয়েটা, রোদ লাগে, তাই মুখ ফিরিয়ে রাখল।

'রাতে চেষ্টা করা উচিত তোমার। তখন বাসায় থাকে লোকে।'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' চেহারাটাকে বোকা বোকা করে তুলল কিশোর। 'আচ্ছা, এখন কি কেউ নেই? আপনি তো আছেন। দিনে আর কেউ থাকে না?'

'থাকে, মাঝেসাঝে।'

'ও। আপনি কাজ করেন না?'

'করি। এখন করছি না।'

'ও। কেন, চাকরি চলে গেছে?'

'না, তা যায়নি। সিনেমায় কাজ করি তো, নির্দিষ্ট কোন টাইম নেই। মেকাপের কাজ। যখন শুটিং চলে, যাই, যখন চলে না, যাই না।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'আমার একজন বন্ধু আছে। তার বাবাও ছবিতে কাজ করেন। স্পেশাল ইফেক্ট বিশেষজ্ঞ।'

'কি নাম? হয়ত চিনব।'

'আমান। মিস্টার রাফাত আমান।'

মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'না, ওই নামে কাউকে চিনি না। উনি হয়ত অন্য স্টুডিওতে কাজ করেন। স্পেশাল ইফেক্টের লোকদের দাম আছে। একেকবার ভাবি,

মেকাপ ছেড়ে ওই লাইনে চলে যাব কিনা। আবার ভাবি, না, মেকাপ মন্দ কি? তবে ইচ্ছে করলে মেকাপ করার পরেও স্পেশাল ইফেক্ট শেখার সময় পাব।'

'ইস্কুল-টিস্কুলে যান?'

'না, লেখাপড়ার ইস্কুলে যাই না। তবে অভিনয় শিখতে যাই। মিখাইল পাপোসকির ওখানে। একদিন না একদিন সিনেমায় অভিনয়ের চান্স পাবই।'

মাথা ঝোঁকাল কিশোর। ঘুম ঘুম চোখ। 'অনেকেই অভিনয় শিখতে চায়। তবে মেকাপ শেখা আরও সাংঘাতিক। গত হপ্তায় একটা ছবি দেখলাম। ওই যে, মন্দির থেকে মূর্তি চুরি করে লোকটা। দেবতার অভিশাপ লাগে তার ওপর।'

'ওরকম ছবি অনেক আছে। তা অভিশাপে কি হয়? সে-ও পাথর হয়ে যায়?'

'না না, তাহলে তো ভালই হত। সাপ হয়ে যায়। মুখটা মানুষেরই থাকে।'

'অ, স্নেকম্যান ছবির কথা বলছ। ভালই। ওটার মেকাপম্যানকে চিনি, নিরো বেকারো। গুণী লোক। অ্যাকাডেমি পুরস্কারই পেয়ে যাবে কোনদিন।'

'আপনি কোন স্পেশাল মেকাপ করেছেন? মানে রক্তচোষা মানুষ-বাদুড়, মায়ানেকড়ে...।'

'নাহ্, আমি জোয়ান লোককে বয়স্ক বানাই বেশি। কঠিন না কাজটা। দৈত্য-দানব বা মায়ানেকড়ে বানাইনি কখনও।'

'তাই? আচ্ছা, কাটাকুটির দাগ বানাতে পারেন? ওই যে, অনেক ভিলেন আছে না, মুখে কাটা দাগ থাকে?'

শ্রাগ করল মেয়েটা। 'সময় লাগে অনেক। সময় দিলে অনেক কিছুই করা যায়। শুধু, মেকাপ করে বুড়োকে জোয়ান বানানো যায় না। চিহ্ন থাকবেই। পুরোপুরি লুকানো সম্ভব না। এই কিছুটা তাজা করা যায় আরকি। দেখ না, যত নামকরা অভিনেতাই হোক, বুড়ো হয়ে গেলে তাকে দিয়ে আর রোমান্টিক নায়কের অভিনয় করানো যায় না।'

কথার ফাঁকে ফাঁকে গেলাসে চুমুক দিয়েছে কিশোর। পানি প্রায় শেষ। আরেক গেলাস চাইতে পারে। কিন্তু দরকার কি? আর তেমন কিছু জানার নেই। এক ঢোকে বাকি পানিটুকু শেষ করে গেলাসটা পাশের টেবিলে রেখে দিল। 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

'আর দেব?'

'না, লাগবে না। মিস্টার আমানকে আপনার কথা বলব। বলা যায় না, কোন ছবিতে একসঙ্গে কাজ করতেও পারেন দু'জনে।'

'ভালই হবে।'

'ও, এতক্ষণ কথা বললাম, আপনার নামটাই জানা হল না।'

'সিনথিয়া ব্যানালিস। ডাক নাম সিনথি।'

'ও-কে। পানি খাইয়েছেন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।'

গেট দিয়ে বেরিয়ে নার্সারি স্কুলের দিকে রওনা হল কিশোর। মনে মনে খুশি। বোকার অভিনয় করে অনেক কথাই জেনে এসেছে। কিন্তু মোড় নিয়ে ডেলটন অ্যাভেন্যুতে পড়েই গুঙিয়ে উঠল।

ট্রাকটা নেই। চলে গেছে মুসা আর বোরিস, বোধহয় তার দেরি দেখেই।

'দূর! দেরি করতে বলা উচিত ছিল,' জোরে জোরে বলল সে। 'বাস ছাড়া আর উপায় নেই।'

উইলশায়ারের দিকে রওনা হল সে। হাঁটতে হাঁটতেই একটা সন্দেহ মাথা চাড়া দিল তার মনে।

দশ

ডেস্কের ওপাশ থেকে দুই বন্ধুর দিকে তাকাল কিশোর। লাঞ্চের পর হেডকোয়ার্টারে আলোচনায় বসেছে। সিনথিয়ার সঙ্গে কি কি কথা হয়েছে, জানিয়েছে দু'জনকে।

'ধর,' কিশোর বলল। 'অন্ধ ভিক্ষুকটা যদি পুরুষ না হয়ে মেয়েমানুষ হয়?'

এক মুহূর্ত ভাবল রবিন। মাথা নাড়ল। 'আমার মনে হয় না।'

'কিন্তু হতে তো পারে? সিনথি মেকাপ আর্টিস্ট। রোজারের সাথে পরিচয় আছে। মুসা, তোমার কথাই হয়ত ঠিক। সিনথির সঙ্গে ওই ডাকাতি, অন্ধ ভিখিরি আর মীটিঙের সঙ্গে কোন যোগাযোগ আছে।'

'ওই লোকটা সিনথি নয়,' জোর দিয়ে বলল রবিন। 'খুব কাছে থেকে দেখেছি অন্ধকে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি ছিল। দু'-দিন শেভ করেনি। মেকাপ করে ওরকম দাড়ি বানানো সম্ভব?'

'হুঁম্‌ম্‌!' হতাশ হল কিশোর। 'যা-ই হোক, রোজারের কাছ থেকে ব্যাংকের খবর জানাটা তো কঠিন না, চেনা যখন। তারপর অন্ধ গালকাটাকে···।'

'কাটাটা নকল,' রবিন বলল।

ভুরু কোঁচকাল কিশোর। 'লাইব্রেরিতে জেনে এসেছ নাকি?'

'হ্যাঁ,' কোলের ওপর ফেলে রাখা বড় খামটা হাতে নিল। কয়েকটা ম্যাগাজিন বের করল ওটা থেকে। 'মেসা ডি'ওরো একটা দেশ বটে। ছোট, মাত্র পনেরো হাজার বর্গমাইল, লোক সংখ্যা চল্লিশ লাখের কম, কিন্তু গণ্ডগোল কম নয়।' একটা ম্যাগাজিন খুলল সে। 'ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স পত্রিকায় কয়েক বছর আগে একটা

আর্টিকেল বেরিয়েছিল। সেটারই সারমর্ম তুলে দেয়া হয়েছে এই ম্যাগাজিনে। দেশটার ইতিহাস অনেকখানি জানা যায় শুধু এটুকু পড়লেই। একসময় স্প্যানিশ কলোনি ছিল ওখানে। তারপর আঠারশো পনেরো সালে ওদেশী জমিদারেরা একজোট হয়ে উৎখাত করল ওখানকার বিদেশী সরকারকে। নতুন প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করে নতুন সংবিধান চালু করল।'

'ভাল করেছে,' মুসা বলল। 'কিন্তু এর সঙ্গে অন্ধ আর ডাকাতের কি সম্পর্ক?'

'হয়ত কিছুই না। আমি ব্যাকগ্রাউণ্ড বলছি। তারপর আঠারশো বাহাত্তর সালে একটা বিদ্রোহ হয়। অনেক লোক মারা যায়। মরছে এখনও।'

রবিনের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর।

'খাইছে! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'আঠারশো বাহাত্তরে শুরু হয়ে এখনও চলছে? তুমি বানিয়ে বলছ।'

'আমাকে বলতে দাও,' হাত তুলল রবিন। 'অনেকটা ফরাসী বিপ্লবের মত। ঊনিশশো সতেরো সালে রাশিয়ায়ও হয়েছিল এরকম। মেসা ডি'ওরোর জমিদারেরা ভয়ানক দুর্নীতি শুরু করল। দিনকে দিন বড়লোক হতে লাগল ওরা, গরিব হল আরও গরিব। তাদেরকে কিছুই দিত না ধনীরা। অথচ ওসব জমির মালিক একসময় ওই গরিবেরাই ছিল। ওরা জাতে ইনডিয়ান।

'অবশেষে হুয়ান কর্‌সো নামে এক ইনডিয়ান একটা দল গঠন করল। বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগল দেশের এখানে সেখানে। গরিবের অধিকার আদায়ের কথা বলল। তাকে ধরে জেলে পাঠিয়ে দিল কর্তৃপক্ষ।'

'বিপ্লবের কথা বলছিলে তুমি,' মনে করিয়ে দিল কিশোর।

'সেকথাই তো বলছি। সাংঘাতিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে ততদিনে কর্‌সো। তাকে জেলে ভরায় লোকে গেল আরও খেপে। দলে দলে রাজধানীতে এসে চড়াও হল ওরা, জেল থেকে বের করে আনল কর্‌সোকে। প্রেসিডেন্ট অ্যারতোরো রডরিগেজকে ধরে ফাঁসি দিয়ে দিল। প্রেসিডেন্টের ছেলে অ্যানাসত্যাসিও রডরিগেজ পাল্টা আক্রমণ চালাল। অনেক রক্তক্ষয় হল, কয়েকবার সরকার বদল হল। অবেশেষে কর্‌সোই হল প্রেসিডেন্ট। অ্যানাসত্যাসিও পালিয়ে গেল মেকসিকো সিটিতে।

'ওখানে ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেলেই ভাল হত,' বলে যাচ্ছে রবিন। 'কিন্তু অ্যানাসত্যাসিও পরাজয় মেনে নিতে পারল না, রাজ্যহারা রাজার মত গুমড়াতে লাগল। কিন্তু কিছু করার ছিল না তার। জমিদাররা যারা বেঁচে রইল, তারাও পালিয়ে আসতে লাগল মেকসিকোয়, কারণ মেসা ডি'ওরোতে তাদের টেকা মুশকিল হয়ে উঠেছিল। শ্রমিকেরা সংখ্যা গরিষ্ঠ। ভোট দিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

করেছে। ধনীদেরকে বাধ্য করেছে বেশি ট্যাক্স দিতে।'

'হুঁ, বুঝতে পারছি শোচনীয় হয়ে পড়েছিল জমিদারদের অবস্থা,' মুসা বলল।

'খুবই শোচনীয়। একজোট হল আবার জমিদারেরা। পুরানো দিনের কথা মনে করে আফসোস করত তারা। বলত, আহা, কি সব দিনই না ছিল। প্রেসিডেন্ট অ্যারতোরোর সময়। ওরা গঠন করল আরেকটা দল, দেশের মধ্যে থেকেই, নাম দিল সোলজার্স অভ দ্য রিপাবলিক। প্রতিজ্ঞা করল, তারা জিততে পারলে অ্যানাসত্যাসিওকে এনে প্রেসিডেন্ট করবে। পুরানো পতাকাই ব্যবহার করল ওরা, নীলের মাঝে সোনালি ওকপাতা। হুয়ান কর্‌সো নতুন পতাকা চালু করেছে, সবুজের মাঝে নীল।'

ভ্রূকুটি করল কিশোর। 'কিন্তু এসব তো ঘটেছে একশো বছরেরও বেশি আগে। আমাদের মক্কেলের সঙ্গে মেসা ডি'ওরোর রাজনীতির কি সম্পর্ক? নাকি এখনও সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে জমিদারেরা? আগের প্রেসিডেন্টের ছেলের তো এতদিনে মরে ভূত হয়ে যাওয়ার কথা।'

'তাই তো গেছে। এখন সংগ্রাম চালাচ্ছে অ্যানাসত্যাসিওর নাতি, ফেলিপ রডরিগেজ। মেকসিকো সিটিতেই বাস করে। সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে ফেলিপ, কবে দেশে ফিরে গিয়ে সিংহাসনে বসবে, যে দেশকে সে চোখেই দেখেনি কখনও। অনেক গুপ্তচর আছে তার, দেশের খবরাখবর এনে দেয়।'

'আশ্চর্য তো!' মুসা বলল। 'তিন পুরুষ পরে এখনও প্রসিডেন্ট হওয়ার শখ?'

'শখ হলে আর কি করা। তবে কথাটা সত্যি। ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স বলছে সোলজার্স অভ দ্য রিপাবলিক দলটা বেআইনী নয় মেসা ডি'ওরোতে। দলের সদস্যরা রিপাবলিকান বলে পরিচয় দেয় নিজেদের। রোববারে জমায়েত হয়ে বিবৃতি-টিবৃতি দেয়।

'বিরোধীরা কেয়ারও করে না। রিপাবলিকানদের কেউ কেউ চায় বর্তমান প্রেসিডেন্টকে উৎখাত করতে। ওরা আবার আরেকটা বিশেষ নাম নিয়েছে, ফ্রিডম ব্রিগেড। ওদেরকে স্বীকৃতি দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না, রাষ্ট্র ওদেরকে আউট ল ঘোষণা করেছে। দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে ওরা, কিডন্যাপ করে, বোমাবাজি করে। বেশি বাড়াবাড়ি শুরু করলে পুলিশ বাধা দেয়। পুলিশের তাড়া খেয়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয় অনেকে, পালিয়ে আসে মেকসিকো কিংবা আমেরিকায়।'

'তারমানে,' ঢোক গিলল মুসা। 'কাল রাতে টেরোরিস্টদের সভায় যোগ দিয়েছিলাম? সন্ত্রাসবাদী? সব্বোনাশ!'

'হতে পারে, না-ও হতে পারে। মেসা ডি'ওরোর লোক অনেক আছে আমেরিকায়। সোলজার্স অভ দ্য রিপাবলিকের একদল সন্ত্রাস পছন্দ করে, আরেক

দল করে না। তবে দুই দলই চায় ফেলিপ প্রেসিডেন্ট হোক। টাকা সংগ্রহ করে দলের জন্যে।'

'চমৎকার!'

'সে যা হোক, এই তো গেল মেসা ডি'ওরোর রক্তক্ষয়ী ইতিহাসের কাহিনী। এখন আসা যাক অন্ধের কথায়।পুলিশের নাম শুনেই সে-রাতে ভয়ে পালাল অন্ধ। মিসেস নিকারোর স্বপ্নের কথা শুনে চমকে উঠল বিল। তুমি কাল রাতে দেখে এলে তার ছবি। বোঝাই যায়, ছবির ওই লোককে নেতা বানিয়েই মীটিং করছিল ওরা।'

ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টালো রবিন। 'এই দেখ,' তুলে দেখাল সে, বেশ বড় একটা ছবি। কালো চশমা, গালে কাটা দাগ। মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, বক্তৃতার ভঙ্গিতে হাত তোলা। মুখ দেখেই বোঝা যায়, ছবিটা তোলার সময় চেঁচিয়ে কথা বলছিল। 'মুসা, এই ছবিটাই দেখেছিলে?'

'হ্যাঁ, এটাই। অবিকল এক চেহারা।'

'আমিও এই চেহারাই দেখেছি, তবে একেই কিনা জানি না। এর নাম লুই প্যাসক্যাল ডোমিনিগেজ ডি অ্যাল্ট্র্যানটো। একসময় ফেলিপ রডরিগেজের সহযোগী ছিল। এ-ব্যাটা টেরোরিস্ট। মেসা ডি'ওরোতে বোমা মেরে চোদ্দটা বাচ্চাকে খুন করেছে একবার, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী। দোষ চাপিয়েছে সরকারের ঘাড়ে। তার যুক্তি, শয়তান সরকার চেয়ার দখল করে আছে বলেই তাকে টেরোরিস্ট হতে হয়েছে, আর সে টেরোরিস্ট হয়েছে বলেই বাচ্চাগুলো মরেছে।'

'আস্ত ফ্যানাটিক,' অনেকক্ষণ পর কথা বলল কিশোর। 'কিন্তু তুমি যাকে দেখেছ, সে আর এই ছবির লোক এক নয় বলে সন্দেহ করছ কেন?'

'কারণ অ্যাল্ট্র্যানটো মৃত। মারা গেছে কয়েক বছর হল।'

কিছুক্ষণ নীরবতার পর জোরে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। 'যদি সে মৃতই হয়…।'

তাকে কথা শেষ করতে দিল না কিশোর। 'কিন্তু চেহারা তো অবিকল এক! রবিন, অ্যাল্ট্র্যানটো কি অন্ধ ছিল?'

'হ্যাঁ। এক ওয়্যারহাউসে আগুন লাগাতে গিয়ে হয়েছিল। নিজের আগুনে নিজেই। এতেই হিরো হয়ে যায় সে।'

'তাহলে অন্ধ ভিক্ষুক আর অ্যালট্র্যানটোর চেহারা এক,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'শুধু মেকাপ আর একটা কালো চশমা দরকার, কাউকে অ্যাল্ট্র্যানটো বানানোর জন্যে। আমি ভাবছি, এসবের পেছনে সিনথিয়ার হাত নেই তো? কিন্তু কেন কেউ ওই ছদ্মবেশ নেবে? কি লাভ তার? কেউ…।'

ফোন বাজল। বাধা পেয়ে বিরক্ত চোখে তাকাল কিশোর। তারপর তুলে নিল রিসিভার। 'হ্যালো…ও, মিস্টার রোজার!'

এক মিনিট চুপচাপ শুনল সে। তারপর বলল, 'হুঁ, কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তবে এড়িয়ে যাওয়ার মত নয়। যদি বলেন, আসতে পারি। এমনিতেও আপনার সঙ্গে কথা আছে।'

আরেক মিনিট শুনল। বলল, 'হ্যাঁ। আসতে আধ ঘন্টা লাগবে।'

রিসিভার রেখে দিল কিশোর। 'আবার রোজারকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। খুব মুষড়ে পড়েছে। দেখি, যাই, কি বলে? সিনথিয়ার কথাও জিজ্ঞেস করতে হবে।' দুই সহকারীর দিকে তাকাল সে। 'মেয়েটার ওপর নজরও রাখতে হবে আমাদের। বিলের দলের সঙ্গে যোগাযোগ আছে কিনা জানা দরকার।'

'আমার দিকে চেয়ে লাভ নেই,' মাথা নাড়ল মুসা। 'মা-র কড়া আদেশ, বিকেলের মধ্যে লনের ঘাস কেটে সাফ করতে হবে। আর আমাদের বাগানে যা ঘাসরে, ভাই, জানই তো। এক হপ্তায় ছ'ইঞ্চি হয়ে যায়, আরও পেয়েছে বৃষ্টি।' থামল এক মুহূর্ত। 'তাছাড়া, মেয়েটা আমাকে চিনে ফেলার ভয় আছে।'

'রবিন?' সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল কিশোর।

'আমি পারব। বিকেলে কাজ নেই।'

'হুঁশিয়ার,' সাবধান করে দিল মুসা। 'বোমা মেরে যারা শিশু খুন করতে পারে, তাদেরকে বিশ্বাস নেই। জানোয়ারেরও অধম।'

এগারো

আধ ঘন্টা পর রোজারের দরজায় টোকা দিল কিশোর। খুলে দিল রক রেনাল্ড। গলাবন্ধ কালো শার্ট গায়ে, চোখে সানগ্লাস।

'ও, তুমি,' রক বলল। 'আমাদের মহাগোয়েন্দা। কিছু জেনে এসেছ? রোজার খুশি হবে তো?'

রেগে গেল কিশোর। কিছু বলল না। ঝকঝকে পরিষ্কার লিভিং রুম পেরিয়ে রান্নাঘরে এসে ঢুকল। জানালার ধারে সেই একই জায়গায় চেয়ারে বসে আছে রোজার, হাতে কফির কাপ। তার সামনাসামনি বসল কিশোর। কফি খাবে কিনা জিজ্ঞেস করল রক।

'কফি খাই না,' ভদ্রভাবে বলল সে।

'নিশ্চয়,' রক বলল। 'ভুলেই গিয়েছিলাম, আমেরিকান ছেলেরা কফি খায় না। তোমাকে কিন্তু আমেরিকান লাগছে না।'

'আঙুরের রস মেশানো সোডা আছে,' রোজার বলল। 'খাবে?'

'কিছুই লাগবে না আমার, ধন্যবাদ। লাঞ্চ সেরেই চলে এসেছি।'

'আমি জানতাম বাচ্চারা খাওয়া পেলেই খায়, পেটে জায়গা থাক আর না থাক,' বলল রক। 'তুমি কি আলাদা? স্বাস্থ্য দেখে অবশ্য মনে হয় না, খাওয়ার প্রতি তেমন টান আছে।'

অনেক কষ্টে চেহারা স্বাভাবিক রাখল কিশোর।

'খাও না কেন? এই বয়সেই ডায়েট কন্ট্রোল?'

জবাব দিল না কিশোর। আরেক দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল।

স্টোভের কাছে ফিরে গেল রক। কেটলিতে পানি ফুটছে। কাপে ইনসট্যান্ট কফি বানিয়ে নিয়ে এসে বসল দু'জনের কাছে। টেবিলে রাখা চিনির পাত্র থেকে চিনি নিয়ে কাপে মিশাল।

'তারপর, কি খবর নিয়ে এলে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'এই আরকি,' কিশোর বলল। 'তেমন কিছু না।'

'তেমন কিছু পেলে কি করতে?'

'অবশ্যই পুলিশকে জানাতাম।'

'হ্যাঁ, সেটাই উচিত।' কফি শেষ করে উঠে গিয়ে কাপটা সিংকে ভেজাল রক। বেরিয়ে গেল। ড্রাইভওয়েতে একটা গাড়ি স্টার্ট নেয়ার শব্দ হল। রান্নাঘরের জানালার পাশ দিয়ে ছুটে গেল একটা নতুন মডেলের স্পোর্টস কার।

বিমর্ষ হয়ে আছে রোজার।

'পুলিশ এসে দোষী বলেনি তো আপনাকে?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

মাথা নাড়ল রোজার। 'নাহ্, তবে একই গল্প তিনবার বলিয়েছে আমাকে দিয়ে।' কিশোরের দিকে তাকাল সে। 'ওরা চাইছে আমি একটা ভুল করে বসি। কিন্তু আমি···আমি ভুল করছি না।'

'সত্যি যা ঘটেছে, তা হাজারবার বললেও ভুল হওয়ার কথা নয়। মিস্টার রোজার, আপনার দুশ্চিন্তার কোন কারণ আছে বলে আমি মনে করি না। আপনি একটা দুর্ঘটনার শিকার মাত্র। পুলিশও নিশ্চয় বুঝতে পারছে। আপনার জায়গায় অন্য কোন গার্ড থাকলেও একই ব্যাপার ঘটতে পারত। ডাকাতেরা যে মারধর করেনি, এইই বেশি।'

'না, তা করেনি। বরং বলা যায় ভদ্র ব্যবহারই করেছে। বিশেষ করে যে লোকটা কথা বলছিল।'

কান খাড়া করে ফেলল কিশোর। 'কথা কি শুধু একজনই বলেছে?'

'হ্যাঁ, ঝাড়ুদারের ছদ্মবেশে যে এসেছিল।'

'সব কথা? আর কেউ কিছু বলেনি?'

'না, কিচ্ছু বলেনি।'

'পুরো একটা রাত তিনজন লোকের সঙ্গে কাটালেন, দু'জন কোন কথাই বলল না?'

'না।'

'একটা বর্ণও না?'

'না। তুমি বলায় এখন আমার কাছেও অদ্ভুত মনে হচ্ছে ব্যাপারটা।'

'হুম্‌ম্‌। ডাকাতদের কেউ কি মেয়েলোক ছিল? বোঝা গেছে?'

'মেয়েলোক! তা হতেও পারে। তিনজনেই প্রায় একই রকম লম্বা। পাঁচ ফুট সাতের মত। ঢোলা শার্ট আর ওভারঅল পরে এসেছিল। হাতে গ্লাভস। মুখে এত কিছু লাগিয়েছিল, কে যে পুরুষ আর কে মেয়ে বোঝাই যায়নি। দু'জন পরেছিল সানগ্লাস, আয়নার মত কাচ, চোখ দেখা যায়নি। একজনের দাড়ি ছিল, আমার মনে হয় নকল। আরেকজনের লাল পরচুলা, লাল গোঁফ। ভুরু এত মোটা, প্রায় চোখের ওপর এসে ঝুলে পড়েছিল।'

'যে কথা বলছে তার কথায় বিদেশী টান ছিল? বয়েস কম, না বেশি?'

'বুড়ো মানুষের গলা নকল করছিল। আমার বিশ্বাস, সে অল্পবয়েসী। বিশ-তিরিশের বেশি না। না, কথায় টান ছিল না।'

আবার 'হুম্‌ম্‌'! বলে চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবল কিশোর। তারপর বলল, 'মিস্টার রোজার, আপনি নিকারো অ্যাণ্ড কোম্পানিটা চেনেন? ফিশিং কোম্পানি। বোটও ভাড়া দেয়। ম্যালিবুর পরে ওদের ডক।'

'চিনি। আমার ছেলেকে নিয়ে মাঝে মাঝে মাছ ধরতে যেতাম, তখনও সে বিয়ে করেনি। মিসেস নিকারোকেও চিনি। এককালে সুন্দরী ছিল মহিলা। তার ছেলের বৌ এলসিকেও চিনি। মেয়েটা আইরিশ। সে-ও সুন্দরী। খুব অল্পবয়েসে স্বামী মারা গেছে। বোট অ্যাক্সিডেন্ট। সেদিন এলসিই বোট চালাচ্ছিল। লাইসেন্স আছে তার।'

'ওদের ওখানে বিল নামে একটা লোক কাজ করে।'

'করে নাকি? আমরা যখন যেতাম, তখন ওই নামে কেউ ছিল না। জিম না কি যেন, এরকমই নাম ছিল একটা ছোকরার। ঘন ঘন লোক বদলায় হয়ত ওরা।'

'ইদানীং কখনও গিয়েছেন?'

'না।'

'তাহলে বিলকে চিনবেন না। অন্ধের ব্যাপারে কিছু জানেন?'

'অন্ধ?' শূন্য দৃষ্টি ফুটল রোজারের চোখে। 'লোক?'

'হ্যাঁ। ডাকাতরা যখন ঢোকে, ওকেও দেখা গেছে ব্যাংকের কাছাকাছি। গালে কাটা দাগ। চোখে কালো চশমা। লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এসেছিল।'

মাথা নাড়ল রোজার। 'বলতে পারব না।'

'আজ সকালে একটা মেয়েকে দেখলাম, আপনি যখন তাস খেলা দেখছিলেন? মেয়েটা কে?'

'সিনথিয়া ব্যানালিস? তুমি জানলে কি করে?'

'আপনার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি।'

'কি হয়েছে তাতে? একটা মেয়ের বয়েসী মেয়ে কি কোন বুড়োর সঙ্গে কথা বলতে পারে না?'

'পারে, আমি সেকথা বলছি না। গোয়েন্দাদের কোন কিছুই উপেক্ষা করতে নেই। সিনথিয়ার সঙ্গে আপনার কেমন পরিচয়?'

'দেখা হলে কথা বলি। সময় পেলেই কুকুর নিয়ে বেরোয়, হাঁটাহাঁটি করে। মনে হয় কোন সিনেমা কোম্পানিতে কাজ করে। ভাল মেয়ে। দেখা হলে দাঁড়াবেই। দু'চারটা কথা না বলে যাবে না।'

'আপনি ব্যাংকে চাকরি করেন, একথা জানে?'

'কি জানি। বলেও থাকতে পারি। কোন তথ্য জানতে চেয়েছে কিনা এটাই তো জানতে চাইছ? চায়নি। জাস্ট কথা বলে।'

'অ। তা আরও বন্ধু নিশ্চয় আছে আপনার। তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন? ব্যাংকের কাজকর্ম সম্পর্কে?'

'করি। তবে কেউ এ নিয়ে ইন্টারেস্টেড হয়েছে বলে মনে করতে পারছি না।'

'রক রেনাল্ড?'

'ও নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত, এসব ফালতু আলোচনার সময় কই? বাইরে বাইরেই থাকে বেশি। এখানে যখন থাকে, তখনও কথা বিশেষ হয় না। খাওয়ার সময় খায়, বাকি সময় ঘরে দরজা আটকে বসে থাকে। মিথ্যে কথা বলছি না। ওর দরজার তালা দেখবে?'

'দরকার নেই,' উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'হতাশ হবেন না, মিস্টার রোজার। পুলিশ ঘন ঘন আসে, বার বার একই কথা জিজ্ঞেস করে, তার কারণ, ওদের ধারণা আপনি কোন জরুরি তথ্য জানাতে ভুলে যাচ্ছেন। কয়েক বার বললে হয়ত মনে পড়বে, এই আরকি।'

জবাব দিল না রোজার।

সাড়ে চারটা নাগাদ ইয়ার্ডে ফিরে এল কিশোর। গেট দিয়ে না ঢুকে চলে এল বেড়ার পেছনে, যেখানে ছবিতে আঁকা একটা মাছ মাথা তুলে একটা জাহাজকে দেখছে। মাছের চোখ টিপল সে। ওপরে উঠে গেল দুটো বোর্ড। বেরিয়ে পড়ল প্রবেশ পথ, তিন গোয়েন্দার কয়েকটা গোপন পথের একটা। এটার নাম সবুজ

ফটক এক।

ওখান দিয়ে ঢুকে আউটডোর ওঅর্কশপে এসে ঢুকল কিশোর। মুসার সাইকেলটা আছে। মুচকি হেসে নামিয়ে দিল আবার বোর্ড দুটো।

এই সময় কানে এল শব্দটা। কাপড়ের মৃদু খসখস আর নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ।

ঝট করে ফিরে তাকাল সে।

দাঁড়িয়ে রয়েছে অন্ধ ভিক্ষুক! মাথা সামান্য কাত করে রেখেছে, গালের কাটা দাগটা কিশোরের দিকে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি এখন নেই। লাঠিও নেই হাতে। কাটা দাগের কারণে ভয়ঙ্কর লাগছে মুখটা।

একটা হার্টবিট মিস হয়ে গেল কিশোরের। তারই মত লোকটাও স্থির হয়ে আছে। শ্বাস টানল কিশোর, নড়ে উঠল লোকটা। আরেকটু কাত করল মাথা, চমকে গেছে বোঝা যায়। হাতে কি যেন আছে, তার ওপর আঙুলগুলো শক্ত হল।

হঠাৎ মাইকেলের হ্যাণ্ডেল ছেড়ে দিয়ে ঝাঁপ দিল কিশোর। চেপে ধরল লোকটার হাত।

চেঁচিয়ে উঠে ঝাড়া মেরে হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করল লোকটা।

ছাড়ল না কিশোর, প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছে। কব্জিতে মোচড় দিতে লাগল দু'হাতে। লোকটার আঙুল খুলে গেল, মাটিতে পড়ে গেল হাতের জিনিস।

গায়ের জোরে ঝাড়া দিয়ে হাত ছাড়াল লোকটা। তারপর হামলা চালাল। প্রচণ্ড ঘুসি এসে লাগল কিশোরের চোয়ালে। চোখে সর্ষে ফুল দেখল সে। বোঁ করে চক্কর দিয়ে উঠল মাথা। অবশ হয়ে গেল দেহ।

খুব সামান্য সময়ের জন্যে জ্ঞান হারাল কিশোর। চোখ মেলে দেখল, তাকে ডিঙিয়ে যাচ্ছে লোকটা। পৌঁছে গেল সবুজ ফটক এক-এর কাছে। ওপরে উঠল বোর্ড দুটো, আবার নামল। বেরিয়ে গেছে অন্ধ ভিক্ষুক।

বারো

মাটিতে বসে আছে কিশোর। অল্প অল্প মাথা ঘুরছে এখনও। দৃষ্টি পরিষ্কার হতেই লোকটার ফেলে যাওয়া জিনিসটার ওপর চোখ পড়ল। ওঅর্কবেঞ্চের নিচে। প্লাস্টিকের বাক্স, একপাশে কিছু ছিদ্র।

'ইনটারেসটিং,' বলল সে। যেন তার কথার জবাবেই দুই সুড়ঙ্গের ঢাকনা সরিয়ে উঁকি দিল মুসা। জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার? কি বলছ?'

'মেহমান এসেছিল,' বলে হামাগুড়ি দিয়ে চলে এল জিনিসটা তোলার জন্যে।

হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে বলল, 'কোন ধরনের শ্রবণ যন্ত্র। একধরনের খুদে মইক্রোফোন, স্পাইরা বলে বাগ। পত্রিকায় ছবি দেখেছি। অন্ধ লোকটা এসেছিল, বুঝলে, মোটেই অন্ধের মত আচরণ করেনি। মনে হয় ওঅর্কশপে মাইক্রোফোন লাগানোর জন্যে এসেছিল।'

'কানা ফকিরটা?' কিশোরের হাত থেকে যন্ত্রটা নিয়ে দেখতে লাগল মুসা। 'কেন লাগাবে? আমাদের খোঁজই বা পেল কিভাবে?' চারপাশে তাকাল সে, যেন এখনও এখানেই কোথাও লুকিয়ে রয়েছে লোকটা। 'আশ্চর্য!'

ওঅর্কবেঞ্চের কাছে চেয়ারে বসল কিশোর। মুসার হাত থেকে যন্ত্রটা নিয়ে পেননাইফ দিয়ে খুলল। 'যা বলেছি। মিনিয়েচার ব্রডকাস্টিং ইউনিট। রেঞ্জ বড় জোর কোয়ার্টার মাইল।'

'এখন চালু নেই তো? আমরা যা বলছি, সব শুনে ফেলছে না তো ব্যাটা?'

ছুরির মাথা দিয়ে খুঁচিয়ে ছোট ছোট কয়েকটা পার্টস খুলে ফেলল কিশোর। বাক্সটা বন্ধ করতে করতে বলল, 'এবার পারলে শুনুক।' পুরো এক মিনিট নীরবে ভাবল সে, তারপর মুসার দিকে তাকাল। 'স্যালভিজ ইয়ার্ডে কতক্ষণ আগে ঢুকেছ?'

'মিনিট বিশেক।'

'সবুজ ফটক এক দিয়ে?'

'হ্যাঁ।'

গম্ভীর হয়ে গেল কিশোর। 'তোমার পিছে পিছেই এসেছে ব্যাটা। মনে হল।'

'কি করে?'

'কাল রাতে মীটিঙেই হয়ত তোমার ওপর নজর পড়েছে। অনুসরণ করে এসেছে এখানে। কিংবা আমাদের দু'জনকেই দেখেছে নিকারোদের ওখানে। কিংবা তিনজনকে, মিস্টার রোজারের বাড়িতে। যেভাবেই হোক, গত তিন দিনে কোন এক সময় তার চোখে পড়েছি আমরা, বা আমাদের কেউ। ভাবছি, আর একআধটা বাগ লুকিয়ে রেখে যায়নি তো?'

আবার চারপাশে তাকাল মুসা, যেন তাকালেই যন্ত্রটা চোখে পড়বে। তারপর খুঁজতে শুরু করল দু'জনে। পাওয়া গেল না। জিনিস নড়াচড়া করা হয়েছে, এমন কোন চিহ্নও নেই। আগের মতই আছে ওঅর্কশপকে ঘিরে রাখা জঞ্জাল।

অস্বস্তিতে পড়ে গেছে মুসা। 'বাড়ি থেকে এসেছি আমি। আমাকে অনুসরণ করলে···আচ্ছা, আমাদের বাড়ির ওপর চোখ রাখেনি তো?'

'মনে হয় না। ইয়ার্ডের ওপর চোখ রাখলেই যথেষ্ট।'

হাতুড়ি আর পেরেক বের করে সবুজ ফটক এক-এর বোর্ড দুটো

সাময়িকভাবে আটকে দিতে চলল কিশোর। এই সময় এল রবিন। তিনজনে মিলে আটকে দিল ফটকটা। তারপর হেডকোয়ার্টারে ঢুকল।

'ইন্টারেস্টিং নিউজ আছে,' রবিন বলল। 'বিল এসেছিল সিনথিয়ার সঙ্গে দেখা করতে। চেহারা দেখে চিনেছি, তোমার বর্ণনার সাথে মিলে যায়। পুলের পাড়ে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ চেঁচাল দু'জনে, তর্কাতর্কি করল। স্প্যানিশ ভাষায়।'

'ঠিক?' ভুরু কোঁচকাল মুসা।

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'বেশি চেঁচাল মেয়েটাই। কিছু একটা বোঝানোর চেষ্টা করেছে বিল, শুনতে চায়নি সিনথিয়া। শেষে লোকটাও গেল রেগে। চেঁচামেচি শুনে পাশের বাড়ির এক মহিলা বেরোল, গলিতে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনল খানিকক্ষণ। তারপর পুলিশ ডাকার হুমকি দিল।

'আর থাকতে সাহস করল না লোকটা। সে চলে যেতেই ঘরে ঢুকে হ্যাণ্ডব্যাগ নিয়ে এল সিনথিয়া। কয়েক মিনিট পরে দেখলাম একটা গাড়ি চালিয়ে চলে যাচ্ছে। আরও আধ ঘন্টা দাঁড়িয়ে রইলাম। আসছে না দেখে চলে এসেছি।'

'হুঁম্‌ম্‌!' মাথা দোলাল কিশোর। 'কি নিয়ে ঝগড়া করল কে জানে। যাকগে। এখন দেখি, আমরা কতটা এগিয়েছি?' টেবিলে কনুই রেখে সামনে ঝুঁকল সে। অন্ধ ফকির ডাকাতিতে জড়িত, এটা বলা যায় এখন। বিল জড়িত, তার দুই বন্ধু জড়িত। বিল আর মিস্টার রোজারের সঙ্গে যোগাযোগ আছে সিনথিয়ার। যেহেতু সে মেকাপ আর্টিস্ট, সন্দেহ করতে বাধা কোথায় সে-ই মেকাপ করে কাউকে অ্যাল্‌ট্রানটো বানিয়েছে? সে নিজেও পুরুষ সেজে ডাকাতিতে গিয়ে থাকতে পারে। রোজার বলেছে, তিনজন ডাকাতের মাত্র একজন কথা বলেছে, অন্য দু'জন কিছুই বলেনি।'

'মেয়েলি গলা চিনে যাবে, এই ভয়ে?' মুসার প্রশ্ন।

'হতে পারে। কিংবা ওরা ইংরেজি জানে না। স্প্যানিশ বললে ধরা পড়ার ভয় আছে। হয়ত মেসা ডি'ওরোর নাগরিক ওরা।'

'বিলের দুই বন্ধুও হতে পারে,' বলল মুসা। 'কোত্থেকে এসেছে ওরা, বলতে পারব না। স্প্যানিশ বলেছিল। হয়ত ইংরেজি জানেই না।'

'বিল জানে। দুটো ভাষাই জানে চমৎকার। ওদের সম্পর্কে ভালমত খোঁজখবর করা দরকার। রবিন, নিকারোদের ওখানে এখন একমাত্র তোমাকেই কেউ চেনে না। জেটির কাছে গিয়ে চোখ রাখবে। পারবে তো?'

'পারব।'

'আমি যাব সিনথিয়াদের ওখানে। মুসা, তুমি হেডকোয়ার্টারেই থাক। কানাটা আবার আসতে পারে। নাম তো জানি না ব্যাটার, কানা না হলেও কানা বলতে

হচ্ছে।'

'গালকাটাও বলা যায়,' মুসা বলল। 'যদিও সত্যি কাটা কিনা বলা মুশকিল। এলে কি করব? পুলিশকে ফোন করব?'

'পারলে অবশ্যই করবে। খুব সাবধানে থাকবে। আমাদের ঠিকানা জেনে গেছে সে। হয়ত জানে, কিংবা আন্দাজ করেছে আমরা কি করছি। একবার পালিয়েছে বটে, আবার না-ও পালাতে পারে। বাগের বদলে বোমা ফেলে গেলে সর্বনাশ!'

তেরো

'মজার কাজ করছেন,' রবিন বলল।

জেটির কিনারে দাঁড়িয়ে আছে সে। শুক্রবারের সকাল। জোয়ার নেমে গেছে। বিল রয়েছে টিনার ডেকে, হুইলহাউসের দেয়াল রঙ করছে। জবাব দিল না লোকটা। এমনকি মুখ তুলেও তাকাল না।

'গত বছর আমাদের বাড়ি রঙ করা হয়েছিল,' আবার বলল রবিন। 'মিস্ত্রিদের সাহায্য করেছিলাম। জানালার চৌকাঠগুলো রঙ করেছিলাম আমি।'

ফিরে তাকাল বিল। হাতের ব্রাশের দিকে তাকাল একবার। হুইল হাউসের কাছ থেকে সরে এসে ওটা বাড়িয়ে দিল রবিনের দিকে।

লাফ দিয়ে ডেকে উঠল রবিন। হেসে ব্রাশটা নিয়ে রঙ শুরু করল। তার কাজ দেখছে বিল।

কয়েক মিনিট নীরবে ব্রাশ ঘষল রবিন। তারপর বলল, 'বাহ্, বোটে রঙ করা তো আরও মজার।'

ঘোঁৎ করল শুধু বিল।

'একবার বোটে করে বেড়াতে গিয়েছিলাম,' রবিন বলল। 'বন্ধুর চাচার সঙ্গে। কি যে দারুণ লাগছিল না। হঠাৎ ঝড় এসে সব মজা নষ্ট করল।' বানিয়ে বানিয়ে সমুদ্র যাত্রার রোমাঞ্চকর এক গল্প বলতে লাগল সে। বিল না হাসা পর্যন্ত বলেই গেল।

'হ্যাঁ, একে বলে সী-সিকনেস,' বলল বিল। 'বমি আর পেসাব-পায়খানা করে সব নষ্ট করে ফেলে। আমার অবশ্য কখনও ওরকম হয়নি।'

বিলও একটা ভয়াবহ ঝড়ের গল্প শোনাল। শুনে অবাক হওয়ার ভান করল রবিন। যেন সমুদ্র সম্পর্কে কোন জ্ঞানই নেই এমন ভাব করে নানারকম প্রশ্ন করল। কিন্তু দরকারি কিছু জানার আগেই জেটিতে এসে দাঁড়াল দু'জন লোক।

স্প্যানিশ ভাষায় ডাকল। ফিরে তাকাল বিল। রবিনের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে একজন ইশারা করল বিলকে, নেমে গেল সে। হাঁটতে হাঁটতে দূরে চলে গেল।

কথা বলছে তিনজনে। এতদূর থেকে শোনা যায় না। কিন্তু ওদের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করল রবিন। হাত তুলে তীরের দিকে দেখাল একজন। আরেকজন দেখাল উত্তরে, যেন বোঝাচ্ছে ওদিক থেকে উপকূল ধরে কিছু আসছে। শ্রাগ করল বিল। হাত তুলে ঝাঁকাল একজন। অন্যজন ঘড়ি দেখিয়ে জরুরি কিছু বলল বিলকে।

অবশেষে ঘুরে দাঁড়াল বিল। অন্য দু'জন হাঁটতে লাগল পুরানো একটা ছোট কেবিনের দিকে। রবিন অনুমান করল, ওরাই বিলের রুমমেট।

রবিনের কাজের প্রশংসা করল বিল।

'দারুণ স্প্যানিশ বলেন তো আপনি,' রবিন বলল। 'আপনার বন্ধুরাও।'

'আমার সেকেণ্ড ল্যাংগুয়েজ। আমার বন্ধুরা এসেছে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে, ভাল ইংরেজি বলতে পারে না। তাই ওদের সঙ্গে স্প্যানিশই বলতে হয়।'

পার্কিং লটের কাছে বাড়িটা থেকে মিসেস নিকারোকে বেরোতে দেখল রবিন। হাতের ট্রেতে একটা থার্মোস জগ আর কয়েকটা কাপ। বাড়ি আর ছোট অফিসটার মাঝামাঝি পৌছে এদিকে ফিরে তাকাল মহিলা। রবিনের হাতে ব্রাশ দেখেই বুঝে থমকে দাঁড়াল এক মুহূর্ত। প্রায় তিরিশ মিটার দূর থেকেও মহিলার চেহারার উত্তেজনা নজর এড়াল না রবিনের।

কয়েক সেকেণ্ড পর গিয়ে অফিসে ঢুকল মিসেস নিকারো। একটু পরেই অফিস থেকে বেরিয়ে জেটির দিকে এগিয়ে এল এলসি। গায়ে নীল ওঅর্ক শার্ট, গলার কাছটায় খোলা। একটা নীল-সাদা রুমাল বাঁধা গলায়। পরনে রঙচটা জিনস, পায়ে মলিন স্নিকার। রেগে আছে মনে হল।

'রঙ তো তোমার করার কথা,' কাছে এসে বলল এলসি। গলা চড়াল না বটে, তবে কণ্ঠে ঝাঁঝ ঠিকই প্রকাশ পেল।

'ছেলেটা সাহায্য করতে চাইল, তাই,' মিনমিন করে বলল বিল। 'রঙ করতে নাকি ভাল লাগে।'

'ঠিকই, ম্যাডাম, খুব ভাল লাগে আমার।'

'বেশ, যা করেছ করেছ, বাকিটা বিল করবে। আমার শাশুড়ি দেখা করতে বলেছে তোমাকে।'

'আমাকে?' নিজের বুকে হাত রাখল রবিন।

'অফিসে আছে,' অফিসটা দেখাল এলসি। 'তোমাকে ডেকে নিয়ে যেতে বলল। ব্রাশটা দিয়ে চলে এস। বিল, শোন, বেশি দেরি কর না। লারমারদের ওখানে গিয়ে তেল আনতে হবে আমাদের। তেতাল্লিশজন লোক আসবে কাল

সকালে, সাতটায়। সময় বেশি নেই হাতে। সব রেডি রাখতে হবে।'

'আচ্ছা,' বলে জোরে জোরে ব্রাশ ঘষতে আরম্ভ করল বিল।

হাসল রবিন। বুঝল, আদেশ দিতে এবং সেটা মানাতে পছন্দ করে এলসি নিকারো। আগে আগে প্রায় লাফাতে লাফাতে চলল সে, হাঁটার তালে তালে নাচছে লাল চুল। পিছে চলল রবিন। ওরা ঢোকার আগেই দরজায় এসে দাঁড়াল মিসেস নিকারো।

'বাড়িতে যাচ্ছি,' বউকে বলল মহিলা। রবিনের দিকে ইশারা করে বলল, 'ইয়াং ম্যান, তুমি এস আমার সঙ্গে।'

চলল রবিন। অবাক হয়ে ভাবছে, ঘটনাটা কি? লিভিং রুমে নিয়ে এল তাকে মহিলা। বিদেশী গন্ধ যেন সব কিছুতেই লেগে রয়েছে, এমনকি পিঠ উঁচু আর্মচেয়ার আর লম্বা, বিচ্ছিরি দেখতে সোফাগুলোতেও।

'বস,' একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল মহিলা।

দু'জনেই বসল। মিসেস নিকারোর পরনে কালো পোশাক। কোলের ওপর ভাঁজ করে রাখল হাত। রবিনের দিকে তাকাল। চোখের সে-তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সইতে পারল না রবিন, মুখ ফেরাল।

'তোমাকে আগে দেখেছি,' মহিলা বলল।

'আ-আমার মনে হয় না।'

'না হলে কি হবে, আমি দেখেছি। স্বপ্নে। বাস্তবে দেখব ভাবিনি।'

জবাব আশা করছে মিসেস নিকারো। কিন্তু কি জবাব দেবে রবিন? কথা হারিয়ে ফেলেছে যেন। খানিক পর জোর করে মুখ দিয়ে যা বের করল, সেটা কাশি আর কোলাব্যাঙের ঘড়ঘড়ানির মিশ্রণ। কেশে গলা পরিষ্কার করে বলল, 'আমি...আমি শুধু সাহায্য করছিলাম...আগে আর কক্ষণও এখানে আসিনি...।' থেমে গেল সে। মিসেস নিকারো ভুল করছে, একথা প্রমাণ করে তার মনে কষ্ট দেয়ার ইচ্ছে নেই রবিনের কিন্তু মহিলা ভয় পাইয়ে দিয়েছে তাকে। বিশ্বের এই আধুনিকতম শহরে এই শতাব্দিতে যেন মানায় না মহিলাকে। তার জন্মানো উচিত ছিল পৌরাণিক আমলে, গুহায় বসে লোকের ভূত-ভবিষ্যৎ বলত আর তাদেরকে হুঁশিয়ার করত।

ঘরটা গরম। তবু শীত শীত লাগল রবিনের।

হাত কোলের ওপর রেখেই সামনে ঝুঁকল মহিলা। মুখে বয়েসের ভাঁজগুলো স্পষ্ট হল আরও। 'এখানে থাকার কথা নয় তোমার। নিশ্চয় কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছ। সেটা কী?'

'কো-কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নয়,' জোরে কথা বলতে ভয় পাচ্ছে রবিন।

'এমনি…এমনি এসেছি…সময় কাটাতে…।' চোখ সরিয়ে নিল আরেকদিকে। ভয়, মহিলা তার মনের কথা পড়ে ফেলবে।

'বিপদের মধ্যে রয়েছ তুমি। চলে যাও। আর কখনও এখানে আসবে না। আমার কথা না শুনলে বড় বিপদে পড়বে। সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটবে। আমার স্বপ্নে ভয়াবহ ঝড়ের মধ্যে দেখেছি তোমাকে। প্রচণ্ড শব্দ হল। ঝড়ের কেন্দ্র থেকে নিচে পড়তে লাগলে তুমি, নিচে, নিচে, আরও নিচে…ফাঁক হয়ে গেল ধরণী, তলিয়ে গেলে তুমি…।'

হাত কাঁপছে রবিনের। শান্ত করার চেষ্টা করল। কিশোরের মুখে শুনেছে, মহিলার স্বপ্ন নাকি ফলে যায়। কিশোরও অবশ্য শুনেছে অন্যের মুখে। ধরণী ফাঁক হয়ে গেল বলে কি বোঝাতে চাইল? ভূমিকম্প? তাহলে আর হুঁশিয়ার করে লাভ কি? শুধু জেটিতে না এলেই কি ভূমিকম্প থেকে বেঁচে যাবে রবিন?

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল মহিলা, যেন ফুঁসে উঠল একটা সাপ। 'নিশ্চয় ভাবছ আমি পাগল। তোমাকে বলা হয়ত উচিত হয়নি। ফিরে গিয়ে ছেলেমেয়ের দল নিয়ে আসবে হয়ত, পাগলি বুড়ি, ডাইনী বুড়ি, ইটালিয়ান ভূত বলে খেপাবে আমাকে। কিন্তু সত্যি বলছি, তোমাকে স্বপ্নে দেখেছি আমি। তোমার মৃত্যুর সময় ওখানে হাজির ছিলাম!'

সামনের দরজা খুলে গেল। ঘরে ঢুকল এক ঝলক বিশুদ্ধ হাওয়া। কাছে এসে দু'জনের মুখের দিকে তাকাল এলসি। জোর করে হাসল। 'কি ব্যাপার? নিশ্চয় আরেকটা দুঃস্বপ্ন, নাকি?'

'যদি হয়, কি করবে?' ভুরু কোঁচকাল বৃদ্ধা। রবিনের হাঁটু ছুঁল। 'আমি বুঝেছি, এই ছেলেটা ভাল, পরিশ্রমী। সেজন্যেই চলে যেতে বলছি। ওর ভাল চাইছি বলে। নইলে আমার কি ঠেকা?' উঠে দাঁড়াল মিসেস নিকারো। 'যাই। অনেক কাজ। বিকেলেই মেহমান আসছে। সব কিছু গুছিয়ে রাখতে না পারলে…।'

তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল মিসেস নিকারো।

'তোমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো?' এলসি জিজ্ঞেস করল।

'না না, ঠিক আছি। থ্যাংক ইউ।'

ঘরটা আর সহ্য করতে পারছে না রবিন। মনে হল, তার গায়ের চামড়ায় কিলবিল করছে হাজারখানেক শুঁয়োপোকা। দমকা হাওয়ার মত ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে।

চোদ্দ

সৈকত ধরে এগিয়ে আসছে বিলের দুই বন্ধু। এখনও হুইলহাউস রঙ করায় ব্যস্ত বিল। বিশ মিনিট আগে সব কিছু যেমন দেখে গিয়েছিল রবিন, তেমনি রয়েছে, শুধু বদলে গছে তার মন। বিপদ আসছে! হুঁশিয়ার করে দিয়েছে তাকে মিসেস নিকারো।

হাইওয়ের একশো মিটার ভাটিতে একটা খুদে শপিং প্লাজা। একটা ছোট মার্কেট, একটা ধোবাখানা আর একটা রীয়্যাল-এস্টেট অফিসও দেখতে পেল রবিন। মার্কেটের সামনে টেলিফোন বুদ। গিয়ে তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টারে ফোন করল সে।

সঙ্গে সঙ্গে ধরল মুসা। রবিনের গলা শুনে বলল, 'ভাল আছ?'

'ভালই। মিসেস নিকারোর সঙ্গে কথা হয়েছে আমার,' সব খুলে বলল রবিন।

দীর্ঘ এক মুহূর্ত নীরবতা। তারপর মুসা বলল, 'রবিন, ব্যাপার সুবিধের মনে হচ্ছে না। তুমি চলে এস। একা আসতে পারবে? না আমি আসব?'

'দরকার নেই। স্বপ্ন স্বপ্নই,' মুসাকে নয়, নিজেকে বোঝাল রবিন।

'আসবে না? খুব সাবধানে থাকবে তাহলে, বুঝেছ?'

'থাকব। এখন আসা ঠিক হবে না। কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে এখানে। বিলের দুই দোস্তের কথা মনে আছে না? ওরা ঘোরাঘুরি করছে ডকের কাছে। কোন কারণে উত্তেজিত।'

হাইওয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল একটা পিকআপ ট্রাক। নিকারোদের ড্রাইভওয়ে ধরে গিয়ে থামল পার্কিং লটে। খাকি পোশাক পরা লম্বা এক লোক নেমে এগিয়ে গেল জেটির দিকে।

'ফোনের কাছে থাক,' বলে লাইন কেটে দিল রবিন।

হাইওয়ের ধারে গাড়ি জমছে—ক্যাম্পারদের ভ্যান, কার এ-সবই বেশি। ওগুলোকে এক পাশে, জেটিকে অন্য পাশে রেখে মাঝখান দিয়ে এগোল রবিন।

টিনার কাছে দাঁড়িয়ে আছে বিলের দুই বন্ধু। ওদের কাছে এগিয়ে গেল লম্বা লোকটা। ওদের কথা শোনার জন্যে থামল রবিন। রেগে গেছে বিল, তার হাত নাড়া দেখেই বোঝা যায়।

একটা ভ্যানের পাশ ঘুরে বালিতে নামল রবিন, সৈকত ধরে এগোল জেটির দিকে। চলে এল একটা খিলানের নিচে, খেয়াল করল না লোকগুলো। খিলানের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে তার সাইকেল। সেদিকে একবার তাকিয়েই হাঁটা দিল পানির

দিকে।

পানির কিনারে পৌঁছে থামল। কান পাতল কথা শোনার জন্যে। চারজনের গলাই শুনতে পাচ্ছে, বুঝতে পারল না কিছু। এখনও অনেক দূরে। ওদের কথার চেয়ে ঢেউ ভাঙার শব্দ এখানে জোরাল।

ভ্রূকুটি করল রবিন। কাছে গিয়ে কি কোন লাভ হবে? ওরা স্প্যানিশ বললে কিছু বুঝতে পারবে না সে।

জেটিতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। এগিয়ে আসছে লোকগুলো। হাঁটছে, কথা বলার জন্যে থামছে। বলা শেষ করে আবার হাঁটছে। কাছে, আরও কাছে, একেবারে রবিনের মাথার ওপরে চলে এল ওরা। জেটির নিচ দিয়ে ওদেরকে অনুসরণ করে চলল সে। বালিতে হাঁটছে, ফলে পায়ের শব্দ হচ্ছে না তার।

'ওকে, মাইস,' বিলের গলা। দাঁড়িয়ে পড়েছে। 'বুঝলাম। টাকা না দেখে কিছু করবে না তুমি। আমরাও মাল দেখতে চাই। ভাল হতে হবে।'

'গুড,' নিশ্চয় মাইস, কারণ কথায় কোনরকম টান নেই। 'কিন্তু তোমরা কি পারবে? দেখে তো মনে হচ্ছে না। তোমাদের সঙ্গে কথাই বা বলছি কেন? আমি জিনোর সঙ্গে দেখা করতে চাই। লেনদেনটা তার সঙ্গে হওয়াই বোধহয় ভাল।'

'আমি জিনোর প্রতিনিধি,' বিল বলল। 'বেশ, কিছু অগ্রিমের ব্যবস্থা নাহয় করি।'

'কর। কত দেবে।'

'চার ভাগের এক ভাগ। মাল বুঝে পেয়ে তারপর বাকিটা দেব।'

'অর্ধেক অগ্রিম,' ভোঁতা গলায় বলল মাইস। বদলে গেছে কণ্ঠস্বর। 'বাকিটা নেব মাল ডেলিভারি দিয়ে। নো অগ্রিম, নো মাল। তোমাদের কাছে বেচার এত ঠেকা নেই আমার, ভাল করেই জান। কেনার অনেক মক্কেল আছে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। অবশেষে বিল বলল, 'বেশ, অর্ধেকই দেব। কিন্তু বাকি টাকা পাবে মাল আমাদের হাতে আসার পর। প্যাসিফিক স্টেটসে চলে যাও, ওখানেই থাকবে। টাকা জোগাড় করেই খবর দেব।'

'এখানে থাকলে ক্ষতি কি? এসব ছোটাছুটি ভাল্লাগছে না আমার।'

'অসুবিধে আছে। টাকা জোগাড় করতে সময় লাগবে। মিসেস নিকারোও পছন্দ করবে না তোমার সঙ্গে আমাকে দেখলে। তার ধারণা, আমি খালি কাজে ফাঁকি দেয়ার তালে থাকি। যা বলছি তা-ই কর।'

আবার চুপচাপ। রবিন অনুমান করল, অফিসের দিকে তাকিয়ে আছে মাইস। আর কোন সন্দেহ নেই, অফিস থেকে তার ওপর নজর রাখছে এলসি নিকারো।

'ঠিক আছে,' রাজি হল মাইস। 'এখানে আসাটাই বোধহয় উচিত হয়নি

আমার। আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব। বেশি দেরি করবে না, তাহলে পস্তাবে। আমার চেয়ে তোমাদের ঠেকা বেশি, মনে রাখবে কথাটা।'

চলে গেল মাইস। কথা শুরু করল বিল আর তার দুই বন্ধু। এবার ইংরেজি নয়, স্প্যানিশ। বোধহয় মাইসের সঙ্গে কি কথা হয়েছে, সেটাই বলছে বিল। শুনে রেগে গেল দুই বন্ধু, তাদের কণ্ঠস্বরেই বোঝা গেল।

হালকা পদশব্দ শোনা গেল। 'কে ওই লোকটা?' কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল এলসি।

'ওই একটা ফিশিং ক্লাবের মালিক,' জবাব দিল বিল। 'রাস্তা থেকে নাকি বোটটা দেখেছে, টিনাকে। জানতে চাইল ভাড়া পাওয়া যাবে কিনা।'

'এরপর কেউ বোট ভাড়া চাইতে এলে সোজা আমার কাছে পাঠাবে।'

'আচ্ছা।'

'যাও, লাঞ্চ সেরে এস। একটার মধ্যে আসবে। তারপর পেট্রল আনতে যাব। আর তোমার দুই দোস্তকে ঘরে থাকতে বলবে, বুঝেছ? সারাক্ষণ এখানে ঘুরঘুর করে কেন? যত্তোসব!'

'আচ্ছা, বলব।'

ওরা চলে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল রবিন। ভাবছে, প্যাসিফিক স্টেটসটা কোথায়? শহর? নামও শোনেনি কোনদিন। আবার এসে টেলিফোন বুদে ঢুকল সে। ডিরেক্টরিতে ওরকম কোন শহরের নাম খুঁজে পেল না। তবে 'পি'-এর সারিতে পাওয়া গেল একটা কোম্পানির নাম, প্যাসিফিক স্টেটস মুভিং অ্যাণ্ড স্টোরেজ কোম্পানি, অক্সনার্ডের ওয়েস্ট অ্যালবার্ট রোড-এ। ওই নাম্বারে ফোন করে মিস্টার মাইসকে চাইল।

একটা লোক জানাল, 'তিনি নেই এখন। এলে কিছু বলব?'

'না। আবার ফোন করব আমি।'

লাইন কেটে দিল রবিন। হেডকোয়ার্টারে করতে যাবে, এই সময় দেখল মার্কেট থেকে বেরিয়ে আসছে একটা লোক। গাড়ির দিকে এগোচ্ছে। বুদ থেকে বেরিয়ে তাড়াহুড়ো করে ওর দিকে এগোল রবিন।

'আরে, রবিন, এখানে কি?'

লোকটা রবিনদের প্রতিবেশী, ওদের বাড়ির উল্টোদিকে থাকে, রাস্তার অন্যপাড়ে, মিস্টার ওয়াগনার। 'এই এমনি এলাম,' জবাব দিল রবিন। 'মাছধরা দেখতে। আগামী হপ্তায় ভাবছি আমিও আসব ধরতে, বাবার সঙ্গে।'

'অ,' চারপাশে তাকাল ওয়াগনার। 'সাইকেল এনেছ?'

মাথা নাড়ল রবিন। 'না। এক বন্ধু লিফট দিয়েছে।' প্রয়োজনের সময়

কিশোরের মত মিথ্যে বলতে পারে না সে, তবু চেষ্টা করে মাঝে মাঝে। গোয়েন্দাগিরিতে মিথ্যে বলতেই হয়, উপায় নেই। 'আপনি উত্তরে যাবেন, না?'

'হ্যাঁ। কি করে বুঝলে?'

'এমনি, আন্দাজ করলাম।'

'ক্যারপিনটেরিয়ায় যাচ্ছি, বোনকে দেখতে।'

'আমিও ভাবছিলাম ওখানেই যাবেন। অক্সনার্ডে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। অসুবিধে হবে নিতে?'

'না না, অসুবিধে কিসের? একাই যাচ্ছি। কিন্তু আজ তো আমি ফিরব না। একা বাড়ি যাবে কিভাবে?'

'বাসে চলে যাব। এখন নিতে আপনার অসুবিধে না হলেই হয়।'

ওয়াগনারের ছোট সেডানে প্যাসেঞ্জার সিটে উঠে বসল রবিন।

পনেরো

রাস্তার মোড়ে বসে আছে কিশোর। অ্যাপার্টমেন্ট হাউসটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্ত, বিরক্ত হয়ে পড়েছে সে। সিনথিয়াকে গ্রাহক বানানোর চেষ্টা করেছে আরেকবার। সকাল ন'টায়। আগের বার তো অন্তত কথা বলেছিল, এবার তা-ও বলল না।

ফিরে এসে পথের মোড়ে বসেছে কিশোর। দেখেছে, ময়লা কতগুলো কাপড় নিয়ে বাড়ির পেছনের একটা ঘরে গিয়ে ঢুকেছে সিনথিয়া, কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এসেছে ধোয়া, ইস্তিরি করা কয়েকটা কাপড় নিয়ে। এখন পুলের কিনারে বসে বসে নখের পরিচর্যা করছে। আবার মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে খুব ইচ্ছে করছে কিশোরের। ছুতো দরকার। বলবে নাকি গিয়ে অর্ডার বুক হারিয়ে ফেলেছে, খুঁজতে এসেছে?

উঠে পড়ল সে। রাস্তা পেরোল। কিন্তু বাড়ির গেটে পৌঁছেই থমকে গেল। লম্বা কর্ড লাগানো একটা টেলিফোন বের করে এনে সিনথিয়া কথা বলছে, 'লোরিনা' নামে একটা মেয়ের সঙ্গে।

'দূর, অভিনয় একদম ভাল না,' সিনথিয়া বলছে। 'তবে শুনলাম ইফেক্ট নাকি সাংঘাতিক। স্পেসশিপটা ফাটার সময় নাকি দর্শকের কাঁপ তুলে দেয়। ফোন করেছি, ওরা বলল দুটোয় শো। যাওয়ার আগে একআধটা স্যাণ্ডউইচ খেয়ে নিলে কেমন হয়?'

ফিরল কিশোর। সিনেমায় যাবে সিনথিয়া। পিছু নিয়ে গিয়ে লাভ নেই, অযথা

বসে থাকতে হবে হলের বাইরে। সে তো কিছুই করতে পারল না, রবিন কি করছে? কিছু করতে পারছে? রোজারকে আদৌ কোন সাহায্য করতে পারবে তো ওরা? বিল আর দুই বন্ধু-ই কি ডাকাত? কিভাবে প্রমাণ করা যাবে? এসব কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ টেলিভিশনে দেখানো একটা সিনেমার কথা মনে পড়ে গেল কিশোরের। তাড়াতাড়ি সাইকেলে উঠে ফিরে চলল ইয়ার্ডে।

হেডকোয়ার্টারেই রয়েছে মুসা। ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে অলস ভঙ্গিতে। বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে গেছে। কিশোরকে দেখে বলল, 'যাক, এলে। আর ভাল্লাগছিল না একা একা। হ্যাঁ, রবিন ফোন করেছিল।'

'তাই? কি বলল?'

'তার মনে হয়েছে, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে নিকারোদের ওখানে। বিলের দুই বন্ধু ডক এলাকায় ঘুরঘুর করছে। উত্তেজিত। আর মিসেস নিকারো নাকি স্বপ্নে দেখেছে রবিনকে।' স্বপ্ন-বৃত্তান্ত জানাল মুসা।

উত্তেজিত হয়ে উঠল কিশোর। 'কতক্ষণ আগে করেছে?'

'এই আধ ঘন্টা। কিছু বেশিও হতে পারে। আমি বললাম চলে আসতে। ও রাজি হল না।'

মাথা দোলাল কিশোর। 'শোন, আমিও যাচ্ছি ওখানে। ওই তিনজনের ছবি তোলার চেষ্টা করব। রোজারকে দেখালে হয়ত চিনতে পারবে।'

ডার্করুম থেকে একটা ক্যামেরা বের করে আনল কিশোর, টেলিফটো লেন্স লাগানো। 'ফোনের কাছে থাকবে।'

আধ ঘন্টা পর নিকারোদের ওখানে পৌছল সে। টিনা নেই। কাচেঘেরা ছোট অফিসটা শূন্য। এলসি বা মিসেস নিকারো, কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

খিলানে বাঁধা রবিনের সাইকেলটা দেখতে পেল সে। তারটাও নিয়ে বাঁধল ওখানে। সৈকতে মানুষ আছে। কেউ হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে ঢেউয়ের মধ্যে মাছ ধরছে। কুকুর নিয়ে খেলছে একটা বাচ্চা। কিন্তু রবিন নেই। পার্কিং লটে চলে এল সে। সেখানেও কেউ নেই। একটা স্টেশন ওয়াগন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল নিকারোদের বাড়ির কাছে।

দরজার সামনে এসে দাঁড়াল কিশোর। বেল বাজানোর আগেই খুলে গেল পাল্লা। দাঁড়িয়ে আছে মিসেস নিকারো। অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে।

'মিসেস নিকারো, আমার বন্ধুকে দেখেছেন?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'তোমার বন্ধু?'

'সকালে আপনি তার সঙ্গে কথা বলেছেন। তাকে নাকি স্বপ্নে দেখেছেন।'

'অ. ওই ছেলেটা। সে তোমার বন্ধু। বোঝা উচিত ছিল আমার।' এমন ভাবে

তাকাল মহিলা, যেন রাগ করেছে, কিন্তু কিশোর বুঝতে পারল আসলে রাগেনি।

'খিলানের নিচে ওর সাইকেলটা বাঁধা দেখলাম, ওকে দেখছি না। গেল কোথায়? আপনার বউমার সঙ্গে বোটে করে যায়নি তো কোথাও?'

মাথা নাড়ল মিসেস নিকারো। 'না। এলসি গেছে বিলের সঙ্গে, টিনাকে নিয়ে। আর কাউকে দেখিনি বোটে।'

'তাহলে গেল কোথায়!'

'জানি না,' বলতে বলতে পিছিয়ে গিয়ে পাল্লা পুরো খুলে দিল মহিলা। 'খারাপ কিছু একটা ঘটবে, বুঝতে পারছি। আমার স্বপ্ন মিথ্যে হয় না। এস, ভেতরে এস।'

রবিনের বিপদের আশঙ্কায় শঙ্কিত হল কিশোর।

স্টোরেজ কোম্পানির দিকে এগোচ্ছে রবিন। এলাকাটা নির্জন। শেকলের তৈরি উঁচু বেড়া। বিল্ডিংটায় কোন জানালা দেখা যাচ্ছে না। কাদামাখা কয়েকটা সাদা রঙের মুভিং ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। গেট থেকে সোজা চলে গেছে ড্রাইভওয়ে, এবড়োখেবড়ো, জায়গায় জায়গায় গর্ত, পানি জমে আছে। গেট বন্ধ।

কাউকে চোখে পড়ছে না। বাইরে থেকে কোম্পানি-এলাকার চারদিকে চক্কর দিতে শুরু করল রবিন। ঘাস জন্মে আছে জায়গায় জায়গায়। বাড়ির একধারে ভাঙা বাক্স আর বাতিল কাগজের স্তূপ। ভ্যান গাড়িগুলোর জন্যে পেছনদিকটা ঠিকমত দেখতে পাচ্ছে না। চত্বরের ভেতরে কোথাও থেকে গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

দাঁড়িয়ে কান পাতল সে। কথা বোঝা যাচ্ছে না। বেড়ার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একটা গাড়ি, ওটার দিকে তাকিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। ডানে বাঁয়ে তাকিয়ে, লম্বা দম নিয়ে উঠতে শুরু করল বেড়া বেয়ে। ওপরে উঠে বেড়া ডিঙিয়ে নামল ভ্যানের ছাতে।

ছাতের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড। দম নিয়ে, উঠল। মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিল চত্বরের দিকে।

'সময় মত শুকায় না,' বলল একজন।

'না শুকাক,' বলল আরেকটা কণ্ঠ। 'এভাবেই নেব।'

রবিন যেটার ছাতে রয়েছে, ওটার কাছাকাছি আরেকটা ভ্যান। মাঝে ফাঁক সামান্য। উঠে এক লাফে চলে এল দ্বিতীয় ভ্যানের ছাতে। পায়ে স্নিকার থাকায় শব্দ হল না। হামাগুড়ি দিয়ে এগোল। উঁকি দিতেই চোখে পড়ল লোকদুটোকে। তার দিকে পেছন, তাকিয়ে রয়েছে চকচকে রঙ করা সাদা একটা ট্রাকের দিকে।

উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল আবার রবিন, সাবধানে মুখ তুলে দেখতে লাগল।

'ও-কে, ডিক,' বলল একজন। চিনতে পারল রবিন, মাইস। কোমরে হাত দিয়ে, মাথা একপাশে কাত করে দেখছে লোকটা। 'ভাল কাজ দেখিয়েছ।'

বিচিত্র একটা শব্দ করল শুধু ডিক, কথা বলল না। এক হাতে রঙের টিন, আরেক হাতে ছোট ব্রাশ। বাতাসে রঙের কড়া গন্ধ। নতুন করে নাম লেখা হয়েছে সাদা ট্রাকটায়। প্যাসিফিক স্টোরেজ কোম্পানির নাম বদলে লেখা হয়েছেঃ রিচার্ডসন'স মেরিটাইম সাপ্লাইজ।

আপনমনেই হাসল রবিন। ছদ্মবেশী ট্রাক।

ব্রাশ নেড়ে ট্রাকটার দিকে ইঙ্গিত করল ডিক। 'এত কষ্টের দরকার ছিল?'

'কোন ঝুঁকি নিতে চাই না,' জবাব দিল মাইস। 'এ-ধরনের গাড়ি নিকারোদের ওখানে দেখলেই লোকে ভুরু কুঁচকে তাকাবে।'

ঘুরল মাইস। হেঁটে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল জানালা-বিহীন বিরাট বাড়িটার ভেতরে। মুহূর্ত পরে তার সঙ্গীও পিছু নিল। কিছুক্ষণ কংক্রিটের মেঝেতে শুধু কাঠ ঘষার শব্দ কানে এল রবিনের। অবশেষে আবার বেরোল মাইস। একটা ডোলিতে করে তিনটে কাঠের বাক্স নিয়ে আসছে। ট্রাকের দিকে এগোল।

ডিক বেরোল আরেকটা ডোলি নিয়ে। তাতেও একই রকম বাক্স। মাইসের মত নিরাপদে যেতে পারল সে, দুই মিটার যেতে না যেতেই গর্তে পড়ল ডোলি। ঝাঁকুনি লেগে মাটিতে পড়ে খুলে গেল একটা বাক্স। ছড়িয়ে পড়ল ডজনখানেক ছোট ছোট বাক্স।

'অ্যাই, কি করছ!' চিৎকার করে বলল মাইস।

'ঠিক আছে ঠিক আছে, তুলে ফেলছি।'

ছোট বাক্সগুলো কুড়িয়ে আবার বড় বাক্সটায় ভরল ডিক। ডোলিতে তুলল। মাটিতে পড়ে ছোট বাক্সও দু'একটা খুলে গিয়েছিল। ভেতরের জিনিস ছিটকে পড়েছে মাটিতে। ওপর থেকে রবিন দেখলেও ডিক বা মাইস কেউই খেয়াল করেনি। দম বন্ধ করে পড়ে রইল সে, উত্তেজনায় দুরুদুরু করছে বুক। ট্রাকে মাল তুলে আরও আনার জন্যে আবার বাড়িটাতে গিয়ে ঢুকল দু'জনে। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এল।

প্রায় আধ ঘন্টা ধরে মাল বোঝাই করল ওরা। নানারকম বাক্স। কোনটা কাঠের, কোনটা ঢেউ খেলানো মলাটের। কোনটা এত ভারি, দু'জনে ধরে তুলতেও কষ্ট হল। মাল তোলা হলে ট্রাকের দরজা বন্ধ করে হুড়কো লাগিয়ে দিল শক্ত করে।

'ইহ্, মেলা পরিশ্রম,' কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল ডিক। 'আরেকজন

লোক আনলে পারতাম।'

'না, এইই ভাল হয়েছে। কষ্ট একটু বেশি হয়েছে, তবে সাক্ষী থাকল না।'

আবার বাড়িতে গিয়ে ঢুকল ওরা। অপেক্ষা করছে রবিন। পাঁচ মিনিট গেল···দশ···বেরোচ্ছে না একজনও। অনুমান করল সে, ট্রাক নিয়ে ওই দু'জনের কেউ যাবে না।

হামাগুড়ি দিয়ে ভ্যানের সামনের দিকে চলে এল রবিন। নিঃশব্দে হুডের ওপর নামল, সেখান থেকে মাটিতে। দ্রুত এগোল যেখানে জিনিসগুলো পড়ে আছে। ঘাসের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে সামান্য খুঁজতেই হাতে লাগল একটা। তুলে দেখেই চমকে উঠল। বুলেট!

মৃদু একটা শব্দ হল, বোধহয় নিঃশ্বাসের। নীরবতার মাঝে কান এড়াল না রবিনের। ফিরে তাকিয়েই স্থির হয়ে গেল, যেন জমাট বরফ। ঢোক গেলার চেষ্টা করল, গলা শুকিয়ে কাঠ। এমনকি ভয়ে যে কাঁপবে, সেই শক্তিও নেই যেন।

তার দিকে তাকিয়ে আছে ভয়ঙ্কর এক কুকুর! ডোবারম্যান পিনশার! কুকুর গোষ্ঠীর হিংস্রতম প্রাণীগুলোর একটা। মাত্র তিন মিটার দূরে। কুচকুচে কালো চোখের তারা স্থির হয়ে আছে রবিনের ওপর, কান খাড়া। ঘেউ ঘেউ করছে না। দৃষ্টি দিয়ে ঘায়েলের চেষ্টা করছে যেন অনধিকার প্রবেশকারীকে।

'অ্যাইই!' ফিসফিসিয়ে বলল রবিন, 'কুকুর! লক্ষ্মী কুকুর!'

খুব ধীরে ধীরে নড়ল সে। সোজা হল। পিছাল এক পা।

ওপরে ঠোঁট উঠে গেল কুকুরটার। ভীষণ দাঁত বের করে ভেঙচি কাটল নীরবে। ধীরে ধীরে গলার গভীর থেকে বেরোল অতি চাপা গর্জন।

'অ্যাইই!' বলল রবিন।

গর্জন জোরাল হল। আগে বাড়ল কিছুটা। তারপর দাঁড়িয়ে গেল।

আর নড়ল না রবিন। ওটা প্রহরী কুকুর, বুঝল। সে নড়লে কুকুরটা নড়বে, না নড়লে নড়বে না। আসল উদ্দেশ্য, আটকে রাখা। প্রয়োজন হলে সারাদিন একই ভাবে দাঁড়িয়ে কিংবা বসে থাকবে ডোবারম্যানের বংশধর!

ধরা পড়ে গেছে রবিন!

ষোলো

ঘরের ভেতর খাবারের চমৎকার গন্ধ, বিশেষ করে পনির আর টোম্যাটো সস। অন্য সময় হলে অবশ্যই ভাল লাগত কিশোরের, এখন লাগছে না। লিভিং রুমে বসে মিসেস নিকারোর স্বপ্ন বিবরণ শুনছে।

একঘেয়ে কণ্ঠে বলেই চলেছে মহিলা।

ভুরু কোঁচকাল কিশোর। বাধা দিয়ে বলল, 'আপনার স্বপ্ন কি সব সময়ই সত্যি হয়?'

'না, বেশির ভাগই সাধারণ স্বপ্ন, পুরানো স্মৃতি। তবে কিছু আছে ভিন্ন। হয়ত এমন কাউকে দেখলাম, যাকে জীবনেও দেখিনি। জেগে উঠে কোথাও না কোথাও দেখা হয়ে যায় তার সঙ্গে। দুঃস্বপ্ন···।'

'বেশি দেখেন?'

'না না,' হাসল মিসেস নিকারো। 'ভাল স্বপ্নও দেখি। একদিন দেখলাম সুন্দর লাল চুলওয়ালা একটা মেয়ে। পরে তাকেই বিয়ে করে আনল আমার ছেলে। এলসির কথা বলছি···।'

পারিবারিক ইতিহাসে ঢুকে যাচ্ছে মহিলা, বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি আগের প্রসঙ্গে ফিরে এল কিশোর, 'বিলের কথা বললেন। আপনার আত্মীয়?'

'না। তবে ছেলেটা ভালই। ওই যে, রাস্তার ধারের পুরানো কটেজটায় থাকে। ওর দুই বন্ধুও থাকে, ওরা দক্ষিণ আমেরিকার লোক। ওর বেশিরভাগ বন্ধুই ওই দেশের। আসে, বেকার থাকে যতদিন ওর সঙ্গেই থাকে, চাকরি-টাকরি পেলে চলে যায়। আমার মনে হয় বিলের বাবা ছিল সাউথ আমেরিকান। সেই সূত্র ধরেই চলে আসে দেশের লোক। আর উদ্দেশ্য ছাড়া কেউ আসে না,' ভ্রূকুটি করল মহিলা। 'এই যেমন তুমি। মানিব্যাগ খুঁজতে আসনি তখন, তাই না? তোমার বন্ধুও মাছধরা দেখতে আসেনি, নজর রাখতে এসেছিল। সোজা কথা, স্পাইগিরি, ঠিক না? আর বিল? কিছু একটা করতে যাচ্ছে সে, যা আমরা জানি না। কিছু একটা গোপন করছে, আমার আর এলসির কাছে।'

'কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, সেটা আমিও বুঝতে পারছি,' বলল কিশোর। 'কিন্তু কি ঘটবে, জানি না। আচ্ছা, মিসেস নিকারো, একটা অন্ধ লোককে স্বপ্নে দেখেছেন বলেছেন। তারপর কি বাস্তবেও দেখেছেন ওকে?'

'না।'

'কিন্তু রবিন দেখেছে। আমিও।'

পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বের করে দিল কিশোর। 'ওকে দেখলে দয়া করে এই নাম্বারে একটা ফোন করবেন? আমি না থাকলেও যে-ই থাকুক, শুধু মেসেজটা দিয়ে দেবেন।'

'দেব।'

'আপনার ফোনটা ব্যবহার করতে পারি?'

হলরুমের দিকে ইঙ্গিত করল মহিলা। উঠে গিয়ে হেডকোয়ার্টারে ফোন করল

কিশোর। রিসিভার তুলেই মুসা বলল, 'কিশোর, রবিন ফোন করেছিল। তুমি বেরোনোর পর পরই। অক্সনার্ডে গেছে। নতুন আরেকটা নাম বলল, মাইস। রবিনের বিশ্বাস, ওই লোকটাও এই রহস্যের সঙ্গে জড়িত। বিকেলেই আবার ফোন করবে বলেছে।'

'সাইকেল ফেলে গেছে। আমি তো ভয় পাচ্ছিলাম, কোন বিপদে না পড়ল।'

'না। ভালই আছে। তুমি কোত্থেকে?'

'মিসেস নিকারোর ঘর থেকে। কিছুক্ষণ পরে আসব।' লাইন কেটে দিল কিশোর। পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মহিলা। বলল, 'তোমার বন্ধু তাহলে ভালই আছে?'

কিশোর হাসল। 'হ্যাঁ। অক্সনার্ড থেকে ফোন করেছিল। একটা কাজে গেছে ওখানে।'

'ভাল। যাক, শুনে স্বস্তি পেলাম। নিশ্চিন্তে এখন মেহমানদারি করতে যেতে পারি। তোমারও নিশ্চয় কাজ আছে। সাবধানে থাকবে।'

থাকবে, কথা দিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর। চলল বিলের কটেজের দিকে।

বসে অপেক্ষা করার উপযাগী ভাল একটা জায়গা পছন্দ করল সে। আরাম করে বসল, হাতে ক্যামেরা। এক ঘন্টা পেরিয়ে যাওয়ার পর এল পুরানো ট্রাকটা। রাস্তার পাশে নামিয়ে দিল বিলের এক বন্ধুকে।

ক্যামেরা তুলল কিশোর। ক্লিক করে উঠল শাটার। লোকটা কটেজে ঢুকতে ঢুকতে তার মোট ছয়টা ছবি তুলে ফেলল সে।

আবার অপেক্ষার পালা। সাগরের দিকে চেয়ে টিনাকে আসতে দেখে হাসি ফুটল মুখে। ডকে পৌছল বোট। বাঁধা হল ওটাকে। দু'জন নামল। বিল আর এলসি। বিলের জন্যে ভাবনা নেই, এক সময় না একসময় সামনে দিয়ে যেতেই হবে তাকে, কটেজে ঢুকতে হলে। তার দ্বিতীয় বন্ধুর ছবি তোলাটা এখন জরুরি।

কাটছে অপেক্ষার দীর্ঘ মুহূর্তগুলো। সৈকত আর সাগরের ওপর উড়ছে সী-গাল, মাঝেমাঝে ডাইভ দিয়ে পড়ছে পানিতে, ঠোঁটে মাছ চেপে ধরে উড়াল দিচ্ছে, উড়তে উড়তেই গিলে নিচ্ছে মাছটা। বাঁ দিকে নিকারোদের ড্রাইভওয়েে, এক-আধটা গাড়ি এসে ঢুকছে, কিছুক্ষণ থাকছে, আবার চলে যাচ্ছে। বাড়িটার জন্যে অফিস চোখে পড়ছে না কিশোরের, তবে এলসি ভেতরেই রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিলও নিশ্চয় অফিসেই।

ডানে সৈকতের দিকে চোখ ফেরাল কিশোর। পানির কিনারে ছিপ হাতে ব্যস্ত সৌখিন মাছশিকারিরা। হাতে একটা মেটাল ডিটেক্টর নিয়ে সৈকত ধরে হাঁটছে একজন লোক। সার্ফাররা বসে আছে ভাল ঢেউয়ের আশায়। দিগন্তে দানা বাঁধছে

মেঘ, ইতিমধ্যেই ঠাণ্ডা হয়ে পড়েছে বাতাস। সকালটা ছিল সুন্দর, দিনটাও ভালই গেছে, শেষ হবে ঝড়বাদলের মধ্যে দিয়ে বোঝা যায়।

কটেজ থেকে বেরিয়ে, রাস্তা পেরিয়ে জেটির দিকে এগোল বিলের বন্ধু।

ঘড়ি দেখল কিশোর। প্রায় তিনটে। সকালেই রবিন দেখেছে তৃতীয় লোকটাকে। গেল কোথায়?

নিকারোদের বাড়ির দিকে তাকাল কিশোর। হঠাৎ মনে পড়ল, একটা স্টেশন ওয়াগন দেখেছিল ওখানে। এখন নেই। গেল কখন? পাখি, মেঘ, ঢেউ আর বাতাস যেন সম্মোহিত করে রেখেছিল তাকে, গাড়িটাকে যেতেও দেখেনি, ইঞ্জিনের শব্দও শোনেনি।

উঠল সে। হাঁটতে শুরু করল রাস্তা ধরে। ড্রাইভওয়েয়র উল্টো দিকে এসেই দেখতে পেল অফিসে নেই এলসি। মিসেস নিকারোর চেয়ারে বসে ডেস্কে পা তুলে দিয়ে আয়েশ করছে বিল। সিগারেট টানছে, ধোঁয়া ছাড়ছে ছাতের দিকে। ডেস্কের ওপর আসন-পিঁড়ি হয়ে বসেছে তার বন্ধু। ভাবসাব দেখে মনে হয় গল্প শোনাচ্ছে বিলকে। মাঝে মাঝে হাত নেড়ে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছে।

কিন্তু এলসি গেল কোথায়? বাড়িতে, শাশুড়ির সঙ্গে রয়েছে? বিল আর তার বন্ধুকে এখন ওই অবস্থায় দেখলে কি করবে মেয়েটা, ভেবে হাসি পেল কিশোরের।

ভালমত খেয়াল করতে বাড়িটাও শূন্য মনে হল। জানালার পাল্লাগুলো বন্ধ, পর্দা টানা। এই সময় ড্রাইভওয়েতে ঢুকল একটা গাড়ি, বাড়ির সামনে গিয়ে থামল। গাড়ি থেকে নামল সাদা-চুল এক বৃদ্ধা, বোধহয় মিসেস নিকারোর মেহমান, হাতে একটা প্যাকেট। দরজায় গিয়ে বেল বাজাল। কেউ বেরোল না। মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে থেকে আবার বেল বাজাল বৃদ্ধা। সাড়া না পেয়ে চলল অফিসের দিকে।

দেখতে পেয়েছে বিল। উঠে দাঁড়াল। তার বন্ধু আগের মতই বসে রয়েছে।

বিলের সঙ্গে কি কথা হল বৃদ্ধার। তারপর একটুকরো কাগজে কিছু লিখে ভাঁজ করে দিল বিলের হাতে। ফিরে এল গাড়ির কাছে। রেগেছে খুব।

গাড়িটা চলে গেলে আবার চেয়ারে বসল বিল। ভাঁজ করা কাগজটা দলেমুচড়ে ফেলে দিল ময়লা ফেলার ঝুড়িতে।

হেসে উঠল তার বন্ধু।

এবার সতর্ক হল কিশোর। ঘুরে হাঁটতে শুরু করল উল্টো দিকে। চলে এল এমন একটা জায়গায়, যেখান থেকে বাড়িটার জন্যে অফিস দেখা যায় না। তারমানে অফিস থেকে এখন কেউ দেখতে পাবে না তাকে। রাস্তা পেরিয়ে দ্রুত

বাড়িটার দিকে এগোল সে।

রান্নাঘরের দরজার পাশে একটা জানালা, ছিটকানি খোলা। টান দিতেই পাল্লা খুলে গেল। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দরজার নব নাগাল পাওয়া গেল, মোচড় দিতেই কট করে খুলে গেল তালা। ঘরে ঢুকে আস্তে লাগিয়ে দিল পাল্লাটা, তালা খোলাই রাখল। তাড়াহুড়ো করে বেরোনোর দরকার হতে পারে।

রান্নাঘরের ভেতরটা গুমোট। খাবারের গন্ধে বাতাস ভারি। স্টোভে বসানো পাত্রে সুপ তৈরি হচ্ছে। গরম রোস্ট ঠাণ্ডা হয়নি এখনও। সালাদের সব্জি কেটে রাখা হয়েছে।

নিঃশব্দে ডাইনিং রুমে চলে এল কিশোর। টেবিলে বাসনপেয়ালা সাজানো, তিনজনের জন্যে। পর্দা টেনে দেয়ায় ঘরের ভেতর আবছা অন্ধকার। লিভিং রুমেও একই অবস্থা। বাতাসে খাবারের গন্ধের পাশাপাশি ঝাঁঝালো আরেকটা গন্ধ। কিছুক্ষণ আগে এই গন্ধ ছিল না, সে যখন কথা বলছিল মিসেস নিকারোর সঙ্গে। একটা সিগারেটের পোড়া টুকরো চোখে পড়ল, পা দিয়ে পিষে নেভানো হয়েছে।

সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়াল কিশোর। আস্তে ডাকল। জবাব নেই। গলা আরেকটু চড়িয়ে ডাকল, 'মিসেস নিকারো? আছেন? আমি, কিশোর।'

সাড়া নেই। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এল কিশোর।

বেডরুমের জানালার খড়খড়ি তোলা। আলো আসছে। বড় বড় কাঠের আসবাব এঘরে। একটা দেরাজ বোঝাই ছবি। হলরুমে ঢুকল সে। এঘরের আসবাবগুলো সাদা দেয়ালে টাঙানো রঙিন ফটোগ্রাফ। ঘরটায় খোঁজাখুজি করছে কিশোর, এই সময় বাজল টেলিফোন। রীতিমত চমকে উঠল সে। ফোনটা একটা টেবিলে রাখা। জানালা দিয়ে উঁকি দিল অফিসের দিকে।

অফিসের সেটটার দিকে তাকিয়ে আছে বিল। দ্বিধা করছে মনে হয়।

আবার রিঙ হল।

রিসিভার তুলল বিল। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল বেডরুমের ফোনের রিঙ। হাসল কিশোর। এটা অফিসের ফোনের এক্সটেনশন। আস্তে রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল সে।

'সি,' বলল বিল।

স্প্যানিশ ভাষা। কিছু কিছু বোঝে কিশোর। রিসিভার জোরে কানে চেপে ধরে যতটা সম্ভব বোঝার চেষ্টা করছে।

ওপাশের লোকটা নিজের নাম বলল জিনো। বলল, মাইসের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। টাকার কথা কি যেন বলল। নিকারোর নাম বলল, তারপর বলল কিশোরের নাম! মনে করিয়ে দিল, রোজারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল কিশোর

পাশা, সেখানে মিসেস নিকারো আর অন্ধ লোকটার কথা আলোচনা করেছে। বিলকে হুঁশিয়ার থাকতে বলল। বিল জবাব দিল, থাকবে। জানাল, সে আর পেক সব নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে। পেক বোধহয় অফিসে বসা লোকটার নাম, আন্দাজ করল কিশোর। আরও কয়েকটা কথা বলে লাইন কেটে দিল জিনো।

রিসিভার রেখে আবার জানালা দিয়ে উঁকি দিল কিশোর। অফিসের বাইরে বেরোল বিল। সৈকতে চোখ বোলাল একবার। তারপর ফিরে চেয়ে ডাকল বন্ধুকে। সে বেরোল, ইশারায় কটেজটা দেখাল।

কটেজের দিকে হাঁটতে শুরু করল পেক।

নিকারোদের বাড়ির দিকে ফিরল বিল। কৌতূহলী হয়ে উঠেছে যেন হঠাৎ করেই। পায়ে পায়ে রওনা হল এদিকে।

চট করে সরে এল কিশোর। নিশ্চয় রিসিভার রাখার শব্দ পেয়েছে বিল। নইলে সন্দেহ হল কেন?

সিঁড়িতে উঠে থামল পায়ের শব্দ। তালায় চাবি ঢোকানো হল। পৌঁছে গেছে বিল। যে-কোন মুহূর্তে উঠে আসবে ওপরে। নিচে নামার আর সময় নেই। ধরা পড়ে যাবে কিশোর, তারপর···।

তারপর কি?

বেডরুমের লাগোয়া বাথরুম আছে। টিপ টিপ করে পানি পড়ার শব্দ আসছে ভেতর থেকে।

সামনের দরজা খোলার মৃদু আওয়াজ হল।

তিন লাফে ঘর পেরিয়ে আরেক ঘরে চলে এল কিশোর। বাথরুমে ঢুকে শাওয়ার ছেড়ে দিল। ফিরে এল বেডরুমে। খাটের নিচে ক্যামেরাটা লুকিয়ে রেখে নিজে এসে লুকাল দরজার আড়ালে।

দুপদাপ করে সিঁড়ি বেয়ে উঠল বিল। হ্যাঁচকা টান দিয়ে খুলল বেডরুমের দরজা। দাঁড়িয়ে রইল এক মুহূর্ত, বাথরুমের দিকে চেয়ে। তারপর এগিয়ে গেল সেদিকে।

মুহূর্ত সময় নষ্ট করল না কিশোর। দরজার আড়াল থেকে বেরিয়েই দিল দৌড়। সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় শুনল বিলের চিৎকার। ফিরেও তাকাল না। নিচে নেমে, রান্নাঘরের দরজা খুলেই একলাফে একেবারে বাইরে।

সতেরো

একছুটে নিকারোদের সীমানা পেরিয়ে গিয়ে হাইওয়েতে উঠল কিশোর। লুকাতে

হবে, বিলের হাত থেকে বাঁচতে হলে তাড়াতাড়ি কোথাও লুকিয়ে পড়তে হবে। কিন্তু কোথায়?

পথের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে একটা গাড়ি, কোন ক্যাম্পারের হবে। পেছনের দরজা খোলা। গাড়ির গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে ক্যাম্পারের মালিক। কাগজের তোয়ালে দিয়ে হাত মুছছে।

বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না কিশোর। নিঃশব্দে উঠে পড়ল গাড়িতে। কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে পড়ল মেঝেয়, কতগুলো ঝিনুকের ঝুড়ির পাশে। গায়ের ওপর টেনে দিল একটা পুরানো তেরপল। খানিক পরেই দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল ক্যাম্পারের দরজা। ইঞ্জিন স্টার্ট নিল।

চলতে শুরু করল গাড়ি। শ'খানেক মিটার দক্ষিণে এগিয়ে, পুরো ঘুরে আবার উত্তরে রওনা হল। গতি বাড়ছে। তেরপল সরিয়ে উঠে বসল কিশোর, জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। নিকারোদের সীমানা পার হওয়ার সময় বিলকে দেখতে পেল সে। রাস্তার এমাথা থেকে ওমাথায় চোখ বোলাচ্ছে লোকটা। হাতের মুঠো শক্ত। অবাক।

হেসে উঠল কিশোর।

নিকারোদের ডক আর অক্সনার্ডের মাঝামাঝি এসে প্রথমবারের মত থামল ক্যাম্পার, ট্রাফিক সিগন্যাল দেখে। এই অপেক্ষাতেই ছিল কিশোর। গাড়ির গতি কমে আসতেই খুলে ফেলল পেছনের দরজা, থামার সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়ল। হাঁটা দিল মোড়ের দিকে।

দশ মিনিটে পৌঁছে গেল একটা বাস টার্মিনালে। সান্তা মনিকার বাস এল, উঠে পড়ল তাতে।

দক্ষিণে ছুটেছে বাস। ভাবছে কিশোর। বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই আর, বিল নজর রাখে রোজারের ওপর। কিশোরের সাথে কি কি কথা হয়েছে রোজারের, সব জানে। কিন্তু কিভাবে? নিশ্চয় কারও কাছে বলেছে রোজার। কার কাছে? সিনথিয়া?

নিকারোদের ডক পার হচ্ছে বাস। পার্কিং লটে কেউ নেই। অফিসটা নির্জন। বিল আর তার বন্ধু গেল কোথায়? এলসি আর তার শাশুড়িই বা কোথায়? ওদের নিরুদ্দেশ হওয়ার পেছনে বিলের হাত নেই তো? ...আরও নানারকম প্রশ্ন ভিড় করে এল কিশোরের মনে। হঠাৎ শঙ্কিত হয়ে উঠল সে। রোজার কি নিরাপদ?

সান্তা মনিকায় বাস থামতে প্রথম নামল কিশোর, নামল না বলে দরজা দিয়ে ছিটকে বেরোল বলা যায়। মোড়ের কাছ থেকে ট্যাক্সি নিয়ে চলল ডলফিন কোর্টে।

চারটে চল্লিশ মিনিটে রোজারের দোড়গোড়ায় কিশোরকে নামিয়ে দিল

ট্যাক্সি। বেল বাজাল। রোজারকে দরজা খুলে দিতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে।

'কি ব্যাপার? এত উত্তেজিত? কোন খবর আছে নাকি?' জিজ্ঞেস করল রোজার।

'আছে।' রোজারের পিছু পিছু রান্নাঘরে এসে বসল কিশোর। বসেই জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার রোজার, কাল আমি যাওয়ার পর কার সঙ্গে কথা বলেছেন?'

'কথা বলেছি! কই, কারও সঙ্গে না তো। ঘর থেকেই বেরোইনি।'

'তাহলে কেউ ফোন করেছিল। কিংবা আপনার ঘরে এসেছিল। যার সঙ্গে বলেছেন।'

'না, কেউ ফোনও করেনি; আসেওনি। আমার অত বন্ধুবান্ধব নেই। কেন?'

'খুব জরুরি। ভাবুন, মিস্টার রোজার। ভাল করে ভেবে দেখুন। কাল বিকেলে অন্ধ ভিখিরি আর নিকারোদের কথা আলোচনা করেছিলাম। নিশ্চয় সেসব কথা কারও কাছে বলেছেন। জিনো নামে কাউকে চেনেন?'

ভাবল রোজার। মাথা নাড়ল, 'না, চিনি না। কেউ আসেনি এখানে, রক ছাড়া। তাকেও কিছু বলিনি। রাতে ফিরেই ওপরে চলে গেল। ঘরে ঢুকে তালা লাগিয়ে দিল।'

'আজ সকালে?'

'না, আজ সকালেও না। শুধু কেমন আছ, ভাল, ওই পর্যন্তই।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। শূন্য চোখে চিনির পাত্রটার দিকে তাকিয়ে জোরে জোরে চিমটি কাটল নিচের ঠোঁটে। রক রেনাল্ডের কথা ভাবছে। কালো গলাবন্ধ শার্ট, কালো চশমা। 'অদ্ভুত!' আনমনে বলল সে।

'কি বললে?'

'আচ্ছা, আপনার পড়শীদের সম্পর্কে কি ভাবে রক?'

'কি আর ভাববে? খুব সাধারণ লোক।'

'সে নিজে খুব অসাধারণ, না?'

শ্রাগ করল রোজার।

আবার চিনির পাত্রের দিকে তাকাল কিশোর। 'আচ্ছা, কবে থেকে কফিতে চিনি খাওয়া আরম্ভ করেছে রক?' আচমকা প্রশ্নটা যেন ছুঁড়ে দিল সে। 'সব সময় খায় না, তাই না? সেরাতে প্রথম যেদিন এলাম আমরা, শুধু কালো কফিই খেয়েছে, চিনি ছাড়া।'

'অ্যাঁ...হ্যাঁ, তা ঠিক। এই দু'একদিন আগে থেকে চিনি খাওয়া আরম্ভ করেছে। চিনি খেলে নাকি দ্রুত শক্তি পায় সে।'

চকচক করছে কিশোরের চোখ। টেনে নিল পাত্রটা। চিনির ভেতরে আঙুল ঢুকিয়ে দিল। উজ্জ্বল হল চেহারা। আস্তে করে বের করে আনল প্লাস্টিকের একটা বাক্স, একপাশে ছোট ছোট ছিদ্র।

জিনিসটার দিকে তাকিয়ে আছে রোজার। 'ওটা কি?'

'একধরনের শ্রবণ-যন্ত্র, মিস্টার রোজার, স্পাইরা বলে বাগ। রকের কথা বলার প্রয়োজন ছিল না আপনার সঙ্গে। চিনির পাত্রে এই জিনিস ঢুকিয়ে টেবিলে রেখে গেছে। আমাদের কথা সব শুনেছে সে।' উঠে টেলিফোনের দিকে এগোল কিশোর। 'টি এক্স ফোর-এ কাজ করেছেন। নিশ্চয় নাম্বার জানেন।'

নাম্বার বলল রোজার। ডায়াল করল কিশোর। রিসিভার কানে ধরে রেখে ঘড়ি দেখল। চারটে উনষাট। ওপাশে রিসিভার তোলা হলে রক রেনাল্ডকে চাইল সে। ওরা জানাল ওই নামে ওখানে কেউ কাজ করে না।

'কিন্তু টি এক্স ফোরেই তো কাজ করতেন মিস্টার রেনাল্ড। চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন?'

'সেটা আমি বলতে পারব না,' জবাব এল। 'সোমবার সকালে যোগাযোগ করলে হয়ত অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্ট জানাতে পারবে।'

অপারেটরকে ধন্যবাদ দিয়ে রিসিভার রেখে দিল কিশোর। 'ওখানে কাজ করে না?' রোজার অবাক। 'বুঝতে পারছি না! করার তো কথা। এই তো সেদিন ফ্রেজনোতে গেল একটা বিশেষ কাজ নিয়ে।'

'যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার।' এগিয়ে গিয়ে টান দিয়ে রেফ্রিজারেটরের দরজা খুলল কিশোর। কয়েক দিন আগে যেসব খাবারের প্যাকেট রেখেছিল, সেগুলো নেই। এককোণে যেন অসহায় হয়ে পড়ে রয়েছে শুধু একটা আইসক্রীমের প্যাকেট। দরজা বন্ধ করতে করতে বলল সে, 'এখানেই ছিল।'

'কী?'

'না, কিছু না। আমি শিওর না। বোধহয় দেরিই করে ফেললাম। মিস্টার রোজার, রক ঘরে তালা দিয়ে রাখে বললেন না?'

'হ্যাঁ। একা থাকতে ভালবাসে সে।'

'ওর ঘরটা দেখতে চাই আমি। এক্ষুনি।'

আঠারো

গ্যারেজ থেকে ধরাধরি করে একটা মই নিয়ে এল দু'জনে। লাগাল রকের ঘরের জানালায়। জানালা খোলা, কাজেই ঢুকতে অসুবিধে হল না কিশোরের।

প্রথমেই চোখ পড়ল, ড্রেসারের ওপর রাখা একটা রেকর্ডিং সিসটেমের ওপর। যন্ত্রে লাগানো টেপটা রিউণ্ড করে প্লে করল সে। এইমাত্র রোজারের সঙ্গে রান্নাঘরে বসে যা যা বলেছে, সব রেকর্ড হয়ে আছে। এমনকি রেফ্রিজারেটরের দরজা খোলার শব্দও স্পষ্ট।

মুচকি হাসল কিশোর। মুছে ফেলল সমস্ত রেকর্ডিং। তারপর টেপটা আবার শুরুতে এনে রেখে, ঘর দেখায় মন দিল। সব কেমন যেন খালি খালি। ডেস্কে চিঠির খাম বা পোস্টকার্ড নেই, বেডসাইড টেবিলে বই নেই। দেয়ালে ছবি নেই, টবে গাছ নেই। দেখে মনে হয়, মানুষই থাকে না এখানে।

ক্লোজেট খুলে দেখল। কিছু জ্যাকেট, শার্ট আর স্ন্যাকস আছে, পকেটগুলো খালি। ড্রেসারের ড্রয়ারে দেখা গেল আণ্ডারওয়্যার, মোজা, গেঞ্জি।

একেবারে নিচের ড্রয়ারে ভাঁজ করা সোয়েটারের মধ্যে পাওয়া গেল একটা ছুরি। চামড়ার চমৎকার একটা খাপে ভরা। তীক্ষ্ণ ধার। পেন্সিল কাটা থেকে শুরু করে থ্রোইং নাইফ হিসেবে ব্যবহার, সব কিছু চলতে পারে।

যেখানে পেয়েছে সেখানেই ছুরিটা রেখে দিল সে। জানালা দিয়ে বেরিয়ে মই বেয়ে নিচে নেমে এল আবার। কি কি দেখেছে, জানাল রোজারকে। শেষে বলল, 'ছুরিটাও বোধহয় তার পিস্তলের মত করেই পায়ে বাঁধে।'

মাথা নাড়ল রোজার, বিশ্বাসই করতে পারছে না। 'নানা জায়গায় ঘোরাঘুরি করে, আত্মরক্ষার জন্যে পিস্তল রাখে সঙ্গে, আমাকে বলেছে একথা। কিন্তু ছুরি দিয়ে করে কি? ক্যাম্পিঙে যায় না, কিছু না। অবসর সময়ে ঘুমানো আর টিভি দেখা ছাড়া আর কিচ্ছু করে না।'

'দেখিয়ে করে না আরকি। যা করে, গোপনে। রান্নাঘরে চিনির পাত্রে বাগ লুকায়। ফ্রিজে মূল্যবান জিনিস রাখে। আপনার ফ্রিজে কিছু লুকিয়ে রেখেছিল।'

'ফ্রিজে আর কি রাখবে, খাবার ছাড়া?'

'খাবার নয়, টাকা রেখেছিল। ব্যাংক থেকে ডাকাতি করে আনা টাকা, খাবারের প্যাকেটে মুড়ে।'

'অসম্ভব। খাবারই রাখে সে। একেকবারে অনেক খাবার এনে জমিয়ে রাখে। খাবার হাতের কাছে থাকলে নাকি ভরসা পায় সে। ওই ফ্রিজটা আমি ব্যবহারই করি না, সে-ই করে। খাবার রাখে বটে, কিন্তু ঘরে খায় না। অদ্ভুত স্বভাব।'

'হুম্।' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'ঘরে যদি না-ই খায়, ফ্রিজের খাবারগুলো যায় কোথায়? বের করে নিতে দেখেছেন?'

'কি জানি, অত খেয়াল করে কে···তবে টাকার প্যাকেট এনে রাখে না ফ্রিজে। অনেকদিন ধরেই প্যাকেট রাখছে। তারমানে কি বলতে চাইছ এতদিন ধরেই

ডাকাতি করছে সে! আমার বিশ্বাস হয় না। রক ওরকম লোক নয়।'

'টাকা না রাখলে মাদক রাখে। বিলের সঙ্গে তো সম্পর্ক আছেই। নিকারোদের বোট ব্যবহার করে মাদক চোরাচালানের কাজে, টিনাকে। গভীর সাগরে গিয়ে জাহাজ থেকে আনে মালের প্যাকেট, কিংবা চলে যায় বাজা ক্যালিফোর্নিয়ায়। কিংবা হয়ত মানুষ চোরাচালানের ব্যবসা করে ওরা। বেআইনীভাবে মানুষ পাচার করে...।' থেমে গেল। 'না, তাহলে ফ্রিজে কি রাখে? এখনও নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না কিছু।'

'পুলিশকে জানাবে?'

'এখন জানিয়ে লাভ নেই। কিছু প্রমাণ করতে পারব না।'

এই প্রথম রাগ দেখা দিল রোজারের চেহারায়। 'তাহলে, কি করবে? আমি কোন সাহায্য করতে পারব?'

'পারবেন। আগে একটা টেলিফোন করা দরকার। আপনার ঘরে যেটা আছে সেটা ব্যবহার করব না। প্রতিবেশীদের কারও ঘর থেকে করা যাবে?'

'যাবে।'

'তাহলে চলুন। যেতে যেতে বলছি আমার প্ল্যান।'

পাশের বাড়ির দরজায় এসে বেল টিপল রোজার। বেরোল এক মহিলা। তাকে বলল সে, নিজের টেলিফোন খারাপ, একটা ফোন করতে চায়।

হেডকোয়ার্টারে ফোন করল কিশোর। ডলফিন কোর্ট আর সেকেণ্ড স্ট্রীটটা যেখানে মিশেছে, সেখানে আসতে বলল মুসাকে।

'বিশ মিনিট,' মুসা বলল।

'এসে আমাদেরকে না পেলে আবার হেডকোয়ার্টারে ফিরে যাবে। আমার ফোনের অপেক্ষায় থাকবে।'

রোজারের রান্নাঘরে আবার ফিরে এল দু'জনে। চিনির পাত্রে আগের মত বাগটা ঢুকিয়ে রাখল কিশোর। 'মিস্টার রোজার,' জোরে জোরে বলল সে, চোখ টিপল রোজারের দিকে তাকিয়ে। 'নিশ্চয় অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। তবে শীঘ্রি নতুন খবর জানাতে পারব আশা করি। এলসি নিকারোর কাছ থেকে অবশেষে কথা আদায় করা যাবে, বুঝতে পারছি। এই একটু আগে থানায় গিয়েছিল মুসা, চীফ ইয়ান ফ্লেচারের সঙ্গে দেখা করতে। মুসা থানায় থাকতে থাকতেই ফোন করেছিল এলসি। দেখা করতে গেছেন চীফ।'

'কিন্তু মিসেস নিকারোর সঙ্গে ডাকাতির সম্পর্ক কি?' রোজার জিজ্ঞেস করল।

'আছে, যোগাযোগ আছে, আমি শিওর। রকি বীচ পুলিশ স্টেশনে আমাদেরকে যেতে বলেছে মুসা। তার ধারণা, এলসি নিকারোকে থানায় নিয়ে আসবেন চীফ।'

'বস। আমার জ্যাকেট নিয়ে আসছি।'

খট করে সুইচ টিপে রান্নাঘরের লাইট নেভাল কিশোর। বেরিয়ে এসে দু'জনে উঠল রোজারের ছোট গাড়িতে। ড্রাইভওয়ে থেকে বেরিয়ে মস্ত একটা উইলো গাছের নিচে গাড়ি রাখল রোজার। অপেক্ষা করতে লাগল ওরা।

সাইকেল নিয়ে হাজির হল মুসা। হেডলাইট জ্বালল-নিভাল রোজার, সঙ্কেত দিল কোথায় আছে ওরা। একটা ঝোপের ভেতরে সাইকেল লুকিয়ে গাড়ির কাছে এল মুসা। উঠে বসল পেছনের সিটে। জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'

রককে সন্দেহ করে, জানাল কিশোর। চিনির পাত্রে বাগ পাওয়া গেছে, রকের ঘরে রেকর্ডারে তাদের কথাবার্তা রেকর্ড হয়েছে, এসব কথাও বলল। ভয়েস-অ্যাকটিভেটেড রেকর্ডার, কথা শুনলেই চালু হয়ে যায় রেকর্ডিং সিসটেম। শেষে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু মনে পড়ে?'

'অন্ধ!' উত্তেজিত কণ্ঠে প্রায় চেঁচিয়ে বলল মুসা। 'খাইছে! বাগ লাগাতে গিয়েছিল স্যালভিজ ইয়ার্ডে! রক ব্যাটাই…।'

'হতে পারে,' বলল কিশোর।

নিচু স্বরে কথা বলতে লাগল দু'জনে। নিকারোদের ওখানে যা যা ঘটেছে, মুসাকে জানাচ্ছে কিশোর।

অন্ধকার হয়ে গেছে। বিকেল থেকেই আসি আসি করছিল বৃষ্টি, পড়তে শুরু করল এখন। সেকেণ্ড স্ট্রীট আর ডলফিন কোর্টে যানবাহন প্রায় নেই বললেই চলে। ছ'টার কিছু পরে মোড়ে দেখা দিল রকের গাড়ি। ড্রাইভওয়ে ধরে গিয়ে থামল বাড়ির সামনে। গাড়ি থেকে নামল সে। একটু পরেই জ্বলে উঠল রান্নাঘরের আলো। তারপর সামনের ঘরে আলো জ্বলল।

'আমাকে খুঁজছে,' রোজার বলল। 'এসময় ঘর থেকে বেরোই না, ক'দিন ধরে।'

দোতলায়ও আলো জ্বলল, রকের বেডরুমে।

'আর বেশিক্ষণ লাগবে না,' হাসি হাসি গলায় বলল রোজার।

সব ক'টা ঘরের আলো জ্বালিয়ে রেখেই সামনের দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল রক। দৌড়ে লন পেরিয়ে গিয়ে উঠল গাড়িতে। গর্জে উঠল ইঞ্জিন। কয়েক সেকেণ্ড পরেই ওদের পাশ দিয়ে শাঁ করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা।

রোজারও ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে ফেলেছে। পিছু নিল। সেকেণ্ড স্ট্রীট পেরিয়ে বেরিয়ে এল ওশন অ্যাভেন্যুতে। ছুটে চলল কোস্ট হাইওয়ে ধরে।

'নিকারোদের ওখানে যাচ্ছে,' কিশোর বলল।

দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করছে রোজার। মাঝখানে ঢুকে গেল আরেকটা

গাড়ি। ভালই হল, রোজারের গাড়িটাকে লক্ষ্য করবে না আর রক। অঝোর বৃষ্টির মাঝে উত্তরে ছুটে চলেছে ওরা। পারলে গাড়ির গতি পুরোটাই বাড়িয়ে দিত রক, বোঝা যাচ্ছে, পুলিশের ভয়ে বাড়াচ্ছে না। অহেতুক ঝামেলায় পড়তে চায় না এখন। ম্যালিবুতে ঢুকে গতি কমাল কিছুটা, তারপর আবার বাড়াল।

'মিস্টার রোজার,' কিশোর জিজ্ঞেস করল। 'জিনো নামে কাউকে চেনেন না?'

'না। রকের মিডলনেমের আদ্যাক্ষর অবশ্য জি, কিন্তু তাতে কি জিনো বোঝায়? কি জানি, মানায় না। স্প্যানিশ আর ইটালিয়ানরা ওরকম নাম রাখে।'

গন্তব্যস্থল দেখা যাচ্ছে। গতি কমাল রোজার। যানবাহন খুব কম রাস্তায়। ডকে দাঁড়ানো সাদা একটা ট্রাক আবছামত দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ ব্রেক কষল রক। ডানে মোড় নিয়ে মোটেলের ড্রাইভওয়ে ধরে উঠে যেতে শুরু করল।

'মোটেল!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। গাড়ি থামিয়ে দিয়েছে রোজার। 'কিশোর, ওখানেই আছে এলসি নিকারো আর তার শাশুড়ি।'

'তাই তো! আমারও বোঝা উচিত ছিল। মিস্টার রোজার, আপনি এখানেই থাকুন। পনেরো মিনিটের মধ্যে আমরা না ফিরলে পুলিশকে ফোন করবেন।'

'আচ্ছা। সাবধানে থাকবে।'

গাড়ি থেকে নামল দুই গোয়েন্দা। ওপর দিকে তাকাল। পাহাড়ের চূড়ায় অন্ধকার একটা ছায়ামাত্র এখন মোটেলটা। নিঃশব্দে ড্রাইভ বেয়ে উঠতে শুরু করল ওরা। তুমুল বৃষ্টি বাঁচাতে পিঠ বাঁকা করে রেখেছে। মোটেলের চওড়া চত্বরে পৌঁছে কিশোরের হাত খামচে ধরল মুসা। 'ওই যে, রকের গাড়ি,' ফিসফিসিয়ে বলল সে। 'কিন্তু ব্যাটা গেল কই?'

'মোটেলের ভেতরে হয়ত।'

পুলের পাশ কাটাল ওরা। সাগর এখন মোটেলের অন্যপাশে। সাগরের মাঝামাঝি রয়েছে মোটেলটা। ফলে ঝড়ো হাওয়া আর তেমন আঘাত হানতে পারছে না ওদের গায়ে। বৃষ্টির ফোঁটা চকচক করছে ম্লান আলোয়।

হাত তুলে দেখাল কিশোর। একধারে একটা জানালায় আলো, খুবই সামান্য। ভারি পর্দার ওপাশে নিশ্চয় ল্যাম্প জ্বলছে।

পা টিপে টিপে জানালার কাছে এসে কান পাতল ওরা, ভেতরে কথা হয় কিনা শোনার জন্যে।

হঠাৎ পেছনে শোনা গেল আরেকটা শব্দ বাতাস আর বৃষ্টির আওয়াজ ছাড়াও।

পেছনে ফিরে চাইল কিশোর।

'চুপ!' ধমক দিল রক রেনাল্ড। হাতে পিস্তল। 'একদম নড়বে না।'

চিৎকার করে ডাকল মোটেলের দিকে চেয়ে।

মোটেলের দরজা খুলে গেল। বাইরে এসে পড়ল ভেতরের আলো। বেরিয়ে এল বিলের আরেক রুমমেট, যাকে সারা বিকেল দেখা যায়নি। তার হাতেও পিস্তল।

'হাঁট!' দুই গোয়েন্দাকে আদেশ দিল রক।

ঘরে ঢুকল কিশোর আর মুসা। বাতাসে কড়া তামাকের ঝাঁঝাল গন্ধ। পিঠ-খাড়া একটা চেয়ারে বসা এলসি নিকারো, হাতলের সঙ্গে হাত বাঁধা। রাগে মুখ লাল। বিছানার কাছে একটা আর্মচেয়ারে বসিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে তার শাশুড়িকে।

রক ঢুকল ভেতরে। দরদর করে পানি ঝরছে গা থেকে। দরজাটা বন্ধ করে দিল বিলের রুমমেট।

'হাই!' বলে উঠল একটা পরিচিত কণ্ঠ।

ঘরের অন্ধকার কোণে, দরজার পাশে আরেকটা চেয়ারে বসে আছে রবিন। বেঁধে রাখা হয়েছে তাকেও।

উনিশ

'বাগটা দেখে ফেলেছিলে, তাই না?' রক বলল। 'আমাকে ফাঁকি দিতে চেয়েছ।'

'আপনিও ফাঁকি দিয়ে আমাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছেন,' বলল কিশোর।

তাকে আর মুসাকেও চেয়ারে বসানো হয়েছে। বেঁধেছে বিলের রুমমেট, তার নাম এতক্ষণে জানা হয়ে গেছে ওদের, পিনটো।

'রোজার কোথায়?' রক জিজ্ঞেস করল। 'রাস্তায়?'

জবাব দিল না কিশোর।

হাসল রক। 'বেশিক্ষণ বসিয়ে রাখব না ওকে।' পিস্তলটা পকেটে রেখে স্প্যানিশে পিনটোকে কি বলল সে।

দরজায় থাবা পড়ল। পাল্লা ঠেলে ভেতরে ঢুকল বিল। মুসা আর কিশোরকে দেখে থমকে দাঁড়াল, চোখে বিস্ময়। 'এরা এখানে কিভাবে? এটা তো রীতিমত বিচ্ছু,' কিশোরকে দেখল সে। 'আটকে রাখ, দেখ পালাতে না পারে।' রককে বলল সে, 'আমি এসেছি পিনটোকে নিতে। বোট রেডি। মাল তোলা প্রায় শেষ। মাইস চলে যাবে এখুনি।'

পাশে বসা কিশোরকে ফিসফিস করে জানাল রবিন, 'অক্সনার্ডের একটা মুভিং কোম্পানির মালিক মাইস। বিকেলে লুকিয়ে থেকে দেখেছি, ট্রাকে মাল তুলেছে ও

আর আরেকটা লোক। তোলার সময় একটা বাক্স পড়ে খুলে গিয়েছিল। ভেতরে বুলেটের বাক্স।'

'অ্যামুনিশন!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'নিশ্চয় রাইফেলও আছে। রকের দিকে তাকাল সে। 'আমি ভেবেছিলাম ড্রাগস। টিনার সাহায্যে মাদকদ্রব্য চোরাচালান করে বিল আর তার দোস্তেরা।'

'অসম্ভব!' চিৎকার করে উঠল এলসি। 'আমাকে না নিয়ে বোট নড়ানোরও সাহস করেনি কখনও। তুমি ভুল করছ।'

বিল হাসল। 'এবার নেব, মিসেস নিকারো। এবার আর বোটে থাকছেন না আপনি।'

'অস্ত্র তুলবেন বোটে,' কিশোর বলল। 'সেজন্যেই ডাকাতি করেছেন তিন বন্ধু মিলে, অস্ত্র কেনার টাকা চাই তো। চালান দেবেন মেসা ডি'ওরোতে, নিরীহ মানুষ মারার জন্যে।'

গর্বের ভঙ্গিতে মাথা তুলল বিল। 'অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের লড়াই হবে।'

'নিরস্ত্র মানুষকে গুলি করাকে কি লড়াই বলে নাকি?'

'কাদের নিরস্ত্র বলছ?' রেগে উঠল বিল। 'মেসা ডি'ওরোর সিভিল গার্ডদের? অন্যের জমি কেড়ে নিতে দস্যুদের সাহায্য করেছে যারা?'

'ওর কথা শুনছ কেন, বিল?' রক বলল। 'যা খুশি বলুক না। আমাদের কাজ আমরা করব।'

'আপনিই কানা ফকির সেজেছিলেন,' রককে বলল কিশোর। 'ছদ্মবেশে চোখ রেখেছেন ব্যাংকের ওপর। রোজার যাতে চিনতে না পারে। টাইম লকের কথা জানতেন আপনি। রোজারের ডিউটি জানতেন। তবে বেশি লোভী আপনি। ডাকাতির আগের দিন মিস্টার সাইমনের মানিব্যাগটা পড়ে থাকতে দেখে লোভ সামলাতে পারেননি। তুলে পকেটে ভরে ফেলেছিলেন, আর সেটাই ভেস্তে দিল আপনাদের পরিকল্পনা। তাড়াহুড়োয় পালাতে গিয়ে কোনভাবে ফেলে দিয়েছিলেন পকেট থেকে।'

'আ-আমি,' তাড়াতাড়ি বলল রক। 'আসলে···যার ব্যাগ তাকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্যেই তুলেছিলাম।'

বিলের দিকে তাকাল পেক, তারপর রকের দিকে। স্প্যানিশ ভাষায় কি বলল। তাকে চুপ থাকতে ইশারা করল বিল। রকের দিকে ফিরে কড়া গলায় বলল, 'ছেলেটা যা বলছে সত্যি? সামান্য একটা ব্যাগের জন্যে···।'

বাধা দিয়ে বলল রক, 'ওর কথা বিশ্বাস কোরো না। তুলে পকেটে রেখেছিলাম। ভেবেছি, ডাকবাক্সে ফেলে দেব। পরে ভুলে গেছি, আর ফেলতে মনে

ছিল না। ওসব নিয়ে তর্ক করে এখন লাভ নেই…।'

'আমাকে বললে না কেন তুমি?' চেঁচিয়ে উঠল বিল। 'মিস্টার সাইমনকে দিয়ে দিতাম। ওই ব্যাগ নিয়েই তো যত গোলমাল। ছেলেগুলো এসে হাজির হয়েছে!'

'বলছি তো, মনে ছিল না! তাছাড়া এটা কোন ব্যাপার নাকি? এদেশ থেকে চলেই তো যাচ্ছ তুমি। আর ছেলেগুলোর ব্যবস্থা আমি করব।'

'মিস্টার রোজারের বাড়ি ছাড়ছেন না আপনি, তাই না?' বলল কিশোর। 'কেন, আন্দাজ করতে পারছি। এদেশেই থাকবেন, ডাকাতির টাকা ভোগ করতে হবে তো। রিপাবলিকানদের সব টাকা দেবেন না আপনি।'

আবার রকের দিকে তাকাল বিল। ফ্যাকাসে হয়ে গেল রকের মুখ।

'কি বলছে ছেলেটা?' রকের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল বিল।

'সব টাকা অস্ত্র কিনতেই খরচ হয়ে গেছে,' বিলের চোখের দিকে তাকাতে পারছে না রক। 'জান তুমি, বিলানো।'

'আমি শুধু জানি দু'লাখ ডলার খরচ হয়েছে। অর্ধেকটা আজ বিকেলে মাইসকে দিয়েছ তুমি, বাকিটা আমি দিয়েছি। আর টাকা কই? বলেছ, রডরিগেজকে পাঠিয়েছ। তোমার চেহারা দেখে তো তা মনে হচ্ছে না। মিথ্যে কথা বলেছ তুমি। বিশ্বাস করে তোমার কাছে রেখেছিলাম। টাকা কি করেছ?'

'আমি কি করব? যা যা করতে বলেছ, করেছি…'

'আজ রাতে তুমিও যাচ্ছ আমাদের সঙ্গে,' কঠিন গলায় বলল বিল। 'মেকসিকো সিটিতে গিয়ে রডরিগেজের অ্যাসিসটেন্টকে আমাদের সামনে বলবে যে তুমি তার হাতে টাকা দিয়েছ। দরকার হলে মেসা ডি'ওরোতে নিয়ে যাব তোমাকে…।'

'কি যা-তা বলছ! আজ রাতে যে যেতে পারব না, ভাল করেই জান। এখানে জরুরি কাজ রয়েছে আমার। মিশন এখনও শেষ হয়নি।'

'মিস্টার রোজারের বাড়িতে এখনও পঞ্চাশ হাজার ডলার রয়েছে,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর।

'এই ছেলে, চুপ কর! মিথ্যুক কোথাকার!' কিশোরকে ধমক দিয়ে মিসেস নিকারোর দিকে ফিরল রক। 'এই বুড়ি, তুমিই এসব কথা বলেছ ছেলেটাকে। নিশ্চয় বলেছ স্বপ্নে দেখেছ তুমি, আর ছেলেটাও…'

'মিসেস নিকারো কিচ্ছু বলেনি আমাকে,' প্রতিবাদ করল কিশোর। 'টাকাটা কোথায় আছে, তা-ও বলে দিতে পারি। মিস্টার রোজারের ফ্রিজে একটা আইসক্রীমের প্যাকেটে…।'

ঠাস করে কিশোরের গালে চড় মারল রক।

মাথা নাড়তে নাড়তে বিল বলল, 'বোকামি করে ফেলেছ তুমি, রক। তোমাকে যেতেই হচ্ছে আমাদের সঙ্গে। যা করলে না...।'

ঝট করে পিস্তল বেরিয়ে এল রকের হাতে।

'ছেলেটা তাহলে সত্যিই বলেছে,' চকচকে নলটার দিকে তাকিয়ে বলল বিল।

পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল পিনটো, তার কথা ভুলেই গিয়েছিল রক। নড়ে উঠল সে। এত দ্রুত, গুলি করারও সময় পেল না রক। ঘাড়ে এসে লাগল কারাতের কোপ। একবার মাত্র চিৎকার করল রক, হাত থেকে খসে পড়ল পিস্তল, টলে উঠে মেঝেতে পড়ে গেল সে।

পিস্তলটা তুলে রকের দিকে তাক করল বিল।

গুঙিয়ে উঠল রক। ঘাড়ে হাত ডলতে ডলতে উঠে বসল। কলার চেপে ধরে তাকে টেনে তুলল পিনটো। টানতে টানতে নিয়ে গেল বাইরে। বিল গেল পেছনে।

ঝমঝম করে একনাগাড়ে বৃষ্টি পড়ছে মোটেলের ছাতে। টানাটানি করে বাঁধন খোলার চেষ্টা করল এলসি।

'আটকে রাখার চেষ্টা করলাম ওদেরকে, যতক্ষণ পারলাম,' কিশোর বলল। 'পনেরো মিনিট সময় দিয়ে এসেছিলাম মিস্টার রোজারকে। নিশ্চয় পুলিশকে খবর দিয়েছে। পালাতে পারবে না ওরা, তার আগেই পৌঁছে যাবে পুলিশ।'

'আমি ভাবছি অন্য কথা,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল মিসেস নিকারো। 'পুলিশের আগেই অন্য কিছু আসবে। আমরা এঘর থেকে বেরোনোর আগেই।'

'কি?' বলেই চমকে উঠল এলসি। একটা শব্দ! ঝড়-বৃষ্টির নয়। মনে হল, শব্দটা এসেছে মাটির নিচ থেকে। বিচিত্র এক ধরনের গোঙানি। কাছেই কোথাও ঝনঝন করে কাচ ভাঙল জানালার।

'মাই গড!' চেঁচিয়ে উঠল এলসি।

'আমার স্বপ্ন!' ফিসফিসিয়ে বলল মিসেস নিকারো। 'বলেছিলাম না বিপদ! ভয়ানক বিপদ আসছে! হুঁশিয়ার করেছিলাম ছেলেটাকে, শুনল না!' রবিনের উদ্দেশে বলল সে। চোখ মুদে বিড়বিড় শুরু করল ইটালিয়ান ভাষায়, প্রার্থনা করছে।

মড়মড় করে উঠল কাঠ। আবার কাচ ভাঙল। থরথর করে কাঁপছে বাড়িটা। ভূমিকম্পের মতই, কিন্তু ভূমিকম্প নয়—ভাবল রবিন। ইঞ্চি ইঞ্চি করে পিছলে সরে যাচ্ছে মোটেলের নিচের মাটি।

বিশ

দুলে উঠল ঘরটা।

মেঝেতে পড়ে ল্যাম্প ভাঙল, ইলেকট্রিকের তার ছিঁড়ে গেল, স্ফুলিঙ্গের ফুলঝুরি ছিটাচ্ছে।

'আগুন যেন না ধরে! ঈশ্বর!' প্রার্থনা করছে এলসি। 'আগুন ধরতে দিয়ো না!'

আরও ফুলঝুরি ছিটল কয়েক সেকেণ্ড, তীব্র নীলচে সাদা আলো ঝিলিক দিল। তারপর অন্ধকার। কাঠের গোঙানি বাড়ছে। রোম-খাড়া-করা কিঁচকিঁচ আওয়াজ তুলে কাঠের শরীর থেকে বেরিয়ে আসছে জোড়ার পেরেকগুলো।

ভীষণ ভাবে দুলে উঠল আরেকবার ঘরটা। চেঁচিয়ে উঠল মিসেস নিকারো।

'বাঁচাও! আল্লা!' চিৎকার শুরু করল মুসা। 'এই কেউ শুনছ? বাঁচাও!'

কেউ জবাব দিল না। সাহায্য করতে এল না কেউ।

'আর বাঁচব না!' এলসি বলল। 'পাহাড়টাই ধসে যাবে রে, আর বাঁচব না…!'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই হড়কে আরও দুই মিটার সরে গেল বাড়িটা। অন্ধকারে এদিক ওদিক ছিটকে পড়ল চেয়ারগুলো। মুসা গিয়ে পড়ল বিছানার ওপর, কিশোরের চেয়ারটা গেল কাত হয়ে।

'মিসেস নিকারো?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'আপনি ঠিক আছেন?'

'আমাকে জিজ্ঞেস করছ? এই অবস্থায় ভাল থাকা যায়? এলসি, তুমি কোথায়?'

'মেঝেতে।'

'পুলিশ আসবেই,' কিশোর বলল। 'নিশ্চয় খবর দিয়েছে মিস্টার রোজার। রবিন, ভাল আছ? মুসা, কোথায় তুমি?'

'আছি,' গলা কাঁপছে রবিনের।

'আমি এখানে,' জবাব দিল মুসা।

অপেক্ষা করছে ওরা। শুনছে। জলস্রোতের শব্দ কানে এল, ছাত থেকে বৃষ্টির পানি গড়িয়ে পড়ার আওয়াজ নয়। বেকায়দা ভঙ্গিতে কাত হয়ে আছে কিশোর। হাত ব্যথা করছে, বাঁধা জায়গাগুলোতে। কাদা আর রাসায়নিক পাদার্থের ভেজা ভেজা একটা গন্ধ আসছে। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল সে। বুঝতে পারল, ভেঙে যাচ্ছে সুইমিং পুলের পাড়। হাজার হাজার গ্যালন পানি এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে ওদের ওপর, কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

'খাইছে! পানি আসছে কোত্থেকে!' অন্ধকারে শোনা গেল মুসার গলা।

কিশোরের মত এলসিও বুঝে গেছে কারণটা। সাহায্যের জন্যে চেঁচাতে শুরু করল আবার।

এইবার জবাব মিলল।

'ওখানে!' চিৎকার করে বলল একটা কণ্ঠ। 'ওরা ওখানে!'

দরজা খোলার চেষ্টা করল কেউ। কিন্তু আটকে গেছে ওটা। ভয়ঙ্কর আরেক দুলুনি। পুলের দিকে মুখ করা জানালাগুলো ভেঙে কাচের গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। আলো দেখা গেল। টর্চ হাতে ঘোরাঘুরি করছে দু'জন লোক। হইচই করছে। কলকল করে পানি ঢুকতে আরম্ভ করল ঘরে। ভাঙা জানালার সামনে দেখা গেল একটা মুখ।

'মিসেস নিকারোকে আগে তুলুন,' চেঁচিয়ে বলল কিশোর। 'মিসেস নিকারো!'

জানালা দিয়ে ঢুকল একজন পুলিশ। তার পেছনেই একজন ফায়ারম্যান। টর্চের আলোয় বন্দিদের অবস্থা দেখে আঁতকে উঠল সে, 'সর্বনাশ...!'

চোখের পলকে এসে মিসেস নিকারো আর এলসিকে তুলে নিল দু'জনে, বাঁধা অবস্থায়। গলা ফাটিয়ে এখনও ঈশ্বরকে ডেকে চলেছে দুই মহিলা। আরও লোক ঢুকল ঘরে। তিন গোয়েন্দাকেও বের করা হল। বাঁধন কেটে দেয়া হল সকলের। একটা মুহূর্ত আর দেরি করল না কেউ। নামতে শুরু করল পাহাড় থেকে। বার বার হোঁচট খেয়ে, পিছলে পড়ে, অনেক কষ্টে অবশেষে হাইওয়েতে নেমে এল ওরা।

সেখানে গাড়ির ভিড়, অনেক ইঞ্জিনের গুঞ্জন। সার্চলাইটের আলো যেন ঝাড়ু দিয়ে ফিরছে সমস্ত পাহাড়টাকে।

'বলেছিলাম না, ওখানেই আছে!' ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসতে লাগল রোজার। কাছে এসে কিশোরের হাত ধরে প্রায় নাচতে শুরু করল। 'আমি বলেছি ওদের, তোমরা ওখানে। যাক বাঁচা গেল। থ্যাঙ্ক গড!'

'আরি, আমার বোট!' হঠাৎ চিৎকার করে বলল মিসেস নিকারো।

বাড়িটা অন্ধকার, অফিসটাও। জেটির ধারে সাদা ট্রাকটা এখন নেই। একশো মিটার দূরে দেখা গেল ছুটন্ত আলো, টিনার।

'ডাকাত! ডাকাতেরা আমার বোট নিয়ে গেল?' চেঁচিয়ে বলল এলসি। 'যদি মনে করে থাকে...।' বাক্যটা শেষ করল না সে। দৌড় দিল জেটির দিকে।

'এস!' বলেই রবিনের হাত ধরে টানল মুসা। ছুটল এলসির পেছনে।

'মিস্টার রোজার,' কিশোর বলল। 'পুলিশকে বলুন কোস্ট গার্ডকে জানাতে। বোটের লোকগুলো আর্মস স্মাগল করছে।'

'তুমি যাও,' মিসেস নিকারো বলল। 'আমি বলছি সব।'

মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে কিশোরও দৌড় দিল।

ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে অফিসে ঢুকল এলসি। টান মেরে খুলল একটা ড্রয়ার। একটা চাবি তুলে নিয়ে মুসাকে বলল অফিসের পেছনের লকার থেকে দুটো দাঁড় নিয়ে আসতে।

হাইওয়েতে হট্টগোল শুরু হল। গর্জে উঠল একটা বড় ট্রাকের ইঞ্জিন। বিকট শব্দ করে আছড়ে পড়ে ভাঙল মোটেলটা, ভাঙা টুকরো-টাকরা ছিটকে গেল এদিক ওদিক। বাড়ি-ভাঙা জিনিসপত্রে বোঝাই হয়ে গেল রাস্তার একপাশের অর্ধেকটা। ভেঙে গেছে সুইমিং পুলের পাড়, ঢাল বেয়ে গড়িয়ে এল কাদা মেশানো পানির স্রোত। বান ডাকল যেন পথের ওপর।

সেদিকে চেয়ে মাত্র একটা মুহূর্ত নষ্ট করল এলসি। তারপর ঘুরেই দৌড় দিল বৃষ্টিভেজা ডকের দিকে। পেছনে তিন গোয়েন্দা।

'সাইমনের স্পীডবোটটা নেব আমরা,' এলসি বলল। 'টিনার চেয়ে স্পীড বেশি ওটার।'

জেটিতে বাঁধা রয়েছে একটা দাঁড়টানা নৌকা। লাফ দিয়ে তাতে উঠল এলসি। দুলে উঠল নৌকাটা। তিন গোয়েন্দাও উঠল। দড়ি কেটে দিল কিশোর। ছপাৎ করে পানিতে দাঁড় ফেলল মুসা।

'আরে, টিনার আলো কই!' এলসি বলল। দেখা যাচ্ছে না আর।

'উপকূল ধরে যাচ্ছে। মোড় নিয়েছে বোধহয়,' বলল কিশোর।

'সারেঙও না সারেঙের জাতও না বিল। পাথরে ধাক্কা লাগিয়ে বোটটা ডোবাবে আজ!'

স্পীডবোটের গায়ে লাগল নৌকা। টান দিয়ে ককপিটের তেরপল সরাল ওরা। এলসি উঠল আগে। তারপর মুসা আর রবিন। ইতিমধ্যে বয়ার সঙ্গে নৌকাটা বেঁধে ফেলেছে কিশোর। খুক করে ছোট্ট কাশি দিয়েই স্টার্ট হয়ে গেল চমৎকার ইঞ্জিন। ছুটল বোট।

বৃষ্টির বিরাম নেই। বাতাসও পাল্লা দিয়ে চলেছে। বড় বড় ঢেউ। বোটের তলায় চাপড় মেরে যেন কামানের গর্জন তুলছে। অভিজ্ঞ দক্ষ হাতে হুইল ধরেছে এলসি। গাদাগাদি করে বসে বোটের ধার আঁকড়ে ধরে রেখেছে ছেলেরা, যাতে ঝাঁকুনির চোটে উড়ে গিয়ে না পড়ে সাগরে।

আলোটা প্রথম রবিনের চোখে পড়ল। দূরে চলে গেছে। অস্পষ্ট। হাত তুলে বলল, 'ওই যায়!'

বোটের গতি আরও বাড়িয়ে দিল এলসি। উত্তাল এই সাগরে মস্ত ঝুঁকি নিয়েছে।

হঠাৎ জ্বলে ওঠা উজ্জ্বল আলো ক্ষণিকের জন্যে যেন অন্ধ করে দিল ওদের।

উত্তেজনায় এতক্ষণ খেয়াল করেনি, এখন কানে আসছে হেলিকপ্টারের রোটরে ক্যাট-ক্যাট-ক্যাট-ক্যাট। গাঢ় অন্ধকারে চাদর ফুঁড়ে কালো পানিতে বদমাশদের খুঁজে বেড়াচ্ছে সার্চলাইট।

'কোস্ট গার্ড!' এলসি বলল।

নিভিয়ে ফেলা হয়েছে টিনার আলো। কালো আকাশের পটভূমিতে কালচে একটা ছায়ার মত এখন চোখে পড়ছে ওটা। কাছে চলে এসেছে স্পীডবোট। আবছামত দেখা যাচ্ছে চলার পথে টিনার রেখে যাওয়া ফেনিল জলরেখা।

'এহ্হে!' চেঁচিয়ে উঠল এলসি। 'গভীর সাগরের দিকে চলে যাচ্ছে। শয়তানের দল! বেরিয়ে যাবে!'

একবারে হুইলের পুরো অর্ধেকটা ঘুরিয়ে দিল সে। মোড় নিতে গিয়ে বিপজ্জনক ভঙ্গিতে কাত হয়ে গেল স্পীডবোট। গোঁ গোঁ করে তীব্র প্রতিবাদ জানাল ইঞ্জিন। টিনার জলরেখা ধরে ছুটল লাফিয়ে লাফিয়ে। দেখতে দেখতে চলে এল বোটটার পাশে। রাইফেলের শব্দ শোনা গেল, স্পীডবোটকে সই করে গুলি আরম্ভ করেছে।

'ইতরের বাচ্চা!' গাল দিল এলসি।

সামনে চলে এল স্পীডবোট। শাঁ করে বেরিয়ে গেল বোটের নাকের ডগা দিয়ে। ধাক্কা বাঁচাতে গিয়ে বোটেরও নাক ঘুরিয়ে ফেলতে হল। কাত হয়ে যাচ্ছে। উল্টে যাওয়ার ভয়ে সঙ্গে সঙ্গে কমিয়ে দেয়া হল গতি।

আবার গুলির শব্দ। এবারও ব্যর্থ হল নিশানা। বোটের কাছে পানিতে পড়ল বুলেট।

এই সময় খোলা সাগরের দিক থেকে ফিরে এল হেলিকপ্টার। ওটার শক্তিশালী নীলচে-সাদা আলো যেন বিদ্ধ করল টিনাকে।

'পেয়েছে এতক্ষণে!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। তাকাল তীরের দিকে। ওখানকার আলোগুলো বেশি কাছে মনে হচ্ছে এখন।

'কিন্তু কোস্ট গার্ডদের কাটারটা কই?' জাহাজটাকে দেখার জন্যে এদিক ওদিক তাকাল এলসি।

টিনার গতি আবার বেড়েছে। এঁকেবেঁকে ছুটছে, যেন জোঁকের মত লেগে থাকা হেলিকপ্টারের আলোকরশ্মি ঝেড়ে ফেলতে চাইছে গা থেকে। তীরের দিকে গিয়ে বাঁচতে পারবে না, বুঝে গেছে, আবার মুখ ঘোরাল খোলা সাগরের দিকে।

হা-হা করে হেসে উঠল এলসি। আবার স্পীডবোটটাকে নিয়ে এল টিনার গলুইয়ের সামনে। ধাক্কা লাগার ভয়ে আবার গতি কমাতে বাধ্য হল বোটের সারেঙ।

বাঁয়ে দেখল কিশোর, মাথায় ফেনার মুকুট পরে তাথৈ নৃত্য জুড়েছে ঢেউ। ভীমগতিতে ধেয়ে আসছে বিশাল এক ঢেউ, যেন ছোটখাট এক পাহাড়।

'হুঁশিয়ার!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

বনবন করে স্টিয়ারিং ঘোরাল এলসি। কাত হয়ে উল্টে যাওয়ার অবস্থা হল স্পীডবোটটার। পানির পাহাড়ের প্রায় গা ছুঁয়ে বেরিয়ে চলে এল কোনমতে।

টিনা পারল না। গা বাঁচাতে গিয়ে পাশে কাটল। চোখা পাথরে ঘষা লেগে ছিঁড়ে রয়ে গেল অর্ধেকটা তলা। কাঠ ভাঙার মড়মড় তো নয়, মুসার মনে হল বোটটার অন্তিম আর্তনাদ। লাফ দিয়ে পানির ওপরে উঠে গেল টিনা, ঝপাং করে পড়ল আবার। চেঁচাতে শুরু করল আরোহীরা। লকলক করে উঠল কমলা-আগুনের জিভ।

'হায় হায়, আগুন লেগে গেছে!' ককিয়ে উঠল এলসি।

কাত হয়ে ভাসছে এখন টিনা, ডুবে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে আগুন। এলসি কাঁদছে। আগুনের আলোয় দেখা গেল, তার দু'গালে অশ্রুধারা। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'নিশ্চয় ফুয়েল লাইন ফেটে গেছে!'

টিনার ডেক থেকে সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ল একজন, তারপর আরেকজন। শেষে আরও দু'জন।

'নোঙরটা তুলে নাও একজনে,' কঠিন কণ্ঠে বলল এলসি। 'বিন্দুমাত্র মায়া করবে না। আমাদের বোটে যেন উঠতে না পারে।'

'পারবে না, ম্যাডাম,' কথা দিল মুসা। দু'হাতে ধরে তুলে নিয়েছে ভারি নোঙরটা।

স্পীডবোটের দিকে সাঁতরে আসতে দেখা গেল একজনকে।

'সিটের নিচে লাইফজ্যাকেট আছে,' আবার বলল এলসি। 'বের কর ওগুলো।'

রবিন আর কিশোর মিলে বের করল। একটা জ্যাকেট ছুঁড়ে দিল কিশোর। ওটা ধরে সাঁতরে আরও কাছে চলে এল বিল, স্পীডবোটে ওঠার ইচ্ছে। বাড়ি মারার জন্যে নোঙর তুলল মুসা। থেমে গেল বিল। আর কাছে আসার চেষ্টা করল না। অন্য তিনজনও স্পীডবোট থেকে দূরে রইল। একটা করে জ্যাকেট ছুঁড়ে দিল সবাইকে কিশোর।

লম্বা একটা দড়ি খুঁজে বের করল রবিন। বোটের সঙ্গে একমাথা বেঁধে দড়িটা ছুঁড়ে দিল পানিতে। যাতে ওটা ধরে ভাসতে পারে বিল আর তার তিন সঙ্গী।

দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। গ্রাস করে নিয়েছে পুরো বোটটাকেই। আলোয় আলোকিত করে ফেলেছে সাগরের একটা অংশ। বিস্ফোরণের বিকট শব্দ, উড়ে চলে গেল বোটের একাংশ, বাকিটা টুপ করে ডুবে গেল পাথরের মত।

অবশেষে এল কোস্ট গার্ডদের জাহাজ। তখনও দুর্ঘটনার জায়গায়ই অপেক্ষা করছে স্পীডবোট। দড়ি ধরে ঢেউয়ের মধ্যে খাবি খাচ্ছে চার ডাকাত। টিনা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

একুশ

এক হপ্তা পর। আবার উত্তরে চলেছে তিন গোয়েন্দা। মোড় নিয়ে সাইপ্রেস ক্যানিয়ন ড্রাইভে নামল তিনটে সাইকেল। নুমেরি'জ ইন-এ পৌছে দেখল, ওদেরই অপেক্ষা করছেন মিস্টার ভিকটর সাইমন। সাগরের দিকে মুখ করা মস্ত ঘরটায় বসে আছেন তিনি। কাচের টেবিলে খাবার সাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিম, হাসি হাসি চেহারা। ছেলেদের দেখেই ঘোষণা করল, 'আজ সব আমেরিকান খাবার। গুবারের পানাট-বাটার-মার্শম্যালো-ফ্লাফ স্যাণ্ডউইচ। রসাল ফ্র্যাঙ্কফর্টারস। বার্গার অন সানশাইন ব্র্যান বান, আর পিকি পিকল টেস্ট-ট্রিট রেলিশ।' বলে চওড়া হাসি উপহার দিয়ে বাউ করে বেরিয়ে গেল ভিয়েতনামী।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিস্টার সাইমন। 'ব্র্যাণ্ড নেম বলে টিভিতে বিজ্ঞাপন না দিলে বাজারে গিয়ে মনে হয় খাবারই কিনতে পারত না কিম।'

'খাবারগুলো দেখে কিন্তু ভালই মনে হচ্ছে,' রবিন বলল।

ভ্রূকুটি করলেন লেখক। 'পানাট-বাটার-মার্শম্যালো-ফ্লাফ স্যাণ্ডইচ খেতে পারবে তুমি?'

দ্বিধায় পড়ে গেল রবিন। 'জানি না। তবে ফ্র্যাঙ্কফর্টার খেতে পারব।'

'বাকিগুলোও না পারার কোন কারণ নেই,' মুসা বলল। 'অবশ্যই যদি শুয়োরের মাংস না থাকে।'

'শুরু করে দাও তাহলে,' বললেন সাইমন।

দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল হ্যামবার্গার আর ফ্র্যাঙ্কফর্টারগুলো। কিন্তু স্যাণ্ডউইচগুলো ছুঁয়েও দেখল না কেউ। সন্দেহের চোখে বার বার ওগুলোর দিকে তাকাচ্ছে মুসা। বলল, 'কয়েকটা খেয়ে দেখলে কেমন হয়? কিমের কথায় মনে হল, ওগুলোতেই বেশি আগ্রহ তার। না খেলে দুঃখ পাবে বেচারা।'

'পেলে আর কি করা? তাকে বুঝতে হবে, স্বাদ পায় বলেই খায় লোকে। বিস্বাদ হলে খেতে পারত না। প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ওষুধ দরকার, কিন্তু সহজে খেতে চায় কেউ?' হাত নাড়লেন সাইমন। 'খাবারের আলোচনা থাক। কেসের কথা বল। কয়েকবার ফোন করেছি এলসিকে, জবাবই দিতে চায় না। মেজাজ তেতে তার চুলের মতই লাল হয়ে আছে। বিলের কথা শুনলেই তেলেবেগুনে জ্বলে

ওঠে।'

'এত রাগ নিশ্চয় টিনার জন্যে?' মুসা বলল।

'না। পুলিশ বিলের গায়ে তাকে হাত লাগাতে দেয়নি বলে।'

হাসল কিশোর। 'বড় বাঁচা বেঁচে গেছে বিল। নাক-মুখের চামড়া আর থাকত না তাহলে। যা বড় বড় নখ দেখেছি এলসির হাতে।'

'রাগে অন্ধ হয়ে আছে মেয়েটা। ভাগ্যিস টিনার বীমা করা আছে। নইলে আত্মহত্যাই করে বসত। তোমাদের তদন্তের কথা খুলে বলবে, প্লীজ? খবরের কাগজে যা যা জেনেছি, তাতে সন্তুষ্ট হতে পারছি না। জীবনভর গোয়েন্দাগিরি করে করে স্বভাব খারাপ হয়ে গেছে, খুঁটিনাটি না জানলে এখন আর ভাল লাগে না। খালি খুঁতখুঁত করে মন।'

'কেস রিপোর্ট পড়তে চান?' রবিনের হাতে বড় একটা খাম, সেটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল। 'মিস্টার ক্রিস্টোফারের অফিসে গিয়েছিলাম। তিনি নেই। দেশের বাইরে গেছেন। এলে তারপর দেব। ইচ্ছে করলে পড়তে পারেন।'

'চাই মানে?' হাত বাড়ালেন সাইমন। 'দেখি।'

নীরব হয়ে গেল ঘরটা। কোস্ট হাইওয়েতে শোনা যাচ্ছে যানবাহনের শব্দ। পাতার পর পাতা উল্টে চলেছেন সাইমন, গভীর মনোযোগে পড়ছেন। পড়া শেষ করে তাকালেন সাগরের দিকে। বললেন, 'অনেক সময় ছোটখাটো ব্যাপারই মানুষের সর্বনাশ করে ছাড়ে। রক ওই মানিব্যাগের লোভটা না করলেই আর ধরা পড়ত না। ধরা পড়ায় অবশ্য ভালই হয়েছে। অনেক লোকের জীবন বেঁচেছে। অস্ত্রগুলো নিয়ে যেতে পারলে কত লোক যে মারা যেত জানতেই পারতাম না কোনদিন।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'বিলের মত মানুষ মেসা ডি'ওরোতে আরও আছে। আমরা শুধু অস্ত্রের একটা চালান বন্ধ করতে পেরেছি।'

'রোজারের কি খবর? সন্দেহমুক্ত হয়েছে নিশ্চয়? কাগজে তো কিছু লেখেনি।'

'হয়েছে। পুলিশের কাছে মুখ খুলেছে বিল আর তার সঙ্গীরা। গুপ্তচরগিরি আর দূতিয়ালী করত রক। বিলের গ্রুপের মত অনেক গ্রুপ আছে রিপাবলিকানদের। নেতাদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করত রক, এনে রাখত মিস্টার রোজারের ফ্রিজে। তারপর মাসে একবার প্লেনে করে যেত মেকসিকো সিটিতে, রডরিগেজদের কারও হাতে সেই টাকা দিয়ে আসত। সব না। কিছু কিছু করে রেখে দিত নিজের জন্যে, বুঝতে পারেনি কেউ।'

'রকই জিনো, তাই না?'

'হ্যাঁ। রক জিনিমুর রেনাল্ড। মায়ের দেশ মেসা ডি'ওরো। বাপের নাম

রেনাল্ড, আমেরিকান। রকের নানার নামও ছিল জিনিমুর, রিপাবলিকানদের একজন বড়সড় নেতা ছিলেন। রকের মা-ও ছিলেন বড় নেত্রী। মায়ের মৃত্যুর পর রক যোগ দেয় রিপাবলিকানদের দলে।'

'হুঁ। আচ্ছা, কি করে বুঝলে, ব্যাংক ডাকাতির কিছু টাকা রেখে দিয়েছে সে?'

'বুঝিনি, আন্দাজেই বলে ফেলেছিলাম। কিছু একটা বলে দেরি করাতে চাইছিলাম ওদের, তাই বিলের মনে সন্দেহ ঢোকানোর চেষ্টা করেছিলাম,' হাসল কিশোর। 'কাজে লেগে গেল ফন্দিটা।'

'অন্ধ কে সেজেছিল? নিশ্চয় রক?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল রবিন। 'তার গাড়ির ট্রাংকে উইগ আর মেকাপের সরঞ্জাম পেয়েছে পুলিশ। অ্যালট্র্যানটো সেজে ডাকাতি করতে যাওয়াটাকে বেশ একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার মনে করেছিল রক।'

হাসলেন সাইমন। 'ওদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার মূলে ওই রক। মাইসের কথা বল। মুভিং কোম্পানিটা একটা ভাঁওতা, তাই না? আসলে ব্যবসা করত বেআইনী অস্ত্রের?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল মুসা। 'গা ঢাকা দিয়েছে মাইস। চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ, এখনও ধরতে পারেনি।'

'এখন আসল কথাটা বল। সিনথিয়া ব্যানালিসের সঙ্গে এসবের কি সম্পর্ক?'

'কোন সম্পর্ক নেই। তার বাড়ি মেসা ডি'ওরোতে, বিলকে চেনে, ব্যস। রিপাবলিকানদের সাপোর্ট করে, তবে টেরোরিস্টদের নয়।'

'বিলের সঙ্গে ঝগড়া লাগল কি নিয়ে?'

'তাকে নিজের দলে ঢোকাতে চাইছিল বিল। সিনথিয়া রাজি হয়নি।'

'ভাল করেছে,' খামটা রবিনের হাতে ফিরিয়ে দিলেন সাইমন। 'ভাল কাজ দেখিয়েছ তোমরা। আচ্ছা, তোমাদের এই গল্প নিয়ে যদি একটা বই লিখে ফেলি, আপত্তি আছে?'

'আমাদের নেই,' বলল কিশোর। 'তবে মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারকে জিজ্ঞেস করতে হবে। আমার মনে হয় রাজি হবেন তিনি। আপনি বই লিখে দিলে ছবি বানাতে সুবিধে হবে তাঁর।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। সে-ই ভাল। আগে তাঁকে জিজ্ঞেস করে নাও,' গাল চুলকালেন লেখক। 'তা আমার সঙ্গে সাগরে বেড়াতে যাচ্ছ কবে?'

'ছিপ নেবেন তো, স্যার?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'নিশ্চয়ই।'

হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুসার সারা মুখে। 'তাহলে যখন বলবেন তখনই।'

অথৈ সাগর-১

প্রথম প্রকাশঃ আগস্ট, ১৯৯০
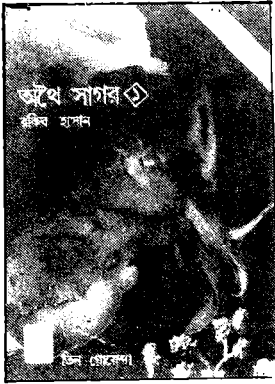
দেয়ালে ঝোলানো বিশাল একটা ম্যাপ দেখছিলেন মুসার বাবা রাফাত আমান, প্রশান্ত মহাসাগরের, শব্দ শুনে ফিরে তাকালেন।

'ও, এসে গেছ,' তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেন তিনি। মাত্র আধ ঘন্টা আগে মুসাকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিলেন কিশোর আর রবিনকে, হাজির হয়ে গেছে। কোন রকম ভূমিকা না করে ছুঁড়ে দিলেন যেন প্রশ্নটা, 'দক্ষিণ সাগরে যেতে চাও?'

'বাবাআ!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'সত্যি বলছ!'

মাথা ঝাঁকালেন রাফাত আমান। বললেন, 'আমাজান থেকে জন্তুজানোয়ার ধরে এনে ভালই কামিয়েছি, জানোই তো। আবার কিছু অর্ডার পাওয়া গেছে। ডেভিড লিসটারের নাম শুনেছ?'

'শুনেছি। ইস্পাতের ব্যবসা করে কোটিপতি হয়েছেন,' কিশোর জবাব দিল। 'কিন্তু লোহালক্কড় বাদ দিয়ে হঠাৎ জানোয়ার কেনার শখ হল কেন তাঁর?'

'নিজের বাড়িতে একটা প্রাইভেট অ্যাকোয়ারিয়াম করেছেন। সাত সাগরের আজব আজব সব জীব এনে ওখানে জিয়াতে চান। আন্দাজ কর তো, কি কি চান?'

'সী লায়ন,' রবিন বলল।

'না। জায়ান্ট অক্টোপাস।'

হাসি হাসি মুখটা নিমেষে গম্ভীর হয়ে গেল কিশোরের। 'তিরিশ ফুট লম্বা ওই দানব! কি করে ধরব? অসম্ভবকে সম্ভব করতে বলছেন তিনি।'

'শুধু তাই না,' টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন রাফাত আমান। প্যাডে পেন্সিল দিয়ে লিখে রেখেছেন নামগুলো। পড়লেন, 'একটা টাইগার শার্ক চান—বাঘা হাঙর। আরও চান একটা গারনারড, একটা গ্র্যাম্পাস, একটা সাগরের গিরগিটি, একটা ডুগং, একটা কংগার ইল—বিশাল বান মাছ, ছবি দেখেছ নিশ্চয়; দানবীয় ঝিনুক একটা চান, ওই যে, যেগুলো মানুষের পা আঁকড়ে ধরলে আর

ছাড়ানোর সাধ্য হয় না, প্রায়ই ধরে ডুবুরিদের, অনেক ডুবুরি ছুটতে না পেরে ডুবে মারা যায়। একটা ম্যানটা বা সাগরের বাদুড়ও চান…'

'খাইছে! শুনেছি ওগুলো জেলেদের নৌকা ডুবিয়ে দেয়,' হাঁ হয়ে গেছে মুসা। 'কিভাবে…'

'একটা সী সেন্টিপেড বা সাগরের শতপদী,' বলে যাচ্ছেন রাফাত আমান, ছেলের কথা যেন কানেই যায়নি, 'একটা করাত মাছ, একটা তলোয়ার মাছ, একটা রাক্ষুসে স্কুইড…হ্যাঁ,' যোগ করলেন তিনি। কিশোরের চোখ বড় বড় হয়ে গেছে দেখে মজা পাচ্ছেন, 'খুদে যে জীবগুলো সচরাচর দেখ, ওগুলো নয়, চল্লিশ ফুট লম্বাগুলো, শুঁড়ের মাথায় বাসনের সমান বড় সাকশন কাপ থাকে, পনেরো ইঞ্চি লম্বা চোখ…ওগুলোর হারামিপনায় বিরক্ত হয়ে 'চমৎকার' একটা নাম দিয়েছে জেলেরা, প্রশান্ত মহাসাগরের দুঃস্বপ্ন।'

ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেছে ছেলেরা। নিছক আনন্দ ভ্রমণে যাচ্ছে না ওরা।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'ধরতে তো পারব না, জানি। ধরা যাক, ধরলাম। এতগুলো দানবকে বাড়ি আনব কি করে?'

'একটা স্কুনার ভাড়া করবে, যেটাতে বড় বড় দু'তিনটে ট্যাংক আঁটে। ধরে ধরে রাখবে ওগুলোতে। তারপর মালবাহী জাহাজে তুলে দেবে। চলে আসবে, আর কি।'

দানব ধরার কথা ভুলে গিয়ে প্রায় নাচতে আরম্ভ করল মুসা। খুশিতে। 'আহ্, কি মজা! নিজের জাহাজে পাল তুলে দিয়ে ভেসে পড়ব সাগরে…'

'অত খুশি হয়ো না,' বাধা দিয়ে বললেন তার বাবা। 'ইয়ট নিয়ে যাচ্ছ না। একটা ফিশিং বোট ভাড়া করবে, মাঝিমাল্লা নেবে দক্ষ দেখে, সাগর আর মাছ ধরায় যাদের জ্ঞান আছে। লিসটারের অর্ডারিগুলো তো ধরবেই, এ ছাড়াও বিচিত্র যা-ই দেখবে, ধরার চেষ্টা করবে, যে-গুলোর চাহিদা আছে পাবলিক অ্যাকোয়ারিয়ামে।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন তিনি। চুপ করে কি ভাবলেন। আবার তাকালেন ছেলেদের দিকে। 'পারলে আমিও যেতাম, এতবড় একটা সুযোগ…কিন্তু উপায় নেই। হাতে অনেক কাজ। মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার একটা ছবি করছেন। আমাকে ছাড়তেই চান না, পারলে সারাক্ষণ আটকে রাখেন স্টুডিওতে।'

আবার জানালার বাইরে তাকালেন তিনি।

'কখন রওনা হচ্ছি আমরা?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'যত তাড়াতাড়ি পার,' বলে কিশোরের দিকে তাকালেন। 'আর হ্যাঁ, আজই

গিয়ে একবার প্রফেসর এনথনি ইস্টউডের সঙ্গে দেখা কোরো। আগেই বলে রেখেছেন, ওদিকে যদি তোমাদের পাঠাই, তাঁকে যেন জানাই। তোমাদের কথা সব জানেন তিনি।...তাঁকে চেন?'

'চিনি,' রবিন বলল।

'গুড। একটা গোপন কাজ বোধহয় দেবেন তোমাদেরকে। মুক্তো-টুক্তোর ব্যাপারে কিছু হবে।'

দুই

'দরজাটা বন্ধ করে দাও,' প্রফেসর ইস্টউড বললেন। 'কেউ শুনে ফেলতে পারে।'

দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসে কিশোর আর রবিনের পাশে বসল মুসা।

ডেস্কের ওপাশ থেকে পুরো ঘরে চোখ বোলালেন প্রফেসর, যেন ভয়, দেয়ালগুলোরও কান আছে। কান অনেকগুলো আছে দেয়ালে, তবে ওগুলো বধির এখন, শোনে না। বিশিষ্ট জীববিজ্ঞানীকে ঘিরে রেখেছে অসংখ্য মৃত জীবের লাশ, স্টাফ করা, দেয়ালে গাঁথা তাকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে চমৎকারভাবে। ঘরের মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত তাক, সব বোঝাই। উত্তর সমুদ্রের পাখি অ্যক, পেঙ্গুইন, টার্ন, সামুদ্রিক চাঁদ মাছ, ময়ূর মাছ, সাগর-কই, টিউনা, মুলেট, ঋষি কাঁকড়া, জেলিফিশ, পুফার, পোরপোয়েজ, শজারু মাছ আর আরও নানারকম সামুদ্রিক প্রাণী।

সাগরের প্রাণীর ওপর গবেষণা করছেন ডক্টর এনথনি ইস্টউড। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। ন্যাশনাল ওশেনোগ্রাফিক ইন্সটিটিউটের নির্বাহী সচিব। সাগর চেনেন তিনি। সাগরের মাছ চেনেন। আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, নরওয়ের বড় বড় মাছ ব্যবসায়ীরা অনেক কাজ আদায় করে নিয়েছে তাঁর কাছ থেকে, কিছু বিনে পয়সায়, কিছু টাকার বিনিময়ে, মূল্যবান তথ্য কিনে নিয়েছে। তাদের দেয়া সেই টাকাতেই পুরানো বিশাল এই প্রাসাদটা কিনে মস্ত ল্যাবরেটরি বানিয়ে নিয়েছেন। প্রায় প্রতিটি ঘরেই নানা আকারের নানা ধরনের ট্যাংক রয়েছে, ওগুলো নানা রকম মাছের আঁতুড় ঘর।

মাথা সামান্য নোয়ালেন ধূসর-চুল প্রফেসর, যাতে ট্রাইফোকাল লেন্সের ভেতর দিয়ে ভালমত দেখতে পারেন কিশোর অতিথিদের।

'আমান বলল, প্রশান্ত মহাসাগরে নাকি বেড়াতে যাচ্ছ তোমরা,' হাসলেন প্রফেসর। 'কিছু সামুদ্রিক জীব ধরারও চেষ্টা করবে। খুব কঠিন আর বিপজ্জনক কাজ। বয়েস কম তোমাদের। পারবে?'

'পারব, স্যার,' গভীর আত্মবিশ্বাস ফুটে বেরোলো কিশোরের কণ্ঠে। 'আমাজানের জঙ্গলে গিয়ে ভয়ঙ্কর অ্যানাকোণ্ডা আর মারাত্মক হিংস্র জাগুয়ার ধরে এনেছি এই আমরা তিনজন।' ভীষণ অরণ্যে সেই রোমাঞ্চকর অভিযানের কাহিনী সংক্ষেপে তাঁকে বলল সে।

'বেশ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন প্রফেসর। 'আমানকে আমি বহু বছর ধরে চিনি। তার ওপর আস্থা আছে আমার। তোমাদের কথা বলেছে আমাকে। বয়েস এত কম হবে ভাবিনি···যাকগে, সে যখন বলেছে, ঠিকই বলেছে। ফিল্ম ডিরেক্টর ডেভিস ক্রিস্টোফারকে ফোন করেছিলাম, সে-ও শতমুখে প্রশংসা করল তোমাদের। ওর মত লোককে অবিশ্বাস করতে পারি না। শোন, হাইলি কনফিডেনশিয়াল একটা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করব এখন। ডেনজারাস! দু'বার মরতে মরতে বেঁচেছি এর জন্যে। তিনবার আমার এই ঘরে হানা দিয়েছে চোর, ফাইলপত্র তছনছ করেছে, রাতের বেলা। খুঁজে পায়নি অবশ্য, কারণ কোন কাগজে লিখিনি ওই তথ্য, লেখা আছে এখানে,' নিজের কপালে টোকা দিলেন তিনি।

'তোমাদের জানাব সেকথা,' বললেন তিনি। 'জানলেই বিপদ, জীবন বিপন্ন হবার ভয় আছে। যতক্ষণ না জানছ, ভাল আছ। সে-তথ্যের জন্যে হয়ত অত্যাচার করে তিলে তিলে মারা হবে তোমাদের। ভেবে দেখ এখন, ঝুঁকি নেবে কিনা?' একে একে তিনজনের মুখের দিকে তাকালেন প্রফেসর।

আড়চোখে একবার দুই বন্ধুর মুখের দিকে তাকাল গোয়েন্দাপ্রধান। রবিন স্তব্ধ, মুসার চেহারা ফ্যাকাসে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কিশোর। শান্তকণ্ঠে বলল, 'সব খুলে বলুন।'

দীর্ঘ এক মুহূর্ত কিশোরের চোখে চোখে তাকিয়ে রইলেন প্রফেসর। তারপর হাসি ফুটল মুখে। 'নাহ্, আণ্ডার এস্টিমেট করেছিলাম তোমাদের, কম বয়েসী বলে ভুল করেছি। আমান আর ক্রিস্টোফার ঠিকই বলেছে। মনে হচ্ছে পারবে তোমরা।' ডেস্কের ড্রয়ার থেকে একটা ম্যাপ বের করে টেবিলে বিছালেন তিনি। মেরুদণ্ডে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল কিশোরের। জলদস্যুর গুপ্তধন? সাগরের কোন দুর্গম এলাকায় সেই ধন নিয়ে ডুবে গেছে কোন স্প্যানিশ জাহাজ? ম্যাপটা কি তারই নকশা?

সামনে ঝুঁকে ম্যাপটা দেখল সে। ও, না, নকশা নয়। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক কোম্পানির করা একটা ম্যাপ, পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের, হাওয়াই থেকে তাইওয়ান পর্যন্ত আঁকা রয়েছে। ম্যাপটা বেশ বড় আর আধুনিক, ছোট ছোট অসংখ্য দ্বীপ দেখানো রয়েছে, যেগুলো সাধারণ ম্যাপে থাকে না।

চেয়ার থেকে কিছুটা উঠে রবিনও দেখল। কয়েকটা দ্বীপের নাম জানে,

হাওয়াই, তাহিতি, সামোয়া, ফিজি। বেশির ভাগই জানে না, বিশেষ করে লাল পেন্সিল দিয়ে গোল দাগ দেয়াগুলো, প্রফেসর দিয়েছেন। যেমন, পোনাপে, ট্রাক, ইয়্যাপ, ওলোল, লোস্যাপ, প্যাকিন, পিনজিল্যাপ। অদ্ভুত আরও কিছু নাম রয়েছে, কতগুলোর নাম উচ্চারণ করাই কঠিন।

কয়েকটা দ্বীপ ঘিরে রয়েছে গোল একটি মাত্র দাগ। সেটাতে পেন্সিল ঠুকে প্রফেসর বললেন, 'এই যে জায়গাটা, একে বলে প্রশান্ত মহাসাগরের অন্ধ অঞ্চল। এখানে রয়েছে পঁচিশ হাজারের মত প্রায় অচেনা দ্বীপ। জাপানীরা দখল করে রেখেছিল এগুলো, বহুবছর বাইরের কোন জাহাজকেই ঘেঁষতে দেয়নি এই এলাকায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এগুলোর হাতে গোনা কয়েকটা দ্বীপে লড়াই হয়েছিল ওদের, মিত্রবাহিনীর সঙ্গে। জাপান হেরে যায়। দ্বীপগুলো দেখাশোনার ভার এখন আমেরিকার ওপর। কয়েকটা দ্বীপে আমেরিকান নৌবাহিনীর ঘাঁটি স্থাপিত হয়েছে। হারানো পৃথিবীই বলা চলে অঞ্চলটাকে।

'তবে ওই হারানো পৃথিবীই আমার জন্যে স্বর্গ, তোমাদের জন্যেও হবে, কারণ, দুর্লভ জলজ জীব ধরতে যাচ্ছ তোমরা। আমার কাছে প্রিয় হবার আরেকটা বড় কারণ, ওখানেই রয়েছে আমার মুক্তার খামার।'

'মুক্তা!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'আস্তে বল,' চট করে ঘরের চারপাশে চোখ বোলালেন প্রফেসর, কেউ শুনে ফেলল কিনা দেখলেন বোধহয়। পেন্সিলের মাথা রাখলেন পোনাপে নামের দ্বীপটার ওপর। 'এটার উত্তরে—ঠিক কত দূরে বলতে পারব না—ছোট একটা অ্যাটল্ আছে। কেউ থাকে না ওখানে। এত ছোট, ম্যাপে দেখানোরও প্রয়োজন বোধ করেনি। জাহাজ চলাচলের পথ থেকে দূরে, কাজেই নটিক্যাল চার্টেও দেখায়নি। নাম ছিল না। সুতরাং নাম একটা আমিই রেখেছি, পার্ল ল্যাগুন। ওই ল্যাগুনে গবেষণা চালিয়েছিলাম কিছুদিন।

'পৃথিবীর সব চেয়ে সুন্দর মুক্তা ফলানো হয় পারশিয়ান গালফ-এ। বছর পাঁচেক আগে ওই গালফ থেকে বিশ হাজার ঝিনুক সংগ্রহ করে পার্ল ল্যাগুনে নিয়ে যাই আমি, প্রাকৃতিক পরিবেশে ওই ঝিনুক থেকে কি-রকম মুক্তা হয় দেখার জন্যে। ওই ঝিনুকের জন্যে প্রচুর খাবারও নিয়ে যাই। পারশিয়ান গালফ-এর পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেয়েছি পার্ল ল্যাগুনে। আমার বিশ্বাস ছিল, ওখানেই ওই ঝিনুকের চাষ সফল হলে আরও অনেক জায়গায় করা সম্ভব হবে।

'আমার পরীক্ষা সফল হয়েছে কিনা দেখার সময় হয়েছে এখন। সময়ের অভাবে যেতে পারছি না আমি, খরচ দিয়ে যে কাউকে পাঠাব, সে সামর্থ্যও নেই। তোমরা যখন ওদিকেই যাচ্ছ, পারলে একবার পার্ল ল্যাগুনে যেও, আমার ঝিনুক

খেত থেকে কিছু নমুনা নিয়ে এস। তোমরা যেখানে যাবে, তার থেকে কিছুটা দূরেই হবে ল্যাগুনটা। তবে ওইটুকু যেতে আসতে যা খরচ লাগে, সেটা আমি দিতে পারব। 'পারবে যেতে?'

'শুনে তো ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে,' কিশোর বলল। 'কিভাবে যেতে হবে? কি কি চিহ্ন দেখে বুঝব ওটা পার্ল ল্যাগুন?'

'বলছি। এটাই আমার সিক্রেট।' চারপাশে চোখ বোলালেন আবার। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন কিশোরের দিকে। 'কেউ শুনে ফেলছে না তো? আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, শুনছে!'

'আমার অবশ্য তা মনে হচ্ছে না,' হাসল কিশোর। 'তবে বলাও যায় না। যেভাবে জিনিসপত্র গাদাগাদি করে রেখেছেন, বাগ লুকানো থাকতেও পারে। খুঁজে বের করা মুশকিল।' স্টাফ করা প্রাণীগুলো দেখাল। 'ওগুলোর কোনটার ভেতরও থাকতে পারে।'

কিশোরের হাসিটা ফিরিয়ে দিতে দিতে চেয়ারে হেলান দিলেন প্রফেসর। 'যাকগে, অত ভেবে লাভ নেই। আমিও বোধহয় বেশি বেশি কল্পনা করছি। ভয় পাচ্ছি। ভয় পাওয়ার কারণও অবশ্য আছে। হুমকি দিয়ে উড়ো চিঠি আসা, রাতে ল্যাবরেটরিতে চোর ঢোকা…হ্যাঁ, কি যেন বললে? বাগ?'

'এক ধরনের প্রেরক যন্ত্র, স্যার। স্পাইরা বলে বাগ।'

'অ। পুরানো ডিকটোগ্রাফের মত জিনিস। ওকথা আমিও ভেবেছি। অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি, পাইনি। থাকলে থাকবে, কি আর করা? যা যা বলেছি তোমাদের, সবই হয়ত শুনে ফেলেছে ব্যাটারা। শুনুক। আসল কথাটা আর শুনতে দিচ্ছি না।'

প্যাড থেকে একটানে ফড়াৎ করে একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে পেন্সিল দিয়ে লিখলেনঃ নর্থ ল্যাটিচিউড ১১.৩৪। ইস্ট লংগিচিউড ১৫৮.১২।

কাগজটা ঠেলে দিলেন ছেলেদের দিকে।

'এই প্রথম এটা লেখা হল,' বললেন তিনি। 'এবং আশা করি এই শেষ। মুখস্থ করে নাও। এই অবস্থানে রয়েছে পার্ল ল্যাগুন। কখনও কোন কাগজে লিখবে না, কারও সামনে ঘুণাক্ষরেও উচ্চারণ করবে না।'

একবার পড়েই মুখস্থ হয়ে গেল কিশোরের, অসাধারণ তার স্মৃতিশক্তি। কয়েক বার পড়ে রবিনেরও মুখস্থ হল। সময় লাগল মুসার। মনে মনে পড়েই চলেছেঃ উত্তরে ল্যাটিচিউড এগারো ডিগ্রি চৌত্রিশ মিনিট। পূর্বে লংগিচিউড একশো আটান্ন ডিগ্রি বারো মিনিট।

মুখস্থ হয়েছে কিনা, জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর। তিনজনেই মাথা ঝাঁকাতে

কাগজটা টেনে নিয়ে উল্টোপিঠে একটা নকশা এঁকে বোঝালেন, 'এই হল ল্যাগুন। এদিকটা উত্তর। এইখানে রয়েছে ঝিনুকের খেত।' ল্যাগুনের উত্তর-পুব কোণে পেন্সিলের মাথা রাখলেন তিনি। 'দেখে নাও ভাল করে।'

নকশাটা মনে গেঁথে নিতে লাগল কিশোর।

'হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

ম্যাচের কাঠি জ্বেলে কাগজটার এক কোণে আগুন ধরালেন প্রফেসর। পুড়ে ছাই হয়ে গেল পুরোটা কাগজ। সেটা হাতের তালুতে রেখে আঙুল দিয়ে টিপে টিপে মিহি গুঁড়ো করে ফেললেন। তারপর উঠে গিয়ে হাত ধুলেন বেসিনে। ছাইগুলো পানির সঙ্গে মিশে চলে গেল নর্দমায়।

প্রফেসরের বাড়ি থেকে বেরোল তিন গোয়েন্দা। বাইরে ইয়ার্ডের পুরানো ছোট ট্রাক নিয়ে অপেক্ষা করছে বোরিস। ওটাতে করেই এসেছে ছেলেরা।

ট্রাকে ওঠার সময় খেয়াল করল কিশোর, পাশের বাড়ি থেকে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে এল একজন লোক। তার চেহারা দেখতে পেল না সে। মনে রাখার মত তেমন কোন বিশেষত্বও নেই শরীরের, শুধু পিঠ সামান্য কুঁজো—হাঁটার কারণেও এমনটা হতে পারে। সোজা গিয়ে কালো একটা সেডান গাড়িতে উঠল লোকটা।

লোকটাকে লক্ষ্যই করত না কিশোর, যদি না প্রফেসরের সাবধানবাণী মন জুড়ে থাকত তার—ডেনজারাস! তিনবার মরতে মরতে বেঁচেছি...অত্যাচার করে তিলে তিলে মারা হবে তোমাদের...তার মনেও সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছেন প্রফেসর।

সারাটা পথ চুপ করে রইল কিশোর। একটা কথাও বলল না। স্যালভিজ ইয়ার্ডে পৌঁছল ট্রাক। মোড় নিয়ে গেটে ঢুকছে, এই সময় কালো সেডানটা চোখে পড়ল ওর, রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে। অস্ফুট একটা শব্দ করে উঠল সে।

'কি হল?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'উঁ! না, কিছু না,' হাসল কিশোর। 'প্রফেসরের সন্দেহ রোগে আমাকেও ধরেছে। কালো একটা গাড়ি দেখলাম, কিন্তু তাতে কি?' প্রশ্নটা যেন নিজেকেই করল সে। 'কালো সেডান আমেরিকায় অনেক আছে, রকি বীচেও।'

মনকে বোঝানোর চেষ্টা করল বটে গোয়েন্দাপ্রধান, কিন্তু দুশ্চিন্তা দূর করতে পারল না। হয়ত ওদেরকে প্রফেসরের বাড়িতে ঢুকতে দেখেছে চোরদের কেউ, বেরোতে দেখেছে। ঘরে বাগ লুকিয়ে রেখে তাদের কথাও শুনেছে। আর তা হয়ে থাকলে, প্রফেসরের শত্রু এখন ওদেরও শত্রু হয়ে গেল। কালো গাড়িতে করে ট্রাকের পিছু পিছু এসে জেনে গেল, ওরা কোথায় থাকে।

এরপর কি করবে লোকটা? হয়ত…

'দূর! কি আবোল-তাবল ভাবছে? এত হয়ত হয়ত করছে কেন?' নিজেকে ধমক লাগাল কিশোর। মন থেকে সমস্ত সন্দেহ আর দুশ্চিন্তা ঝেড়ে বিদেয় করার চেষ্টা করল।

তিন

রাজহংসীর মত ভেসে চলেছে 'মর্নিং স্টার' কিশোর বাংলা নাম রেখেছে 'শুকতারা'। ঘোষণা করে দিয়েছে, যতদিন স্কুনারটা তাদের অধিকারে থাকবে, শুকতারা বলেই ডাকবে ওটাকে। রবিন আর মুসা আপত্তি করেনি। ক্যাপ্টেন কিছুক্ষণ গাঁইগুঁই করে শেষে মেনে নিয়েছে। কিশোর বুঝিয়ে দিয়েছে তাকে, যেহেতু জাহাজটা ভাড়া নিয়েছে ওরা, ওটার ওপর সর্বময় কর্তৃত্ব এখন ওদের।

দুরন্ত গতিতে ছোটার জন্যেই যেন জন্ম হয়েছিল জাহাজটার। সমকক্ষ টিউনা শিকারি আর কোন জাহাজই পারে না শুকতারার সঙ্গে, মাছ নিয়ে বন্দরে ফেরার প্রতিযোগিতায় হেরে যায়। তিনকোনা মারকোনি পালের কারণেই গতি এত বেড়েছে এটার। এ ধরনের পাল স্কুনারে সাধারণত দেখা যায় না, সম্ভ্রান্ত রেসিং ইয়টগুলোতেই লাগানো হয়। কিন্তু শুকতারা সাধারণ স্কুনার নয়। বোট রেসেও অংশগ্রহণ করেছে। তিনটে পাল ছাড়াও রয়েছে অকজিলারি ইঞ্জিন, বাতাস পড়ে গেল, কিংবা সরু চ্যানেলের ভেতর দিয়ে চলার সময় ওই ইঞ্জিন ব্যবহার হয়–সাধারণত পাল যেখানে কাজ করে না। কিন্তু বাতাস থাকলে, আর তিনটে পালেই হাওয়া লাগলে যে গতি পায়, ইঞ্জিনের পুরো ক্ষমতা নিংড়েও তার অর্ধেক হবে না। এই তো এখনই সতেরো নট গতিতে ছুটছে, অথচ যেন গায়েই লাগছে না ওর।

ডেকে দাঁড়িয়ে আছে তিন গোয়েন্দা। এরকম একটা জাহাজের সাময়িক মালিক হতে পেরে গর্বে ফুলে উঠেছে বুক। নৌকা-জাহাজ সম্পর্কে মুসার জ্ঞান বেশি, স্কুনারটা সে-ই পছন্দ করেছে। টাকা এসেছে তার বাবার পকেট থেকে অর্ধেক, বাকিটা কিশোরের চাচা রাশেদ পাশার কাছ থেকে। দু'জনে শেয়ারে ব্যবসা করে, জন্তুজানোয়ার ধরে বিক্রি করার, স্কুনারটার মালিক ক্যাপ্টেন ইজরা কলিগ। জাতে জেলে, দক্ষ নাবিক, ক্যাপ্টেন উপাধিটা নিজেই নিজের নামের আগে বসিয়ে নিয়েছে।

শুকতারাতেই আছে সে। ক্যাপ্টেন হিসেবে এসেছে, তার জন্যে আলাদা পয়সা দিতে হবে। ষাট ফুটি একটা জাহাজ সামলানো এমনকি মুসার পক্ষেও সবসময় সম্ভব না। তাছাড়া যাচ্ছে ওরা অচেনা সমুদ্রে, দক্ষ একজন নাবিকের

দরকার আছে। জাহাজের মাঝি-মাল্লা রয়েছে আরও দুজন, দুজনেই তরুণ। একজনের নাম জামবু, ডাকনাম না ছদ্মনাম কে জানে, আসল নাম বলতে নারাজ। রোদে-পোড়া শরীর, কর্কশ চেহারার মতই যেন চরিত্রটাও। আরেকজন বাদামি চামড়ার এক দানব, নাম কুমালো, বাড়ি দক্ষিণ সাগরের ছোট্ট এক দ্বীপে, রায়াটি। এক বাণিজ্যিক জাহাজের চড়ে এসেছিল আমেরিকায়, স্যান ফ্র্যান্সিসকোয় নেমেছিল। ঘুরেছে অনেক শহর, স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে, স্বর্গ খুঁজে পায়নি শ্বেতাঙ্গদের দেশে, অথচ গল্প অনেক শুনেছিল। তাই প্রথম সুযোগেই ফিরে চলেছে আবার নিজের দেশে। স্কুনারটা পলিনেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের দিকে যাবে শুনেই আর দ্বিরুক্তি করেনি, মাল্লার চাকরি নিয়ে উঠে পড়েছে।

সামনের ডেকের নিচে ছোট্ট কেবিনে গাদাগাদি করে ঘুমাতে হবে তিন নাবিককে। তিন গোয়েন্দার থাকার জায়গা আরও কম, পেছনের ডেকের নিচে। জায়গা অনেকই ছিল, ছেড়ে দিতে হয়েছে বিশাল ট্যাংকগুলোর জন্যে, যেগুলোতে জলজ প্রাণী জিয়ানো হবে। দুটো কেবিনের মাঝামাঝি বসানো হয়েছে ওগুলো।

খুদে গ্যালিটাকে ব্যবহার করা হবে রান্নাঘর হিসেবে। একটা প্রাইমাস স্টোভ আছে। স্টোররুমে আর একরত্তি জায়গা নেই, খাবারের বাক্স, বস্তা, টিনে বোঝাই। আছে মাছ আর অন্যান্য জানোয়ার ধরার নানারকম সরঞ্জাম--জাল, হারপুন, বড়শি, সুতা, আরও অনেক কিছু।

তিনটে মাস্তুলের বড়টাতে, অর্থাৎ প্রধান মাস্তুলের অনেক ওপরে লাগানো রয়েছে একটা মাচামত, ক্রো'জ-নেস্ট, কিশোর বলে কাকের বাসা। ওখানে উঠে বসে চোখ রাখা যায় দূরে, শিকার খুঁজে বের করা সহজ হয়।

সামনের গলুইয়ে রয়েছে পুলটি--লম্বা একটা তক্তা ঠেলে বেরিয়ে গেছে কয়েক ফুট সামনে, লোহার মোটা পাত দিয়ে ওটাকে জায়গামত ধরে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনেক ফিশিং বোটেই থাকে ওরকম পুলপিট। হারপুন হাতে ওটার মাথায় গিয়ে দাঁড়ায় শিকারি, পানিতে মাছের খোঁজ করে। চোখে পড়লেই পলকে ছুঁড়ে মারে হারপুন, গেঁথে তোলে মাছ। ওখানে দাঁড়ালে রোমাঞ্চকর অনুভূতি হয়, আশ্চর্য এক ভাল লাগা। মাথার ওপরে খোলা আকাশ, পায়ের তলায় ছুটন্ত সাগর, মাঝে একটা তক্তা ছাড়া আর কিচ্ছু নেই। পানির অনেক নিচে দৃষ্টি যায় এখানে দাঁড়ালে, স্পষ্ট চোখে পড়ে সাগর-জীবন।

পালা করে কয়েকবারই পুলপিটে দাঁড়িয়েছে তিন গোয়েন্দা। অবাক হয়ে ভেবেছে, কি জানি কি চোখে পড়ে যায়? অচেনা কিছু দেখা যেতেই পারে। কারণ প্রফেসর ইস্টউড বলেছেন, 'প্রশান্ত মহাসাগরে যত প্রাণী আছে, তার অর্ধেকের বেশি হয়ত এখনও অপিরিচিত মানুষের কাছে। মানুষ জানেই না, আছে ওগুলো।'

বিশাল এই জলাশয়ের সব চেয়ে বেশি যেখানটায় চওড়া, এগারো হাজার মাইল; গড় গভীরতা তিন মাইল, কোন কোন জায়গা আরও বেশি, ছয়টা গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন একসাথে জোড়া দিয়ে ডোবালেও ডুবে যাবে। লক্ষ লক্ষ দ্বীপ রয়েছে এর বুকে, নামকরণ হয়েছে মাত্র তিন হাজারের। মহাসমুদ্রের এই অসীম জলরাশি কত হাজারো রহস্য এখনও লুকিয়ে রেখেছে বিজ্ঞান আর মানুষের অগোচরে, কে জানে!

হুইল ধরেছে ক্যাপ্টেন ইজরা কলিগ। ছোট নীল চোখে শেয়ালের ধূর্ততা। রোদে পোড়া, বৃষ্টিতে ভেজা মুখের বাদামি চামড়া দেখে আর বোঝার উপায় নেই মূল রঙ কি ছিল। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে বিনাকল-এ রাখা কম্পাসের দিকে।

'এই রকম বাতাস থাকলে সহজেই পোনাপের পাশ কাটাতে পারব,' একসময় বলল কলিগ।

'কেন, বাতাস গোলমাল করার সম্ভাবনা আছে নাকি?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'আছে। একটা অশ্ব অক্ষাংশ। বাতাসের মতিগতি বোঝা মুশকিল। এরকম থাকে না। হাওয়াই ছাড়ানোর পর নিশ্চিন্ত। বাতাস মোটামুটি এক থাকে ওখানে, দুর্ঘটনার ভয় কম।'

'দুর্ঘটনা?' পায়ে পায়ে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে রবিন, কথা শোনার জন্যে। 'কি দুর্ঘটনা?'

'হারিক্যান। সর্বনাশ করে ছাড়ে।'

'এখন কি হারিক্যানের মৌসুম নাকি?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ। থাক, ওসব অলক্ষুণে কথা বলার দরকার নেই। হয়ত কিছুই ঘটবে না।' কিশোরের মুখের ওপর তীক্ষ্ণ শেয়াল-দৃষ্টি নাচাল কলিগ। 'এত টাকা খরচ, এত সাজসরঞ্জাম···ওদিকে কি দরকার? শুধুই জানোয়ার ধরা, না অন্য কিছু?'

হঠাৎ সন্দেহ হল কিশোরের। তথ্য জানতে চাইছে ক্যাপ্টেন? নাকি জানতে চাওয়ার ভান করছে শুধু, যা জানার জেনে ফেলেছে ইতিমধ্যেই? তাকে তো বলা হয়েছে, জলজ জানোয়ার ধরতে যাচ্ছে ওরা। তাহলে হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন? মুক্তা খেতের কথা জানে নাকি লোকটা?

জবাব দিল না কিশোর। সরে এল ওখান থেকে। জাহাজের পালে হাওয়া লাগার পর থেকে যে ভাল লাগাটা ছিল, দূর হয়ে গেছে, মনের কোণে ভারি হয়ে উঠছে সন্দেহের কালো মেঘ।

প্রায় ভুলেই গিয়েছিল কালো সেডানের সেই লোকটার কথা। বাড়ি থেকে বন্দর পর্যন্ত কেউ তাদেরকে অনুসরণ করেনি। জাহাজ খোলা সাগরে বেরিয়ে আসার পর সে মনে করেছিল, শয়তানকে পিছে ফেলে এসেছে। সামনে শুধুই

আনন্দ, আর রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার।

এখন মনে হল, ভুল করেছে। নতুন করে তাকে ভাবিয়ে তুলল ক্যাপ্টেন ইজরা কলিগ। জামবুকে সন্দেহ করল, লোকটা কেন আসল নাম বলতে চায় না? সন্দেহ হল কুমালোকে, লোকটা কি সত্যিই দেশে ফিরে যাওয়ার জন্যে শুকতারায় উঠেছে? নাকি দক্ষিণ সাগরে ওদের সঙ্গে চলেছে প্রফেসরের মুক্তা খেতের সন্ধানে? কাকে ছেড়ে কাকে সন্দেহ করবে বুঝতে পারছে না সে। জামবু আর কুমালো, দু'জনকেই চাকরি দিয়েছে ইজরা কলিগ। তিনজনই কি একদলে?

'কি হল?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল মুসা।

হাসল কিশোর। তার সন্দেহের কথা বলে এখনই দুই সহকারীকে ঘাবড়ে দিতে চায় না। 'না, কিছু না···ঝড়ের কথা শুনে ভাবছি···ওই দেখ, মেঘ।'

'বিশেষ সুবিধের লাগছে না,' আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল রবিন। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে একটুকরো কালো মেঘ। 'নামবেই বোধহয়।' তার কথা শেষ হতে না হতেই ঝরঝর করে ঝরে পড়ল ক'ফোঁটা। বোঝা যায়, আরও ঝরবে।

'বৃষ্টি!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'তারমানে গোসল। খাইছে, গায়ে যা গন্ধ হয়ে গেছে না। বাড়ি থেকে বেরোনোর পর আর গা ধোয়ার সুযোগ পাইনি।'

ছুটে কেবিনে চলে গেল সে। খানিক পরেই বেরিয়ে এল কাপড় খুলে, পরনে শুধু একটা জাঙ্গিয়া। হাতে সাবান।

বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে লাগল। শরীর ভিজিয়ে নিয়ে সাবান দিয়ে জোরে জোরে গা ঘষতে শুরু করল মুসা। সাদা ফেনায় ঢেকে ফেলল পা থেকে মাথা পর্যন্ত। ইতিমধ্যে কমে গেছে বৃষ্টি। আবার নামার অপেক্ষা করতে লাগল সে উৎকণ্ঠিত হয়ে। চোখ বোজা। দেখতে পেল না, মাথার ওপর থেকে সরে গেছে মেঘের টুকরোটা। একটা ফোঁটাও পড়ছে না আর।

সাবানের ফেনার একটা স্তম্ভ হয়ে যেন দাঁড়িয়ে আছে মুসা। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে। তার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসছে কিশোর আর রবিন। কলিগও তাকিয়ে আছে, মজা পাচ্ছে।

আরেকটু মজা করার লোভ ছাড়তে পারল না রবিন। হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, 'মুসা, দেখ দেখ!'

কি হয়েছে দেখার জন্যে চোখ মেলল মুসা। প্রায় সাথেসাথেই বন্ধ করে ফেলল আবার। চোখে সাবান ঢুকে জ্বলুনি শুরু হল। চেঁচাতে শুরু করল সে, ওরে বাবারে, গেছি! এই এই, আমাকে এক বালতি পানি এনে দাও না কেউ! অ্যাই···'

কেউ পানি আনতে গেল কিনা দেখারও উপায় নেই। সহ্য করতে পারল না

আর মুসা। সোজা ছুটে গেল রেলিঙের কিনারে। থমকে দাঁড়াল এক মুহূর্ত। তারপরই রেলিঙ টপকে মাথা নিচু করে ঝাঁপ দিল সাগরে।

ধুয়ে গেল সাবান। একটু আগে বৃষ্টি হয়েছে, পানি বেশ ঠাণ্ডা। কয়েক মুহূর্ত দাপাদাপি করল মুসা। তারপর ওপরে তাকিয়ে রবিনের উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ, রবিন। পানিতে নামার সাহস করতে পারছিলাম না, নামিয়ে দিয়ে ডর ভেঙেছ। চমৎকার পানি। এই কিশোর, নামবে নাকি?'

'না,' হাত নাড়ল কিশোর। 'উঠে এস, জলদি। বড় বড় হাঙর থাকে এসব অঞ্চলে।'

'থাকুকগে। হাঙরকে ভয় পাই না আমি।'

হাসল কিশোর। মুসার সাগরপ্রীতির কথা জানা আছে তার। হঠাৎ চোখ বড় বড় করে অভিনয় শুরু করল, 'ও, জানো না বুঝি? সাগরের পানিতেও ভূত থাকে। ওদের বলে খ্যাংড়া ভূত...'

ঠিক এই সময় বোধহয় পায়ে একটা মাছের বাড়ি লাগল, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল মুসা, 'ওরে বাবারে! খেয়ে ফেলল রে! খ্যাঁ-খ্যাঁ-খ্যাঁ-ংড়া ভূত...জলদি একটা দড়ি দাও! তোল আমাকে!'

চার

রাত নেমেছে সাগরে। ডেকে বসে পড়ছে রবিন আর কিশোর। মাছের আলোয়। একধারে বসে আকাশের তারা গুনছে মুসা।

ছোট একটা ট্যাংকের দু'ধারে বসেছে কিশোর আর রবিন। ট্যাংকের পানিতে সাঁতার কাটছে মাছটা, গা থেকে উজ্জ্বল আলো বেরোচ্ছে, চল্লিশ ওয়াট বাল্বের সমান আলো।

'কি, পেয়েছ?' মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল রবিন। 'নাম আছে?'

'আছে,' হাতের ম্যানুয়েলটা নেড়ে বলল কিশোর। 'লণ্ঠন মাছ। বেশ মানিয়ে নাম রেখেছে।'

মাছটার শরীরের দু'ধারে দুই সারি আলো, যেন খুদে একটা স্টিমারের আলোকিত জানালা। পিঠের ঘন কাঁটার ফাঁকে ফাঁকেও রয়েছে আলো। নাগাড়ে জ্বলছে, মিটমিটও করছে না। তবে লেজের আলোগুলো স্থির নয়, জ্বলছে-নিভছে, জ্বলছে-নিভছে।

মাছটা ধরেছে কিশোর। ঘন্টাখানেক আগে পুলপিটে দাঁড়িয়েছিল জাল হাতে। পুলপিটের লোহার রেলিঙে হেলান দিয়ে তাকিয়েছিল নিচে, তন্ময় হয়ে দেখছিল

নিচের জলজ জীবন। পায়ের তলায় মাত্র কয়েক ফুট নিচে ছুটন্ত সাগর। হঠাৎ দেখেছে আজব আলো। চোখের পলকে লাঠিতে বাঁধা জালটা ডুবিয়ে দিয়েছে পানিতে। চামচ দিয়ে শুরুয়া থেকে গোশতের টুকরো তোলার মত করে জালে করে তুলে এনেছে মাছটা।

'এই আলো দিয়ে কি করে ওরা?' জিজ্ঞেস করল মুসা। আকর্ষণীয় আলোচনা শুরু হয়েছে, কাজেই তারা গোনা বাদ।

'গভীর পানির মাছ এটা,' ম্যানুয়েল পড়ে জেনেছে কিশোর। 'শুধু রাতের বেলা ওপরে ওঠে। দিনে থাকে গভীর পানিতে, অন্ধকারে। সাগরের ওই অতোখানি গভীরে চিরকাল অমাবস্যার অন্ধকার। কাজেই ওখানে যারা বাস করে তাদের আলো দরকার হয়, এই আলোক মাছের মত।'

'কেন? পানিতে তো রোদের আলো ঢোকে। দিনের বেলা যতবার ডুব দিয়েছি, আলো দেখেছি। অন্ধকার তো ছিল না?'

'সূর্যের আলো পানিতে হাজার ফুটের বেশি নামতে পারে না,' বিদ্যে ঝাড়তে আরম্ভ করল বইয়ের পোকা রবিন। 'তুমি আর কয় ফুট নাম? বেশি গভীরে নামতে চাইলে, মানে ডীপ-সী ডাইভিঙের সময় আলাদা আলো নিয়ে যেতে হয় সঙ্গে করে। পানির মাইলখানেক নিচে থেকে শুরু হয় অন্ধকারের রাজত্ব, ঘোর কালো অন্ধকার, ওই যে কিশোর বলল, অমাবস্যা।' হেসে যোগ করল, 'শ্মশানের ভূতের মতই ওখানে আলো বয়ে বেড়ায় মাছেরা।'

গায়ে কাঁটা দিল মুসার। খানিকটা সরে বসল দুই বন্ধুর কাছাকাছি। 'লেজের আলো জ্বলে-নেভে কেন?'

'বোধহয় শত্রুকে ঠেকানোর জন্যে,' কিশোর বলল। 'তোমার চোখে হঠাৎ টর্চের আলো ফেললে কি হয়? অন্ধ হয়ে যাও না? ঠিক তেমনি। শত্রুর চোখে আলো ফেলে তাকে কিছুক্ষণের জন্যে অন্ধ করে দেয় আলোক মাছ। ওই সুযোগে পালায়।'

'হুঁম্‌ম্‌, খুব চালাক ব্যাটারা।'

নানারকম জাল বেঁধে রাখা হয় জাহাজের পেছনে। কখনও ওপরের পানি থেকে মাছ ছেঁকে তোলার জাল, কখনও গভীর পানি থেকে মাছ ধরার উপযোগী জাল। তাতে প্রতিদিনই ধরা পড়ে নানারকম মজার মজার জীব, মাছ।

গভীর পানির ছোট ছোট জীবগুলোকে ধরে ছোট একটা অ্যাকোয়ারিয়ামে আলাদা করে রেখে দেয় কিশোর।

'দাঁড়াও, মজা দেখি,' বলে ছোট একটা জাল দিয়ে আলোক মাছটাকে তুলে অ্যাকোয়ারিয়ামে ফেলল সে। সঙ্গে সঙ্গে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হল। তেড়ে এল

ওটার চেয়ে বড় প্রজাতির আরেকটা আলোক মাছ, ওটার গায়েও আলো আছে। পাখাগুলোতেও আলো। এমনকি লম্বা লম্বা গোঁফগুলো থেকেও উজ্জ্বল দ্যুতি বেরোচ্ছে।

'এটার নাম তারাখেকো,' কিশোর বলল।

'দেখেই বোঝা যায়, জীবনে অনেক তারা গিলেছে,' মন্তব্য করল মুসা। তাকিয়ে আছে ট্যাংকের দিকে। 'জলদি লণ্ঠন বের না করলে একেও খাবে।'

লণ্ঠনটাকে প্রায় ধরে ফেলেছে তারাখেকো, এই সময় ওটার চোখের কাছে লেজ নাড়ল লণ্ঠন। দপদপ করে বার কয়েক আলো জ্বলল-নিভল। ধাঁধিয়ে দিল তারাখেকোর চোখ। দ্বিধায় পড়ে গেল বড় মাছটা। এই সুযোগে ট্যাংকের একেবারে কোনায় চলে গেল ছোটটা, লুকানোর চেষ্টা করছে।

ট্যাংকে আরও অনেক মাছ আছে। কোনটার সবুজ আলো, কোনটার হলুদ, কোনটার লাল। একটার মাথা থেকে বাঁকা হয়ে ঝুলছে সরু একটা আঁকশি, মাথায় খুদে একটা বাল্ব, জ্বলছে।

কিন্তু একটা মাছের কোন আলো নেই, অথচ গভীর পানিতে বাস। ম্যানুয়েল পড়ে জেনেছে কিশোর, ওটা চির অন্ধ। কাজেই কোথায় যাচ্ছে দেখার জন্যে আলো দরকার হয় না, অন্ধ মানুষের মত লাঠি দিয়ে দেখে দেখে চলে। তবে মানুষের হাতে থাকে একটা লাঠি, আর এটার শরীরে রয়েছে বিশটা। লম্বা লম্বা, ছড়িয়ে রয়েছে চারপাশে। এগুলো দিয়ে মাছটা বোঝে কে কোথায় রয়েছে, কি করছে। চলার পথে কারও সঙ্গে ধাক্কা লাগায় না, বুঝতে পারে কোথায় রয়েছে খাবার, কোথায় শত্রু।

কিছু কিছু মাছের নাম ম্যানুয়েলেও নেই। একটা খাতায় ওগুলোর ছবি এঁকে রাখে কিশোর, পাশে নোট লেখে। বাড়িতে ফিরে লাইব্রেরিতে গিয়ে বই ঘেঁটে দেখবে, ওগুলোর উল্লেখ আছে কিনা। না থাকলে বুঝবে, তিন গোয়েন্দাই ওগুলোর আবিষ্কারক। হয়ত ওদের নামেই নাম রাখা হবে মাছগুলোর, কে জানে!

রোমাঞ্চিত হল গোয়েন্দাপ্রধান। ওরা আবিষ্কারক? বিশ্বাসই হতে চায় না। তবে ব্যাপারটা অসম্ভব নয়। উনিশশো একান্ন সালে বিকিনি অ্যাটলের কাছে মাছের ওপর গবেষণা চালিয়েছিল স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশন। চারশো একাশি প্রজাতির মাছের নমুনা সংগ্রহ করেছিল ওরা, তার মধ্যে উনআশিটাই নতুন। তারমানে প্রতি ছ'টায় একটা। ইস্, এখনও যদি তাই হত! ট্যাংকের প্রতি ছ'টা মাছের একটা...

ধুম্ম্ করে একটা শব্দে চমকে উঠল কিশোর, ছিন্ন হয়ে গেল ভাবনা। মাথার ওপরে মাস্তুলের গায়ে বাড়ি খেয়ে শব্দটা হয়েছে, ডেকে পড়ল কি যেন। ধুম্ম্

ধুম্‌ম্‌ করে আরও দু'বার শব্দ হল।

'উড়ুক্কু মাছ!' চেঁচিয়ে উঠল সে। ট্যাংকে রাখা লণ্ঠন মাছের আলো গিয়ে পড়েছে সাদা পালে। ওই আলো দেখেই আকৃষ্ট হয়েছে উড়ুক্কু মাছ। উড়ে আসছে আলো দেখে ছুটে আসা পতঙ্গের মত।

'দাঁড়াও, ধরছি ব্যাটাদের!' মাস্তুলের গায়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল মুসা। কালো একটা জিনিস ছুটে আসছে। বেসবলের মত খপ করে ধরল ওটাকে। আওয়াজ শুনে ডেকে উঠে এসেছে কুমালো। তার হাতে মাছটা তুলে দিল সে। একইভাবে আরেকটা মাছ ধরল মুসা। তারপর আরেকটা। চমৎকার! সকালের নাস্তা ভালই জমবে। উড়ুক্কু মাছের স্বাদ ভাল।

একটার পর একটা ধরছে মুসা। এই সময় উড়ে এল যেগুলো ধরেছে তার চেয়ে বড় একটা কিছু। মিস করল মুসা, কারণ শেষ মুহূর্তে গতি পরিবর্তন করেছে ওটা। ধ্যাপ করে পেটে এসে গুঁতো মারল। মনে হল, যেন হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি মেরেছে। সামনের দিকে বাঁকা হয়ে গেল তার শরীর। ডেকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে। পেট চেপে ধরেছে দু'হাতে, প্রচণ্ড ব্যথা।

তাড়াতাড়ি ট্যাংকের ঢাকনা লাগিয়ে দিল কিশোর। ঢেকে দিল আলোক মাছের আলো, যাতে আর কেউ আকৃষ্ট না হয়। ফিরে এসে ঝুঁকল মুসার ওপর।

বিড়বিড় করছে মুসা, 'আল্লাহ্, মেরে ফেলেছে...'

মুসার পেটের কাছে বড় একটা পাথরের মত জীবকে পড়ে থাকতে দেখল কিশোর। টর্চের আলো ফেলল ওটার ওপর। মাছই। যেন বিচিত্র বর্ম পরে রয়েছে।

'গারনারড,' বলল সে। 'ফ্লাইং গারনারড! মুসা, তোমার কপাল ভাল, বেঁচে গেছ।' এই মাছের অনেক গল্প পড়েছে কিশোর। রাতের বেলা হুইল ধরে থাকা নাবিকের কপালে এসে বাড়ি খায় এই মাছ। প্রচণ্ড আঘাতে বেহুঁশ হয়ে যায় নাবিক, মারাও যায় কখনও কখনও।

রক্ত পড়ছে মুসার পেট থেকে। শার্টের বোতাম খুলে দেখা গেল, গারনারডের ছুরির মত ধারালো আঁশ কাপড় কেটে চামড়ায় আঁচড় দিয়েছে।

আলাদা একটা ট্যাংকে গারনারডকে রেখে দিয়ে এল কিশোর। তারপর সে আর রবিন মিলে মুসার সেবা করতে বসল। অ্যান্টিসেপটিক দিয়ে ক্ষত পরিষ্কার করে তাতে মলম লাগিয়ে দিল।

উঠে দাঁড়াল মুসা। তিনজনে মিলে নতুন প্রাণীটাকে দেখতে গেল।

'মিস্টার লিসটারের খুব পছন্দ হবে,' খুশি হয়ে বলল কিশোর। 'আস্ত একটা ভাঁড়। উড়তে পারে, সাঁতরাতে পারে, এমন কি হাঁটতেও পারে।'

সত্যি. ট্যাংকের তলায় হেঁটে বেড়াচ্ছে গারনারড। পেটের নিচের দুটো

পাখনাকে ব্যবহার করছে পায়ের মত। কয়েকটা শান্ত কদম ফেলেই কুইক মার্চ শুরু করে। তারপর ডাবল মার্চ, তারপর একেবারে দৌড়। দৌড়ানোর সময় সামনে লতা-টতা পড়লে একটা পাকে নিমেষে হাত বানিয়ে ঠেলে সরিয়ে দেয় লতাটা। খাবার দেখলে থমকে দাঁড়ায়। ঠোকর দিয়ে তুলে নিয়ে গপ করে গিলে ফেলে।

কাণ্ড দেখে হেসে উঠল মুসা, পরক্ষণেই 'আঁউক!' করে চেপে ধরল পেট। হাসতে গিয়ে ব্যথা লেগেছে। সামলে নিয়ে বলল, 'একেবারে সার্কাসের ভাঁড়। ঠিকই বলেছ, লিসটারের পছন্দ হবে। তবে ট্যাংকের মুখ খোলা রাখলে কাঁদতেও দেরি হবে না, উড়ে এসে যখন পেটে গুঁতো লাগাবে।' পেটে হাত রাখল সে। 'আল্লায় না করুক, আমার অবস্থা না হোক ভদ্রলোকের। কিন্তু যদি হয়, আল্লাহ্, আমি যেন তখন থাকতে পারি ওখানে।'

পাঁচ

'বাদুড়! বাদুড়!' পরদিন সকালে কাকের বাসা থেকে চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'গ্যারেজের দরজার সমান একেকটা!'

রবিন মিথ্যে বলে না, তবু বিশ্বাস করতে পারল না মুসা। বাদুড় পানিতে সাঁতার কাটে না। আর গ্যারেজের দরজার সমান বড়ও হয় না। কিন্তু রেলিঙের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখে বিশ্বাস করতে বাধ্য হল। বিশাল কালো ডানা নেড়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠছে প্রাণীটা, আবার ঝুপ করে পড়ছে পানিতে।

ঘোষকের পদটা দেয়া হয়েছে রবিনকে। দিনের বেশির ভাগ সময়ই কাকের বাসায় বসে থাকে, চোখ রাখে সাগরের দিকে। আকর্ষণীয় কোন প্রাণী দেখলেই চিৎকার করে জানায়। সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে সেদিকে ছোটে জাহাজ। কাছে গিয়ে যদি দেখা যায়, ধরার উপযোগী, তাহলে ধরার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়।

হাত তুলে যেদিকে দেখাচ্ছে রবিন, সেদিকে জাহাজের মুখ ঘোরাল কলিগ। বিনকিউলার নিয়ে ছুটে এল কিশোর। মুসা তো বিশ্বাস করতে পারেনি না দেখে, দেখেও করতে পারল না। 'কী ওগুলো?' জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেনকে।

'সাগরের বাদুড়। জেলেরা বলে শয়তান মাছ।'

কালো একঝাঁক দানব খেলা জুড়েছে পানিতে। দেখেই বুঝল কিশোর, এই জিনিসই চান লিসটার, তাঁর চাহিদার তালিকায় রয়েছে এর নাম। ম্যানটা। আরেকটা নাম আছে এগুলোর, জায়ান্ট রে।

কিন্তু ধরবে কিভাবে? ট্যাংকে জায়গা হবে?

কাছে গিয়ে দেখা গেল, খেলছে না ম্যানটাগুলো। মাছ ধরে খাচ্ছে। কাছে

বিশেষ একটা ম্যানটার ওপর নজর দিল ওরা। কাত হয়ে একটা চক্র সৃষ্টি করে সাঁতার কাটছে পানিতে, একটা ডানা পানির ওপরে, আরেকটা নিচে। এক ডানার মাথা থেকে আরেক ডানার মাথা বিশ ফুটের কম না। মাথা থেকে লেজের ডগা আঠারো ফুট। একঝাঁক মুলেটকে তাড়া করেছে ওটা।

মুখের দু'পাশে দুটো লম্বা চ্যাপটা ডানার মত, কিংবা হাতও বলা যায়। ওগুলো দিয়ে মাছ ধরে ধরে ঠেলে দিচ্ছে মুখের ভেতর।

আর কি একখান মুখ! চার ফুট চওড়া। দুটো মানুষকে এক লোকমায় ঢুকিয়ে ফেলতে পারবে মুখের ভেতর।

কিন্তু কিশোর জানে, জায়ান্ট রে মানুষখেকো নয়। মাছই পছন্দ।

মানুষ খায় না বলেই যে নিরীহ, তা নয়। ভীষণ বিপজ্জনক। শোনা যায়, শূন্যে লাফিয়ে উঠে ডানা ছড়িয়ে ঝাঁপ দিয়ে এসে পড়ে নৌকার ওপর। দুই টনী দেহটা দিয়ে চেপে, বাড়ি মেরে গুঁড়িয়ে দেয় নৌকা, মেরে ফেলে আরোহীদের। চাবুকের মত লেজের বাড়ি ছুরির মত কেটে বসে চামড়ায়। কোন কোন সময় শূন্যে না উঠে নিঃশব্দে নৌকার তলায় চলে আসে ম্যানটা, তারপর ভেসে উঠে নৌকা উল্টে দেয়। আরোহীরা পড়ে গেলে ওদের মাঝে দাপাদাপি করতে থাকে। এতে মারা যায় মানুষ। যাদের ভাগ্য ভাল তারা জখম হয়।

মানুষকে ভয় করে না এরা। হয়ত ভয় করার মত বুদ্ধিই নেই। কিংবা হয়ত নিজের ক্ষমতার ওপর প্রচণ্ড বিশ্বাস। কখনও কখনও নৌকার সঙ্গে সঙ্গে মাইলের পর মাইল সাঁতরে চলে যায়, সামনে আসে, পেছনে যায়, পাশে সাঁতরায়, মাঝে মাঝে লাফিয়ে চলে যায় নৌকার একপাশ থেকে আরেক পাশে, আরোহীদের মাথার ওপর দিয়ে। দাঁড়ের বাড়ি যেন ওদের গায়েই লাগে না, ব্যথা পায় বলে মনে হয় না।

জাহাজ থেকে একবার একজন লোক একেবারে ম্যানটার মুখের ভেতর পড়ে গিয়েছিল। মানুষের স্বাদ মোটেও পছন্দ হয়নি ওটার, থুথু করে ছিটিয়ে ফেলেছিল। দানবটার নিচের পাটির দাঁতে লেগে চামড়া ছড়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন ক্ষতি হয়নি লোকটার।

জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে পালে হাওয়া লাগানো কমালো কলিগ। ধীরে ধীরে ভেসে এসে থামল ম্যানটার ঝাঁকের ভেতর। ঝুলে পড়েছে পাল, পতপত করছে অলস ভঙ্গিতে। দু'পাশে পানিতে উঠছে নামছে বড় বড় কালো ডানা। জাহাজটার সান্নিধ্য যেন পছন্দ হয়েছে দানবগুলোর। সঙ্গ ভালবাসে ওরা। সে-জন্যেই দলবেঁধে থাকে অনেক সময়। গুনে ফেলল কিশোর। মোট আটাশটা ম্যানটা।

কিশোরের বিস্ময় দেখে হাসল কলিগ। 'তারপর? কাছে তো এলাম. এখন কি

করা?'

'একটাকে জ্যান্ত ধরতে চাই।'

খোঁত খোঁত করে নাক টানল ক্যাপ্টেন। 'তা পারবে না। মেরে হয়ত তোলা যায়, জ্যান্ত ধরতে পারবে না। হারপুন বের করতে বলব?'

'না।' কিশোর চেঁচিয়ে আদেশ দিতে আরম্ভ করল বড়দের মত করে, 'মুসা, কুমালো, জলদি নিচে থেকে বড় জালটা নিয়ে এস। জামবু, ডিঙি নামাও। ক্যাপ্টেন, জাহাজ সোজা রাখুন, নড়েচড়ে না যেন।'

ভুরু কুঁচকে ফেলল কলিগ। 'কি করতে চাও?'

'বড় দেখে একটাকে ধরব। জালের একমাথা জাহাজে বেঁধে, আরেক মাথা ডিঙিতে ধরে রেখে বেড় দেব।'

'পাগল...,' থেমে গেল ক্যাপ্টেন। তার কথা শোনার জন্যে ওখানে দাঁড়িয়ে নেই কিশোর। বিড়বিড় করল সে, 'ছেলেটার মাথা খারাপ!'

ভারি জালের একমাথা শক্ত করে বাঁধা হল জাহাজের ক্যাপস্ট্যানের সঙ্গে। জালের বাকি অংশ ডিঙিতে ফেলে তাতে উঠে বসল কিশোর, মুসা আর কুমালো। দাঁড় বেয়ে সরে যেতে লাগল জাহাজের কাছ থেকে, ধীরে ধীরে পানিতে পড়ছে জাল।

জালটা যখন পুরোপুরি পড়ে সারল, ডিঙি তখন জাহাজ থেকে পঞ্চাশ ফুট দূরে। জালের আরেক মাথা শক্ত করে বেঁধে ফেলা হল ডিঙির ছোট একটা খুঁটির সঙ্গে, নোঙরের দড়ি বাঁধা হয় যেটাতে।

চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে জালে এসে ঠেকল বড় একটা ম্যানটা, ওটাকে নিশানা করেই ফেলা হয়েছে জাল। এরপর যা ঘটল এমনটি ঘটবে কল্পনাও করতে পারেনি কেউ।

ঘুরে এল ম্যানটা। নৌকাটাকে দেখলই না যেন। কাছে থেকে আরও বড় আরও ভয়ঙ্কর মনে হল ওটাকে। পানি থেকে উঠে রয়েছে জালের ওপরের অংশ।

কি করে যেন বুঝে গেল শয়তান মাছ, বাধা আছে সামনে। গতি কমাল না, বরং বাড়িয়ে দিল। বাড়ছে...বাড়ছে...স্পীডবোটের মত শাঁ শাঁ করে ছুটছে পানি কেটে।

তারপর হঠাৎ লাফ দিল শূন্যে। নিখুঁতভাবে জালটাকে পেরিয়ে গেল দশ ফুট ওপর দিয়ে। মনে হল, ঝড়ে উড়ে গিয়ে পড়ল একটা গ্যারেজের দরজা। বুম্‌ম্‌ করে বিকট শব্দ হল পানিতে পড়ার, যেন নেভির পাঁচ ইঞ্চি কামান থেকে গোলাবর্ষণ করা হয়েছে।

পানিতে পড়েই আবার ছুটতে শুরু করল ম্যানটা, নতুন একটা চক্র রচনা

করছে। তার উত্তেজনা সংক্রমিত হল অন্য দানবগুলোর মাঝেও, একের পর এক শূন্যে লাফিয়ে উঠতে লাগল ওগুলো, পানিতে পড়ছে প্রচণ্ড শব্দ তুলে। পড়েই, ডিগবাজি খেয়ে চিত হয়ে যাচ্ছে কোন কোনটা; রোদে ঝিক করে উঠছে সাদা পেট।

কোতূহলী হয়ে উঠেছে নৌকাটাকে দেখে, দেখতে আসছে কাছে থেকে।

'ব্যাটারা দল বেঁধে হামলা চালাবে!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

ক্যাপ্টেনের কথা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে কিশোর। বদ্ধ উন্মাদই কেবল ডিঙি নিয়ে আটাশটা শয়তান মাছের ঝাঁকে নামার কথা ভাববে। কিংবা বোকা লোকে, জায়ান্ট রে সম্পর্কে যার কোন জ্ঞান নেই।

আরেকটা ম্যানটা এগোচ্ছে জালের দিকে। কাছাকাছি গিয়ে লাফিয়ে না পেরিয়ে শাঁ করে মোড় নিয়ে সোজা ছুটে আসতে লাগল নৌকার দিকে। হঠাৎ বুঝি চোখে পড়ল সামনের ডিঙিটাকে। লাফ দিল শূন্যে।

আরোহীদের চোখের সামনে থেকে সূর্য আড়াল করে দিল যেন একটুকরো কালো মেঘ। মাথা নিচু করে ফেলেছে কিশোর। ভাবছে, এখুনি বিশাল বপু নিয়ে ঘাড়ের ওপর এসে পড়বে দানবটা। মুসাও মাথা নুইয়ে ফেলেছে। শুধু কুমালো পাটাতনের ওপরে বসে আছে হাসিমুখে, শান্ত। কারণটা বোঝা গেল। ডিঙিতে পড়ল না ম্যানটা। উড়ে গিয়ে পড়ল আরেকপাশে পানিতে। চাবুকের মত লেজটা বাড়ি লাগল নৌকার পাশে, গভীর একটা ক্ষত করে দিল।

কাছে এসে গভীর আগ্রহে নৌকাটাকে দেখছে আরেকটা শয়তান মাছ। আস্তে ডানা তুলে ছুঁয়ে দেখল, তাতেই থরথর করে কেঁপে উঠল ডিঙি। জোরে বাড়ি দিলে কি হত কে জানে! হঠাৎ ছুটতে শুরু করল, ঘুরে এগিয়ে যাচ্ছে জালের দিকে।

'পেয়েছি ব্যাটাকে!' চিৎকার করে বলল কিশোর।

'যদি নতুন কোন কাণ্ড না করে,' মাথা তুলল মুসা।

'আমার মনে হয় শুধু এগোতেই পারে ওরা, পিছাতে পারে না।'

পিছানোর কোন লক্ষণও দেখাল না ম্যানটা। তবে জালের কাছে গিয়ে মসৃণ ভঙ্গিতে তুলে ফেলল একটা ডানা, তারপর আরেকটা, নিখুঁত ভাবে জাল এড়াল। কিন্তু লেজটা বাধাল বিপত্তি। জালের খোপে ঢুকে গেল। লেজের ডগায় বসানো কাঁটাগুলো আটকে গেল বড়শির মত।

'বাও!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

ঝপাত করে পানিতে পড়ল দুই জোড়া দাঁড়। প্রাণপণে বেয়ে চলল মুসা আর কুমালো, জাহাজের দিকে ছুটল ডিঙি নিয়ে। দানবটার ওপর দ্রুত চেপে আসতে লাগল জাল।

কিন্তু এত সহজে ধরা দেয়ার পাত্র নয় শয়তান মাছ। দাপাদাপি শুরু করল। সে তো আর চুনোপুঁটি নয়, পানির মহারাজ। তার দাপাদাপিতে ফুলেফেঁপে উঠল পানি, প্রচণ্ড ঘূর্ণি, অসংখ্য ফোয়ারা, ভিজিয়ে চুপচুপে করে দিল ডিঙির তিন আরোহীকে। দেখতে দেখতে পানিতে ভরে গেল ডিঙির খোল। ডুবে যাওয়ার হুমকি দিচ্ছে এখন খুদে নৌকা।

ভাগ্য ভাল, বুদ্ধি করে নৌকার সঙ্গে জাল বাঁধা হয়েছিল। ধরে রাখলে সর্বনাশ হত। হ্যাঁচকা টান লেগে একবার এদিকে ঘুরছে ডিঙি, আবার ওদিকে। কয়েকবার কাত হয়েও সোজা হয়ে গেল। আর সামান্য কাত হলেই যেত উল্টে।

অবশেষে জাহাজের কাছাকাছি চলে এল নৌকা। রেলিঙে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে ক্যাপ্টেন, চোখ বড় বড়, কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে বুঝি। 'জালের দড়িটা দাও আমার হাতে!' চেঁচিয়ে বলল সে। 'কুইক!'

ডিঙির সঙ্গে বাঁধা দড়িটা খুলে ছুঁড়ে দিল কিশোর।

খপ করে ধরল ক্যাপ্টেন। তাড়াতাড়ি নিয়ে গিয়ে পেঁচিয়ে ফেলল ক্যাপস্ট্যানে।

জালের দুই মাথা-ই এখন শক্ত করে বাঁধা হয়েছে ক্যাপস্ট্যানের সঙ্গে। আটকা পড়েছে দানবটা, পালানোর পথ বন্ধ।

কারগো বুমটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সরিয়ে আনছে জামবু। প্রধান মাস্তুলের সঙ্গে লাগানো রয়েছে ওটা, এক মাথায় একটা বড় আঁকশি লাগানো। আঁকশিটা জালে আটকে দিল কিশোর।

চালু হয়ে গেল ইঞ্জিন। আঁকশিটা ওপরে উঠতে লাগল, সেই সাথে টেনে তুলতে লাগল জাল।

হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল কাকের বাসায় বসা রবিন। তার সঙ্গে গলা মেলাল বোটের আরোহীরা। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি খুশি হওয়া উচিত হয়নি ওদের। জালের মধ্যে ভীষণ দাপাদাপি শুরু করেছে ম্যানটা, এখন আর খেলাচ্ছলে নয়, মুক্তির জন্যে। ডানা ঝাড়ছে, লেজ দিয়ে বাড়ি মারার চেষ্টা করছে। শপাং করে এসে বোটে লাগল লেজের বাড়ি। নৌকার যেখানে লাগল, গুঁড়িয়ে গেল ডিমের খোসার মত।

কখন পানিতে পড়ল, বুঝতেও পারল না মুসা। মাথা তুলে চেয়ে দেখল, তার পাশেই হাবুডুবু খাচ্ছে কিশোর। দ্রুত ওকে টেনে নিয়ে সাঁতরে ম্যানটার কাছ থেকে সরে এল সে। ওপর থেকে দড়ি ছুঁড়ে দিল কলিগ। সেটা ধরে বেয়ে ডেকে উঠে এল দু'জনে।

এতক্ষণে কুমালোকে দেখতে পেল ওরা। শয়তান মাছের লেজের বাড়ি খেয়ে বোধহয় বেহুঁশই হয়ে গেছে বেচারা। ভাসছে। রক্ত বেরোচ্ছে ক্ষত থেকে।

ইতিমধ্যেই রক্তের গন্ধ পেয়ে গেছে হাঙরেরা, দূরে ভেসে উঠেছে ওদের পিঠের পাখনা। পানি কেটে ছুটে আসছে তীব্র গতিতে।

একটানে কোমরের খাপ থেকে বড় ছুরি বের করল মুসা।

বাধা দিল ক্যাপ্টেন, 'যেও না! বাঁচাতে পারবে না।'

'দূর, মরুক না ডুবে,' ঘৃণায় মুখ বাঁকাল জামবু। 'একটা কানাকার জন্যে মরবে নাকি গিয়ে?'

দ্বিধা যাও বা সামান্য ছিল মুসার, জামবুর কথায় একেবারে দূর হয়ে গেল। রাগে জ্বলে উঠল সে। ডাইভ দিয়ে পড়ল রক্তাক্ত সাগরে। দড়িটা নিতে ভুলল না। ওটার মাথা কুমালোর বুকে পেঁচিয়ে বাঁধল।

হাজির হয়ে গেল একটা হাঙর। হাত লম্বা করে ছুরিটা সোজা করে ধরে রাখল মুসা। পাশ দিয়ে ছুটে যাওয়ার সময় লাগল হাঙরের শরীরে। ওটার ঘাড়ের নিচ থেকে লেজের কাছাকাছি লম্বা হয়ে ফেড়ে গেল গভীরভাবে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। খাবি খেতে খেতে দৌড় দিল একদিকে, যন্ত্রণায় শরীর মোচড়াচ্ছে। মানুষের দিক থেকে নজর সরে গেল অন্যান্য হাঙরগুলোর। ছুটে গেল জাতভায়ের মাংস ছিঁড়ে খাওয়ার জন্যে।

দড়ি ধরে টেনে তুলে নেয়া হল কুমালোকে। পানিতে অপেক্ষা করছে মুসা, আবার দড়িটা এলে তারপর উঠবে। চোখ হাঙরগুলোর দিকে। কয়েক গজ দূরে আহত হাঙরের গা থেকে মাংস খুবলে নিচ্ছে অন্যগুলো। দেখতে দেখতে শেষ করে ফেলবে।

মুসার মনে হল, কয়েক যুগ পরে তার পাশে এসে পড়ল দড়িটা। সঙ্গে সঙ্গে ধরল। টেনে তুলে নেয়া হল ওকেও।

একবার মাত্র চোখ খুলল কুমালো, মুসাকে ধন্যবাদ জানানোর জন্যে, তারপরই মুদে ফেলল। পড়ে রইল মড়ার মত। কাকের বাসা থেকে নেমে এসেছে রবিন। সে আর কিশোর মিলে কুমালোর জখম ধুয়ে মুছে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতে লাগল।

'গেল একটা চমৎকার ডিঙি,' পানির দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ক্যাপ্টেন। জালের মধ্যে এখনও দাপাচ্ছে ম্যানটা। পানিতে আলোড়ন তুলেছে। তাতে ডুবছে ভাসছে নৌকার ভাঙা কাঠগুলো। নৌকা ভাঙার সমস্ত ঝাল গিয়ে ওটার ওপর পড়ল কলিগের। চেঁচিয়ে বলল, 'তোলো ব্যাটাকে!' যেন তুললেই বেত দিয়ে পেটানো শুরু করবে।

উঠে যাচ্ছে জাল। ওপরে, আরও ওপরে। কামড়ে কয়েক জায়গায় জাল কেটে ফেলেছে শয়তান মাছ। এছাড়া আর কোন ক্ষতি করতে পারেনি সাংঘাতিক শক্ত

জালটার। দানব ধরার জন্যেই যেন তৈরি হয়েছে ওটা। জালটাকে নামিয়ে আনা হল ট্যাংকের মুখের কাছে।

ট্যাংকের দিকে তাকিয়ে মনে মনে আন্দাজ করে ফেলল কিশোর। নাহ্, অসুবিধে কিছুটা হলেও জায়গা হয়ে যাবে ম্যানটার। সত্যিই হয়ে গেল। কিন্তু নতুন বাড়ি মোটেও পছন্দ হল না শয়তান মাছের। আবার শুরু করল দাপাদাপি। ছিটিয়ে সমস্ত পানি ফেলে দিতে লাগল বাইরে। চালু করে দেয়া হল পাম্প, পানি ভরতে লাগল ট্যাংকে। বড় ঢাকনাটা লাগিয়ে দেয়া হল, যাতে লাফিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে না পারে অতিকায় প্রাণীটা।

ট্যাংকের দেয়ালে মোটা কাচে ঢাকা জানালা রয়েছে। সবাই হুড়াহুড়ি করে এসে চোখ রাখল তাতে, ভেতরে শয়তান মাছ কি করে দেখার জন্যে।

শান্ত হয়ে গেছে জায়ান্ট রে। ট্যাংকের তলায় বিছিয়ে রয়েছে মস্ত এক কালো চাদরের মত। জালটা এখনও জড়ানোই রয়েছে শরীরে।

'খুলবে কি করে ওটা?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

দানবটার সঙ্গে আরেকবার ধস্তাধস্তি করার কোন ইচ্ছেই নেই কিশোরের। বলল, 'থাক, জালের মধ্যেই। বের করতে সুবিধে হবে। আশা করি দিন দু'য়েকের মধ্যেই হনুলুলু পৌঁছবে। তখন কোন একটা মালবাহী স্টীমারে তুলে দেব, লস অ্যাঞ্জেলেসে পৌঁছে দেবে। ট্যাংকটা দরকার আমাদের। আরেকজনের জন্যে খালি করতে হবে।'

'কার জন্যে? অক্টোপাস?'

'হয়ত। মুসা, জনাব শয়তানের বাবুর্চি নিযুক্ত করা হল তোমাকে। জন্তুজানোয়ারকে খাওয়ানোর ব্যাপারটা তুমিই ভাল বোঝ। যত পার মাছ খাওয়াবে।'

'ডিঙি তো নেই, মাছ ধরব কিভাবে?' বলেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুসার চোখের তারা। 'আছে, উপায় আছে!'

'কিভাবে?' রবিন জানতে চাইল।

'রাতেই দেখবে।'

রাতে, ডেকে বসে পালের ওপর টর্চের আলো ফেলে রাখল মুসা। আলো দেখে পাগল হয়ে গেল যেন উড়ুক্কু মাছের দল। একের পর এক এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল মাস্তুলে, পালে। বাড়ি খেয়ে অবশ হয়ে পড়ল কোনটা, কোনটা পাল থেকে গড়িয়ে পড়ল ডেকে। জমাতে শুরু করল মুসা আর কুমালো। মজা পেয়ে রবিন আর কিশোরও হাত লাগাল। দেখতে দেখতে মাছের ছোটখাট একটা স্তূপ দিয়ে ফেলল।

নিশ্চিন্ত হল তিন গোয়েন্দা। খাবারের অভাব হবে না জনাব শয়তানের।

ছয়

'স্বর্গ যে বলে, ভুল বলে না!' হাঁ করে তাকিয়ে আছে কিশোর। সৌন্দর্য যেন গিলছে। স্বপ্নিল হয়ে উঠেছে সুন্দর চোখের তারা। ডায়মণ্ড হেড ঘুরে এসেছে শুকতারা, ওয়াইকিকির ধবধবে সাদা সৈকতের পাশ কাটাচ্ছে। সবুজ নারকেল গুচ্ছ মাথা দোলাচ্ছে বাতাসে। ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে জানা-অজানা অসংখ্য গাছ। ঘন নীল সাগরের পানিতে সার্ফিং করছে সার্ফাররা। সার্ফবোর্ডে টান টান হয়ে আছে ওদের বাদামি শরীর। বিশালদেহী একেকজন।

হনুলুলু বন্দরে নোঙর ফেলল শুকতারা।

স্বপ্নের জগতে চলে এসেছে যেন ছেলেরা। পৃথিবীতে এত সুন্দর জায়গা থাকতে পারে, ভাবেইনি। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারল না ওই স্বর্গে। বড় দেখে ট্যাংক কিনল, তাতে ম্যানটাটাকে ভরে তুলে দিল লস অ্যাঞ্জেলেসগামী একটা স্টীমারে।

হাওয়াইকে যে এত ভাল বলছে ছেলেরা, এটা পছন্দ হল না কুমালোর। কথায় কথায় জানিয়ে দিল, তার বাড়ি যে দ্বীপে, সেটা আরও অনেক ভাল। ছেলেরা যখন বিশ্বাস করতে চাইল না, বিশেষ করে মুসা, রেগে গেল সে। বলল, 'দাঁড়াও না, গিয়ে নাও আগে। ওখানকার প্রবাল অ্যাটল দেখলে চোখ ফেরাতে পারবে না। ওরকম কোথায় পাবে তোমাদের এই হাওয়াই?' চওড়া বাদামি কাঁধ ঝাঁকিয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাওয়াইকে বুড়ো আঙুল দেখাল দক্ষিণ দ্বীপবাসী।

নতুন আরেকটা ডিঙি কিনে তোলা হল স্কুনারে। তারপর আবার রওনা হল শুকতারা।

মারশাল দ্বীপপুঞ্জের ছোট-বড় অসংখ্য দ্বীপের কাছাকাছি এসে তাজ্জব হয়ে গেল ছেলেরা। জলজ জীবের ছড়াছড়ি এখানকার পানিতে। তাকালেই চোখে পড়ে। জাহাজের পেছন পেছন দল বেঁধে আসছে ডলফিন। শাঁ করে জাহাজের পাশ কাটিয়ে ছুটে যাচ্ছে। ফিরে আসছে আবার। লং জাম্প দিচ্ছে, হাই জাম্প দিচ্ছে, যেন একেকটা ভাঁড়।

মস্ত এক স্পার্ম তিমি পুরো একটা দিন সঙ্গী হয়ে রইল শুকতারার।

আরেক দিন এল একটা হোয়েল শার্ক বা তিমি-হাঙর, জাতে ওটা হাঙরই, কিন্তু তিমির মত বড়। কুৎসিত চেহারা হলেও জীবটা নিরীহ, সমগোত্রের অন্যান্য প্রজাতির মত রক্তপিশাচ নয়। খেলার ছলে মাঝে মাঝেই এসে ধাক্কা মারল জাহাজের গায়ে।

রবিন জানে, জীবটা নিরীহ। ক্যাপ্টেন কলিগও বার বার বলেছে একথা। কিন্তু চেহারা এমনই বাজে তিমি-হাঙরের, ভুলতে পারেনি সে। রাতে দুঃস্বপ্ন দেখেছে। আতঙ্কে চেঁচাতে শুরু করল ঘুমের মধ্যে। জেগে উঠে দেখল ঘামে ভিজে গেছে সারা শরীর। বদ্ধ কেবিনে দম বন্ধ হয়ে এল তার। খোলা বাতাসে নিঃশ্বাস নেয়ার জন্যে উঠে এল ডেকে।

রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রাতের সাগর দেখছে মুসা। ফিরে তাকাল। 'কি হল, ঘুম আসছে না?'

'এসেছিল,' হেসে বলল রবিন। 'তিমি-হাঙরে গিলতে এল, তাই জেগে উঠে পালিয়ে এসেছি।'

চকচক করছে রাতের সাগর, যেন একটা রূপালি চাদর। এর কারণ কোটি কোটি প্ল্যাঙ্কটনের সমষ্টি, ওগুলোর শরীর থেকে বিচ্ছুরিত হয় একধরনের উজ্জ্বল আভা।

জাহাজের পেছনে জাল বাঁধাই রয়েছে। তাতে ধরা পড়ছে নানারকম বিচিত্র প্রাণী। বদমেজাজী একটা কংগার ইল ধরা পড়ল অবশেষে। তারপর একটা তলোয়ার মাছ।

মাছটাকে নিয়ে সমস্যা হল। ওপরের ঠোঁটে লাগানো মারাত্মক তলোয়ারের জন্যেই মাছটার এই নামকরণ। এই অস্ত্র দিয়ে ইচ্ছে করলে এক খোঁচায় নৌকার তলা এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতে পারে প্রাণীটা।

ধরার পর যথারীতি নিয়ে ট্যাংকে রাখা হল তলোয়ারকে। কিন্তু এক ঘন্টা যেতে না যেতেই জেল থেকে ছাড়া পাবার প্রয়াসে ট্যাংকের দেয়াল ফুটো করে দিল ওটা। সব পানি পড়ে যেতে লাগল। পানি শেষ হয়ে যাওয়ার পর চোখে পড়ল ব্যাপারটা। শুকনো ট্যাংকের তলায় পড়ে খাবি খাচ্ছে তখন বন্দি। তাড়াতাড়ি পাম্প ছেড়ে আবার পানি ভরে বাঁচানো হল তাকে। ফুটোটাও বন্ধ করা হল অনেক চেষ্টা করে। কিন্তু আবার ঘটতে পারে ওরকম ঘটনা। কি করা যায়?

বুদ্ধিটা বাতলাল রবিন। 'বক্সিং গ্লাভস পরিয়ে দিলে কেমন হয়?'

ইদানীং বক্সিং প্র্যাকটিস করছে মুসা। কয়েক জোড়া গ্লাভস কিনেছে। একজোড়া অন্তত সঙ্গে নিয়ে যায় যেখানেই যায়।

কেবিনে গিয়ে গ্লাভস বের করে আনল মুসা। রবিন আনল একটা থিমবল।

মুচকি হেসে ঠাট্টার সুরে বলল জামবু, 'এসব দিয়ে ওই তলোয়ার ঠেকাবে নাকি?'

জবাব দিল না কেউ।

থিমবলটা বেশ বড়, নাবিকরা ব্যবহার করে এই জিনিস। দরজিরাও আঙুলে

পরে, তবে ওগুলো ছোট। তলোয়ার মাছের তলোয়ারটা শক্ত করে চেপে ধরতে বলল রবিন। মুসা ধরলে, থিমবলটা তলোয়ারের মাথায় পরিয়ে দিল সে। গ্লাভস পরাল তার ওপর। তলোয়ারের মাথায় ছুরি দিয়ে ছোট একটা খাঁজ কেটে গ্লাভসের ফিতে শক্ত করে গিঁট দিয়ে বাঁধল। ব্যস, আর ছুটবে না গ্লাভস।

কয়েকবার ঝাড়া দিয়ে অস্বস্তিকর এই জিনিস খুলে ফেলার চেষ্টা করল তলোয়ার। ব্যর্থ হয়ে শেষে খোঁচা মারতে শুরু করল ট্যাংকের দেয়ালে। লাভ হল না।

এতে আরও রেগে গেল তলোয়ার। চারশো পাউণ্ড শরীরটা নিয়ে বার বার গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল ট্যাংকের দেয়ালে। আঘাতের পর আঘাত হানল তলোয়ার দিয়ে। কিন্তু আগায় গ্লাভস আর থিমবল নিয়ে অস্ত্র এখন বাতিল। 'দূর, মরুকগে,' বলেই যেন সরে এল তলোয়ার। নতুন মাছ ছাড়া হয়েছে ট্যাংকে। মহানন্দে সদ্ব্যবহার শুরু করল সেগুলোর।

'ডাঙা! ডাঙা!' কাকের বাসা থেকে চেঁচিয়ে বলল কুমালো।

কপালে হাত রেখে ভালমত তাকাল কলিগ। 'হ্যাঁ, ডাঙাই মনে হচ্ছে।'

তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ ব্যথা করে ফেলল তিন গোয়েন্দা, কিন্তু ডাঙা চোখে পড়ল না ওদের। দেখল অদ্ভুত এক দৃশ্য। একেবারে দিগন্তরেখার কাছে সবুজ, উজ্জ্বল একটুকরো মেঘ। না, মেঘ বলা বোধহয় ঠিক না, বরং বলা উচিত উজ্জ্বল একধরনের সবুজ আভা।

সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্তের কালে অনেক সময় সবুজ আভা চোখে পড়ে সাগরের আকাশে, কিন্তু এই মাঝ সকালে ওই সবুজ রঙ কিসের?

যেন জ্বলছে রঙটা। একবার মনে হচ্ছে সবুজ আগুনের শিখা, একবার সবুজ মেঘ, তারপর আবার সবুজ পানির ঢেউ। গায়েব হয়ে যাচ্ছে, ফিরে আসছে আবার আগের চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে।

'ব্যাপারটা কি!' তাজ্জব হয়ে দেখছে কিশোর। বুঝতে পারছে না।

কাকের বাসা থেকে নেমে এসেছে কুমালো। কিশোরের বিস্ময় দেখে হাসল। 'ওটা বিকিনি অ্যাটল্। দেখা যাচ্ছে না এখনও, আকাশের ওই সবুজ রঙ দেখে বুঝেছি।'

'জ্বলছে কেন?'

'আলোর কারসাজি। ধবধবে সাদা বালিতে ঢাকা ওখানকার ল্যাগুনের তলা। রঙিন প্রবাল আছে অনেক। পানির গভীরতাও মাঝে মাঝে খুব কম। সব কিছু মিলিয়ে ওখানকার পানির রঙ হয়ে গেছে হালকা সবুজ, ওটারই ছাপ পড়েছে।

আকাশে। মরীচিকাও বলতে পার। দ্বীপটা দেখার আগে অন্তত ছ'সাত ঘন্টা ধরে দেখা যাবে ওই মরীচিকা।'

শেষ বিকেলে দিগন্তে উদয় হল বিকিনি। নারকেল বীথির মাথা দেখা যাচ্ছে শুধু, নিচটা এখনও অদৃশ্য। এগিয়ে চলেছে জাহাজ। রেলিঙে দাঁড়িয়ে অ্যাটলের সৌন্দর্য দু'চোখ দিয়ে পান করছে যেন তিন গোয়েন্দা। এই প্রথম দেখছে প্রবাল অ্যাটল্।

দূর থেকে মনে হয়, মুক্তার একটা হার যেন অযত্নে ফেলে রাখা হয়েছে নীল চাদরের বিছানায়। ওটা আর কিছু না, ল্যাগুনকে ঘিরে রাখা বিশাল প্রবাল প্রাচীর। সগর্জনে দেয়ালে আছড়ে পড়ে সাদা ফেনা সৃষ্টি করেছে ঢেউ, কিন্তু দেয়ালের ভেতরে ঢোকার অধিকার আদায় করতে পারছে না কিছুতেই। ভেতরের পানি শান্ত, স্থির, আকাশের রঙের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলাচ্ছে। সাগরের মধ্যিখানে যেন দেয়ালে ঘেরা এক মস্ত হ্রদ। কলিগ জানাল ল্যাগুনটা বিরাট, বিশ মাইল চওড়া।

এতবড় প্রাচীরটার স্রষ্টা প্রবাল নামের এক অতি ক্ষুদ্র কীট। বীজ, ফল, উদ্ভিদের চারা ভেসে ভেসে গিয়ে ঠেকেছে ওই প্রাচীরে, আটকে গেছে পচা প্রবাল আর বালিতে। ফলে যেখানে সেখানে গজিয়ে উঠেছে মোহনীয় সবুজ দ্বীপ। সাদা প্রবাল পাথরের মাঝে ফুটে উঠেছে সবুজ।

এসব দ্বীপের কোনটা খুবই ছোট, বড় জোর ওদের স্কুনারটার সমান। কোন কোনটা আবার বেশ বড়, মাইলখানেক লম্বা। তবে চওড়ায় অনেক কম। সব চেয়ে বড়টাও মাত্র কয়েকশো গজ।

তিনটে জায়গায় ফাঁক আছে দেয়ালে। ওগুলো দিয়ে জাহাজ ঢোকানো সম্ভব। দক্ষিণ-পুবের পথটার দিকে এগিয়ে গেল শুকতারা। ভালই চলছিল, হঠাৎ পড়ে গেল বাতাস। ঘুরে গেল জাহাজের নাক। পাশ থেকে ভয়ঙ্কর আঘাত হানতে শুরু করল ঢেউ। ভীমগর্জনে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে গায়ে। দেয়ালের ফাঁক দিয়ে তীব্র গতিতে ঢুকছে জোয়ারের পানি। পরস্পর বিরোধী স্রোতের মাঝে পড়ে প্রায় নাকানিচোবানি খেতে শুরু করল জাহাজটা।

অভিজ্ঞ নাবিক ক্যাপ্টেন কলিগ। দক্ষ হাতে জাহাজের হুইল ধরে ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে দিল শুকতারাকে। পরিশ্রম করতে হল অনেক, কিন্তু নিরাপদেই অবশেষে জাহাজটাকে নিয়ে এল ল্যাগুনের ভেতরে। শান্ত নিথর পানিকে মনে হচ্ছে এক বিশাল সবুজ আয়না। নারকেল গাছে ছাওয়া ছোট্ট একটা দ্বীপের সাদা সৈকত থেকে একরশি দূরে নোঙর ফেলা হল।

গভীর মনোযোগে ক্যাপ্টেনের চার্ট দেখছে কিশোর। ম্যাপে দেখা যাচ্ছে. এই

প্রবাল প্রাচীরে দ্বীপ মোট বিশটা। সব চেয়ে কাছেরটার নাম এনিও। তারপরে রয়েছে বিকিনি, অ্যাওমোয়েন, ন্যামু, রুকোজি, এনিরিক্কু। আরেকটা আছে, নাম উচ্চারণ করতে গেলে চোয়াল ভাঙার অবস্থা—ভোকোরোরাইওরো।

উত্তর-পুব কোণে একটা ক্রসচিহ্ন। ম্যাপে দেখানো ল্যাগুনের ওই জায়গায় আঙুল রেখে কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'এখানে কি?'

'আণবিক বোমার পরীক্ষা হত ওখানে,' জবাব দিল ক্যাপ্টেন।

'রেডিও অ্যাকটিভিটির ভয় নেই?'

'নাহ্, এখন আর নেই। শেষ পরীক্ষা হয়েছে উনিশশো ছেচল্লিশ সালে। তেজস্ক্রিয়তায় ছেয়ে গিয়েছিল তখন সবকিছু, মাটিতে, নারকেলে, এমনকি মাছেও। অনেক পরে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে ঘোষণা দিয়েছেন, তেজস্ক্রিয়তা কমে গেছে। এখন আর মানুষের জন্যে তেমন ভয় নেই, যদি বেশিদিন না থাকে এখানে।'

'স্থানীয় অধিবাসীদের কি হল? পরীক্ষার আগে নিশ্চয় ছিল ওরা?'

'ছিল, একশো পঁষট্টি জন। তাদের রাজার নাম জুডা। রংগারিক আইল্যাণ্ডে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল ওদের, এখান থেকে একশো তিরিশ মাইল পুবে।'

'কাজটা উচিত করেনি। বাপদাদার জায়গা থেকে তাদেরকে সরিয়ে দিয়ে। নতুন জায়গায় গিয়ে মানিয়ে নিতে নিশ্চয় খুব কষ্ট হয়েছে।'

'খুব। মানাতে পারেইনি শেষ পর্যন্ত। রংগারিকে মাছ নেই, ফলের গাছও খুব কম। শেষে বাধ্য হয়ে আমেরিকান নেভির কাছে আবেদন করেছে রাজা, তাদের খাবার ব্যবস্থা করার জন্যে। তাই ওখান থেকেও সরাতে হয়েছে ওদেরকে, উজিলাং আইল্যাণ্ডে।'

'এখন তাহলে ওখানেই আছে?'

'আছে। তবে সুখী নয়। তাদের শত শত বছরের পুরানো জীবনধারা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। উজিলাংও এখানকার তুলনায় ভাল না। খাবারের জন্যে তাদের নির্ভর করতে হয় আমেরিকান নেভির ওপর। ফলে জীবনের ওপরই ঘেন্না ধরে গেছে ওদের।'

'দুঃখজনক। বিশ্বযুদ্ধের সময় অনেকেই অনেক শয়তানী করেছে। এখনও কি কোন পরীক্ষা চলছে নাকি এখানে?'

'বলা কঠিন। তবে এখন বেশি পরীক্ষা চলছে এনিউইটক অ্যাটলে, এখান থেকে দু'শো মাইল পশ্চিমে। ওটার পাশ দিয়েই যাব আমরা।'

'ওখানকার আদিবাসীদেরও নিশ্চয় দেয়া হয়েছে?'

'হয়েছে। একশো সাতচল্লিশ জন।' নীল চোখের চারপাশে রোদে পোড়া

চামড়া হাসিতে কুঁচকে গেল ক্যাপ্টেনের। 'আরি, কেঁদে ফেলবে নাকি! সাধারণ কয়েকটা কানাকা। সব সময়ই শাসন করা হয়েছে ওদের, ভবিষ্যতেও করা হবে।'

ভারতবর্ষ আর আফ্রিকায় ইংরেজ শাসনের ইতিহাস মনে পড়ল কিশোরের। কঠিন একটা কথা চলে এসেছিল মুখে, অনেক কষ্টে সামলাল।

ডিঙি নামিয়ে তীরে উঠল সবাই। অনেক দিন পর পায়ের তলায় মাটি বেশ ভাল লাগল। দ্বীপ না বলে ওটাকে চমৎকার একটা বাগান বলা উচিত। তেজস্ক্রিয়ায় কোন এক সময়ে গাছপালার ক্ষতি হয়ে থাকলেও এখন তার চিহ্ন নেই। মানুষের ভয়াবহ আঘাত সামলে নিয়েছে প্রকৃতি।

পুরো দ্বীপটা ঘুরে আসতে মাত্র আধঘন্টা সময় লাগল। রাতে খাবার খেল অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে। কিশোর লক্ষ্য করল, বারবার সৈকতে চলে যাচ্ছে কুমালো, কি জানি, বোধহয় ল্যাগুনে রাতের স্তব্ধ আকাশ ভাল লাগছে। গত কয়দিনে লোকটার প্রতি একটা মায়া জন্মে গেছে তার। শান্ত, হাসিখুশি। সাহস, ধৈর্য, সবই আছে লোকটার। স্কুনার চালানো দেখেই বোঝা যায় জাত নাবিক। পছন্দের জায়গায় এসে কেমন লাগছে এখন তার?—খুব জানতে ইচ্ছে হল কিশোরের।

আগুনের ধার থেকে উঠে সৈকতে রওনা হল সে। একটা নারকেল গাছে হেলান দিয়ে ল্যাগুনের দিকে তাকিয়ে আছে কুমালো। পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর, কিন্তু নীরবতা ভাঙতে ইচ্ছে হল না। চুপ করে রইল।

ল্যাগুনটা এখন কালো। দিনে ছিল সবুজ, এখন কালো আয়নার মত। তাতে আকাশের প্রতিবিম্ব। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে নীলচে-সাদা অভিজিৎ নক্ষত্র, হলদে স্বাতীনক্ষত্র, আগুন-লাল অ্যানটারিস। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই উঠবে সাদার্ন ক্রস, রকিবীচের চেয়ে অনেক বেশি স্পষ্ট দেখা যাবে এখানে, কারণ বিষুবরেখার কয়েক ডিগ্রি উত্তরে রয়েছে এই বিকিনি।

প্রবাল প্রাচীরে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের চাপা গর্জন ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। ল্যাগুনের ওপাশে অন্যান্য দ্বীপগুলো সব অন্ধকার।

'আমার বাবা একবার এসেছিল এখানে, বহুদিন আগে,' কথা বলল কুমালো। 'শুনেছি, তখন মানুষ থাকত এখানে। দ্বীপে আনন্দ ছিল। এখন নেই।'

'নিশ্চয় অ্যাটম বোম...'

'হ্যাঁ...'

পাশাপাশি বসল ওরা। এই সময় মুসা আর রবিনও এসে বসল ওখানে।

'কুমালো,' কিশোর বলল। 'এত ভাল ইংরেজি কোথায় শিখলে তুমি? এদিকের লোকে তো ভাল ইংরেজি জানে না শুনেছি।'

হাসল কুমালো। তারার আবছা আলোতেও চকচক করে উঠল তার সাদা

দাঁত। 'আমার ইংরেজি তোমার পছন্দ হয়েছে? খুশি হলাম। এক আমেরিকান মিশনারি মহিলার কাছে লেখাপড়া শিখেছি। খুব ভাল মানুষ ছিলেন তিনি। যত্ন করে কত কিছু শিখিয়েছেন আমার দেশের লোককে। ভাল বিদেশী খুব কমই যায় ওখানে।'

কুমালো কি বলতে চায়, বুঝল কিশোর। ইউরোপিয়ান আর আমেরিকানরা আগে দক্ষিণ সাগরের দ্বীপগুলোতে আসত নারকেলের ছোবড়া আর মুক্তার লোভে, করুণা খুব কমই মিলত তাদের কাছে। স্থানীয় অধিবাসীদের মাঝে ওরা ছড়িয়েছে মারাত্মক রোগ, শিখিয়েছে কড়া মদে নেশা করা, খুন করেছে পাইকারি হারে, নির্মমভাবে, কারণ ওদের হাতে ছিল আগ্নেয়াস্ত্র।

গত কয়েক দিনে একটা ব্যাপারে শিওর হয়ে গেছে সে, ক্যাপ্টেন আর জামবু দেখতে পারে না কুমালোকে। তারমানে ওদের দলে নেই লোকটা। তথ্য বের করার জন্যে বলল, 'কুমালো, তোমার দেশের কথা বল।'

'শুনবে!' অবাক মনে হল দ্বীপের বাসিন্দা মানুষটাকে। 'আমাদের কথা শুনবে তুমি?'

'বল,' রবিন বলল।

অনেক কথাই বলল কুমালো। ওদের সমাজের অনেক কিছু জানল ছেলেরা। বন্ধুত্ব পাতানোর অদ্ভুত একটা রীতি রয়েছে ওখানকার দ্বীপগুলোতে। বন্ধুকে বন্ধু বলে না ওরা, বলে রক্তে-পাতানো-ভাই। এক বন্ধুর জন্যে আরেক বন্ধু নির্দ্বিধায় জীবন দিয়ে দিতে প্রস্তুত।

শুনতে শুনতে হঠাৎ বলে উঠল মুসা, 'কুমালো, আমার সঙ্গে নাম বিনিময় করবে তুমি?'

আবেগে গলা রুদ্ধ হয়ে এল কুমালোর। তারার আলোয় দেখা গেল তার বাদামি গালে চিকচিক করছে পানির ধারা, দু'গাল বেয়ে নেমেছে অশ্রু। আচমকা বিশাল দুই থাবার মধ্যে চেপে ধরল মুসার একটা হাত। 'নিশ্চয় করব, মুসা! আমার হৃদয়ে আমি এখন মুসা, তোমার হৃদয়ে তুমি কুমালো। তুমি আমার রক্তে-পাতানো-ভাই। একজনের জন্যে আরেকজন দরকার হলে জীবন দিয়ে দেব আমরা। ইতিমধ্যেই সেটা তুমি করতে চেয়েছো নিজের জীবনের পরোয়া না করে হাঙরের মুখ থেকে বাঁচিয়ে এনেছ আমাকে।'

সাত

কয়েক দিন সাগরে কাটিয়েও আশ মিটিয়ে সাঁতার কাটতে পারেনি সাগরপাগল মুসা আমান। প্রথম সুযোগটা পেয়েই তার সদ্ব্যবহার করতে ছাড়ল না। পরদিন

সকালে জামাকাপড় খুলে ডাইভ দিয়ে পড়ল পানিতে।

দেখে হাসল রবিন আর কিশোর। কুমালো, জামবু আর ক্যাপ্টেনকে নিয়ে প্রবাল প্রাচীরের কিনার ধরে হেঁটে চলল ওরা।

চলতে চলতে থেকে থেকেই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে কিশোর। উঁকি দিয়ে দেখছে পানিতে। ধরার মত কিছু মেলে কিনা দেখছে। অল্প পানিতে একটা অক্টোপাসের বাচ্চা চোখে পড়ল। আরেকটা। তারপর আরেকটা। খুব ছোট ছোট, বাসনের সমান। কয়েকটা ধরল কুমালো। জানাল, খেতে নাকি দারুণ লাগে, বিশেষ করে অক্টোপাসের শুঁড়ের কাবাব।

মুসা ওদিকে শুরু করেছে তুমুল দাপাদাপি। ডুবছে, ভাসছে। দেখলে এখন মনে হবে পানিরই ছেলে সে, পানিতে তার ঘর। কয়েকবার ডুবে, ভেসে শরীরটাকে গরম করে নিয়ে সাঁতরে চলে এল অপেক্ষাকৃত গভীর পানিতে। খাড়া ডুব দিয়ে চলে এল বারো-তেরো ফুট নিচে। চোখ দিয়ে যেন গিলছে প্রবালের অপূর্ব রূপ। পানির নিচ দিয়েই সাঁতরে চলে এল দেয়ালের কাছে। ভাসল। লম্বা দম নিয়ে আবার ডুব দিল।

দেয়ালের এক জায়গায় একটা ফোকর চোখে পড়ল। ঢুকে পড়ল ওটার ভেতরে। একটা সুড়ঙ্গ। ওই সুড়ঙ্গ দিয়ে সাঁতরে চলে এল পানির তলার একটা গুহায়। সূর্যের আলো এসে পড়েছে প্রবালের গায়ে, প্রতিফলিত হয়ে মিষ্টি কোমল নীল আলোয় ভরিয়ে দিয়েছে গুহাটা। এই সৌন্দর্য বর্ণনা করা কঠিন, যেন এক পরীর রাজ্যে চলে এসেছে সে। অসাধারণ শিল্পীর পরিচয় রেখেছে এখানে প্রবালকীট। দেয়াল জুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছে ওদের রঙিন শিল্পকর্ম। শুধু রঙ আর রঙ, নীল, সাদা, গোলাপী, সবুজ, চোখ জুড়িয়ে যায়।

দম ফুরিয়ে আসছে। পরীর বাগান দেখার জন্যে আর বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না মুসা। সাঁতরে বেরিয়ে আসতে যাবে, এই সময় লক্ষ্য করল, ছাতটা পানির ওপরে। মাঝে ফাঁকা। তারমানে বাতাস আছে। না-ও থাকতে পারে, একথাটা একবারও মনে এল না তার। ভুস করে মাথা তুলল। ফাঁক বেশি না। কাঁধ পর্যন্ত ভাসাতে পারল সে।

হঠাৎ একটা দুষ্টবুদ্ধি মাথাচাড়া দিল মনে। যদি এখন না ফেরে, দেরি করে যায়, কি ঘটবে? সবাই তাকে ডুব দিতে দেখেছে। ভেসে না উঠলে ওরা ভাববে ডুবে মরেছে সে। পানিতে নেমে খোঁজাখুঁজি করবে তাকে। তবে পাওয়ার আশা কম। কারণ সে রয়েছে গুহার ভেতরে।

ওরা যখন তাকে মৃত ধরে নিয়ে হাহুতাশ শুরু করবে, তখন ভাসবে সে। বুঝতে পারবে, সত্যি সত্যি সে মারা গেলে কিশোর, রবিন, কুমালো কে কতটা

শোক করবে।

নাক উঁচু করে ভেসে আছে মুসা। সহজেই শ্বাস নিতে পারছে। তারমানে প্রবালের মাঝে সূক্ষ্ম ছিদ্র রয়েছে, অনেকটা স্পঞ্জের মত, সেই ছিদ্রপথে গুহায় ঢুকছে বাতাস।

ওপরে চেঁচামেচি শুরু হল, গুহায় থেকেই শুনতে পাচ্ছে মুসা। পানিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ার শব্দ হল।

দশ মিনিটের মাথায় লম্বা দম নিয়ে ডুব দিল সে। বেরিয়ে এল গুহা থেকে। ভাসল না। ডুব সাঁতার দিয়ে সরে এল প্রায় বিশ গজ দূরে। পানির কিনারে ওখানে জন্মে আছে একগুচ্ছ নারকেল গাছ। আস্তে পানি থেকে উঠে ওটার ভেতরে ঢুকে বসে রইল সে।

কানে এল কিশোরের কথা, 'কি করে যে গিয়ে ওর বাবাকে বলব! হায় হায়রে, কেন যেতে দিলাম! কেন মানা করলাম না!'

ক্যাপ্টেন বলল, 'বেচারা! ছেলেটা ভাল ছিল। সত্যি দুঃখ হচ্ছে ওর জন্যে।'

রবিন বলল, 'কেঁদে কেঁদেই মরে যাবে ওর মা!'

'আমাদের তিন গোয়েন্দাগিরি এখানেই শেষ!' আফসোস করল কিশোর। 'মুসাকে ছাড়া কিছুই করতে পারব না আমরা।'

জামবুও দুঃখ প্রকাশ করল। আন্তরিক কিনা বোঝা গেল না যদিও।

কুমালো নেই ওখানে। খানিক পরে উঠে এল পানি থেকে। বিড়বিড় করে প্রার্থনা করছে, মিশনারি মহিলার কাছেই শিখেছে নিশ্চয়। কিশোরের কাঁধে হাত রেখে কাঁদো কাঁদো গলায় সান্ত্বনা দিল, 'দুঃখ কোরো না। যে মরে গেছে, তার জন্যে আফসোস করতে নেই, তাহলে তার আত্মার অকল্যাণ হয়,' পাখিকে শেখানো বুলি ঝাড়ছে যেন। 'আবার ওর সঙ্গে দেখা হবে আমাদের। স্বর্গে...'

আর থাকতে পারল না মুসা। হো হো করে হেসে উঠল। বেরিয়ে এল নারকেল গাছের আড়াল থেকে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সবাই। কুমালো হাসল। রবিনও। কিশোর গম্ভীর। শুধু বলল, 'কাজটা ভাল করনি।'

'ছিলে কোথায় এতক্ষণ?' রবিন জিজ্ঞেস করল। 'গাছের আড়ালেই?'

'না, কয়েক মিনিট ধরে আছি। এর আগে পানিতেই ছিলাম।'

'এতক্ষণ?'

'বিশ্বাস না হলে আবার দেখ। প্রমাণ করে দিচ্ছি। যতক্ষণ বল ততোক্ষণ পারব।'

ডাইভ দিয়ে পানিতে পড়ল মুসা।

আবার গুহায় ঢুকল। মোটা সাপের মত কি যেন একটা পড়ে আছে মেঝেতে। ওটার আরেক মাথা গিয়ে ঢুকেছে গুহার দেয়ালে একটা কালো বড় ফোকরে। শ্বাস নেয়ার জন্যে ভেসে উঠল সে। দম নিয়ে সাপের মত জিনিসটা ভালমত দেখার জন্যে আবার ডুব দিল সে। পরিষ্কার দেখা যায় না। কারণ একটা জিনিসেরই একেক জায়গায় একেক রকম রঙ। পটভূমি, অর্থাৎ যেটার ওপর পড়ে আছে তার যে-রকম রঙ ঠিক সে-রকম। যেখানে প্রবালের রঙ লাল, সেখানে ওটাও লাল, যেখানে নীল সেখানে নীল, সাদা হলে সাদা, কালো জায়গা কালো।

এইসময় একই রকম আরেকটা 'সাপ' চোখে পড়ল তার। তারপর আরও দুটো। সব ক'টাই গিয়ে ঢুকেছে সেই কালো ফোকরে।

কি আছে কালো গর্তটার ভেতরে? আরও কাছে গিয়ে দেখার পর নজরে পড়ল। কালো গর্তের মতই কালো একটা জিনিসের অর্ধেক বেরিয়ে আছে ফোকরের বাইরে, বাকি অর্ধেক ভেতরে। ফোলা একটা বস্তার মত। দুটো চোখও লাগানো বস্তার গায়ে। ছোট ছোট চোখ, শয়তানি ভরা তির্যক চাহনি, তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

ব্যাপারটা বোধগম্য হতেই ভয়ের ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল তার মেরুদণ্ড বেয়ে। আশেপাশের রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে ঘাপটি মেরে রয়েছে ওটা, শিকারের জন্যে ওত পেতেছে। বিশাল এক অক্টোপাস!

অবাক নয় সে, আতঙ্কিত। বোঝা উচিত ছিল, অল্প পানিতে যখন অসংখ্য বাচ্চা রয়েছে, বুড়োটাও রয়েছে কাছাকাছি কোথাও। কল্পনাই করেনি গুহার মধ্যে বসে আছে ওটা।

আস্তে ভেসে উঠে ফুসফুস ভর্তি করে বাতাস নিল মুসা। জানে, সময়মত বেরোতে না পারলে, জানোয়ারটার সঙ্গে হাতাহাতি লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়লে অক্সিজেন দরকার হবে। পানিতে সামান্যতম আলোড়ন না তুলে আবার ডুব দিল সে। সোজা এগোল সুড়ঙ্গের দিকে। সরে যাচ্ছে...যাচ্ছে...আর একবার পা নাড়া, তাহলেই ঢুকে যাবে সুড়ঙ্গে...

ঠিক এই সময় আলতো করে তার গোড়ালি জড়িয়ে ধরল কোন কিছু। খুব ভদ্রভাবে টেনে নেয়া হতে লাগল তাকে গুহার ভেতরে। ছাড়ানোর জন্যে ঝাড়া মারল সে, ছুটতে পারল না। ধরেছে নরমভাবে, কিন্তু বাঁধন ভীষণ শক্ত।

ছুরির জন্যে হাত বাড়াল মুসা। ধক করে উঠল বুক। নেই! মনে পড়ল, প্যান্টের বেল্টে আটকানো রয়েছে ছুরির খাপ, কাপড় খোলার সময় ওটা খুলে রেখে এসেছে সৈকতে।

দু'হাতে ধরে শুঁড়টা ছাড়ানোর চেষ্টা করল সে। চ্যাপ্টা শুঁড়, পেটের দুই

কিনারে দুই সারি সাকশন কাপ। চামড়া থেকে ওগুলোর তীব্র আকর্ষণ ছুটানোর সাধ্য তার হল না। বরং টের পেল, আরেক শুঁড় দিয়ে আরেক পা জড়িয়ে ধরা হচ্ছে, তৃতীয় আরেকটা শুঁড় শুঁয়োপোকার মত তিরতির করে হেঁটে যাচ্ছে কাঁধের ওপর দিয়ে।

সাহায্যের জন্যে চিৎকার শুরু করল মুসা। এখন হয়ত তার মাথার ওপরেই রয়েছে সবাই, তার বেরোনোর অপেক্ষা করছে, তাকিয়ে আছে পানির দিকে। তার ডাক ওদের কানে গেলে নিশ্চয় দেখতে আসবে।

চিৎকার করায় অতি মূল্যবান অক্সিজেনের অনেকটাই বেরিয়ে গেল ফুসফুস থেকে। আর আধ মিনিটের মধ্যে যদি দম নিতে না পারে, জ্ঞান হারাবে। শুঁড় ছাড়ানোর চেষ্টা বাদ দিয়ে প্রাণপণে গুহার ওপরে ভেসে উঠতে চাইল সে। দেয়ালের গা থেকে বেরিয়ে থাকা প্রবাল ধরে ধরে টেনে তোলার চেষ্টা করল শরীরটা।

ভারি একটা শুঁড়ের চাপ রয়েছে কাঁধে। ওটা কিছুতেই সরাতে পারল না সে। শেষে মরিয়া হয়ে কাঁধ নিচু করে চোখা প্রবালে ঘষা মারল শুঁড়টা।

গুঙিয়ে উঠল অক্টোপাস, একেবারে মানুষের মত। কাঁধের ওপর শুঁড়ের চাপ কমার সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়া দিয়ে ওটাকে নামিয়ে দিল মুসা। দুই পায়ের বাঁধন আগের মতই রয়েছে। তবু কাঁধ থেকে শুঁড়টা সরাতে পারায় ভেসে উঠে দম নেয়া সম্ভব হল।

তারপর শুরু করল চিৎকার। গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল, 'কিশোওর! রবিইন! দোহাই তোমাদের! আমাকে বের কর! অক্টোপাসে ধরেছে!... কুমালোওওও...'

চেঁচিয়ে গলার রগ ফুলিয়ে ফেলল সে। কোন সাড়া এল না।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যেতে চাইল তার, ভয়ে। রসিকতা করেছে ওদের সঙ্গে একটু আগে। ওরা হয়ত ভাবছে আবার নতুন কোন রসিকতা। মনে পড়ল সেই মেষ পালকের কথা। 'বাঘ এসেছে! বাঘ এসেছে!' বলে অযথা চেঁচিয়ে সত্যি সত্যি বাঘ যখন এল কেউ এল না তাকে সাহায্য করতে...

পায়ে টান লাগল।

'কিশোওর! দোহাই তোমাদের!' প্রায় কেঁদে ফেলল মুসা। 'আল্লার কসম, অক্টোপাস...'

কথা শেষ করার আগেই টান মেরে পানির তলায় নিয়ে গেল তাকে জীবটা। এগিয়ে এল বাকি শুঁড়গুলোও। এক এক করে জড়িয়ে ধরতে লাগল কাঁধ, বুক, পেট।

আমাজানের জঙ্গলের বোয়া-কনসট্রিকটরের কথা মনে পড়ল। ভয়ঙ্কর সাপ। একেকটা শুঁড়কে একেকটা সাপ বলে মনে হল এখন, তারমানে মোট আটটা সাপ। একযোগে আক্রমণ করেছে। শক্ত হচ্ছে চাপ, আগের মত আলতো ভাব আর নেই। পেট বসে যাচ্ছে চাপের চোটে, হাঁসফাঁস করছে ফুসফুস, পাগল হয়ে এলোপাতাড়ি বাড়ি মারছে হৃৎপিণ্ড।

ছায়া নামল এই সময় গুহার ভেতরে, সূর্যকে মেঘে ঢেকে দেয়ায় রোদ পড়ে গেল যেন। তারমানে সুড়ঙ্গে ঢুকেছে কেউ, আলো আসায় বাধা পড়েছে। আশার আলো জ্বলল মুসার মনে। নিশ্চয় কুমালো! অনেক কষ্টে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে, কে এসেছে দেখার জন্যে। কুমালো নয়, সুড়ঙ্গমুখে দেখা দিল মস্ত এক হাঙ্গরের মাথা, টাইগার শার্ক। রক্তের গন্ধ পেয়ে গেছে সাগরের কসাই। প্রবালের ঘষায় মুসার শরীরের কয়েক জায়গা কেটে রক্ত বেরোচ্ছে।

অনাহূত আগন্তুককে দেখেই রেগে লাল হল অক্টোপাস। ঢিল হল শুঁড়ের বাঁধন। সত্যি সত্যি লাল রঙ এখন শরীরের।

এমনিতেই ফোলা ঢোল, পানি টেনে নিয়ে আরও ফুলে পিপা হয়ে যেতে লাগল বস্তার মত শরীরটা। হঠাৎ বেরিয়ে গেল টেনে নেয়া সমস্ত পানি, শত্রুর দিকে টর্পেডোর মত ছুটে গেল অক্টোপাস। এত জোরে গেল, ওটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হেরে গেল মুসার দৃষ্টি।

জেট প্লেন বা রকেটের সঙ্গেই শুধু তুলনা করা চলে ওই গতিকে। ব্যতিক্রম শুধু, ওগুলোর পেছনের ফুটো দিয়ে বেরোয় গ্যাস, আর এটার বেরোল পানি। শুঁড়গুলো লম্বা হয়ে ছুটে গেল বস্তাশরীরের পেছনে, যেন ধূমকেতুর পেছনে তার ছড়ানো ফোলা লেজ।

আটটা শুঁড়ের শতশত সাকশন কাপ দিয়ে কষে চড় লাগাল অক্টোপাস বেহায়া মাছের গায়ে যত্রতত্র। ব্যাটা, আমার শিকার ছিনিয়ে নিতে আস! এত্তো সাহস! বেরিয়ে গেল হাঙর। ছাড়ল না অক্টোপাস। সুড়ঙ্গের বাইরে বেরিয়েই রুখে দাঁড়াল বাঘা হাঙরের বাচ্চা, সে-ও কম শক্তিশালী নয়। গুহার ভেতরে জায়গা কম, নড়তে চড়তে অসুবিধে, তাই বের করে নিয়ে গেছে অক্টোপাসটাকে।

সুড়ঙ্গের এপাশে থেকে ওপাশে ভয়ঙ্কর লড়াইয়ের বিশেষ কিছু দেখতে পাচ্ছে না মুসা, পলকের জন্যে মাঝে মাঝে শুধু চোখে পড়ছে পাখনা কিংবা শুঁড় নড়ানো। দৃষ্টি আরও অচল হয়ে গেল, যখন কালির থলে থেকে একরাশ কালো কালি ছুঁড়ে মারল অক্টোপাস। পানিতে কালো মেঘের মত ছড়িয়ে পড়ল কালি।

এখন বাইরে বেরোনো আত্মহত্যার সামিল। দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করছে মুসা। প্রার্থনা করছেঃ আল্লাহ্, সরে যাক ব্যাটারা, খালি একটু দূরে সরুক! আমি

বেরোতে পারলেই হয়! আল্লাহ্…

আবার চেঁচাতে শুরু করল সে। কাছাকাছি কি কেউ নেই নাকি? ভয়াবহ লড়াই চোখে পড়ছে না কারও? পানিতে ওই আলোড়ন দেখতে পাচ্ছে না?

পানিতে এখন কালি গোলা। কিছু দেখতে পাচ্ছে না মুসা। দানব দুটো আছে না গেছে, বোঝার উপায় নেই।

ঠিক করল সে, ঝুঁকি নেবে। লম্বা দম নিয়ে ডুব দিল। কিন্তু ফিরে এসে ভেসে উঠতে বাধ্য হল আবার। কারণ, সুড়ঙ্গমুখে চকিতের জন্যে আবছাভাবে চোখে পড়েছে বস্তা-শরীরের মুখ। ওপাশের কালো মেঘের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

একা। তাড়িয়ে দিয়ে এসেছে শত্রুকে। আট পায়ে ভর দিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে হাঁটছে গুহার মেঝেতে, বিরাট এক মাকড়সার মত।

শিকারের দিকে তাকিয়ে নাচ জুড়েছে যেন। আটকা পড়া ইঁদুরকে ধরার আগে ঠিক এরকম ভাবভঙ্গিই করে বেড়াল। সারা শরীরে ওটার এখন রামধনুর সাত রঙ। কুমালো আর কলিগের কাছে জেনেছে মুসা, খুব বেশি রাগলে শরীরের রঙ ওরকম হয়ে যায় অক্টোপাসের।

আবেগ বোঝার ক্ষমতা আছে এদের। বাচ্চাকে কাছে টেনে আদর করে, শত্রু দেখলে খেপে যায়। মাছের চেয়ে অক্টোপাসের মগজ অনেক উন্নত। মানুষের মত চোখ, আর শেয়ালের মত ধূর্ত।

আবার ফুলতে শুরু করেছে ওটা। আবার চিৎকার করে সাহায্যের আবেদন জানাল মুসা। বুঝতে পারছে, সময় ঘনিয়ে এসেছে। আর বড় জোর কয়েক সেকেণ্ড।

তীব্র গতিতে পানি বেরোতে লাগল বস্তার ভেতর থেকে। ছুটে এল অক্টোপাস। জড়িয়ে ধরল শিকারকে।

অন্য কেউ হলে হয়ত হাল ছেড়ে দিত এতক্ষণে, কিন্তু মুসা ছাড়ার পাত্র নয়। মরতে হলে লড়াই করে মরবে। দ্রুত ভাবনা চলেছে মাথায়। অক্টোপাসের ব্যাপারে আর কি কি বলেছিল কুমালো? সাগরের এই আতঙ্ককে খালি হাতে লড়াই করেই অনেক সময় হারিয়ে দেয় দ্বীপবাসীরা। দুই চোখের মাঝখানে রয়েছে এদের সব চেয়ে দুর্বল জায়গা, একটা বিশেষ নার্ভ সেন্টার। ওখানে আঘাত লাগলে অবশ হয়ে যায় অক্টোপাসের শরীর।

আশা হল মুসার। শুধু হারানোই নয়, এই দানবটাকে জ্যান্তই ধরে নিয়ে যেতে পারবে হয়ত সে। বড় একটা অক্টোপাস চেয়েছেন মিস্টার লিসটার। কিশোরও খুশি হবে, মুসার ওপর থেকে রাগ কমবে তার।

প্রবাল আঁকড়ে ধরে পানির ওপরে মাথা তুলে রাখল মুসা, যতক্ষণ পারল।

শ্বাস টানল জোরে জোরে। তারপর এক হ্যাঁচকা টানে পানির নিচে নামিয়ে নেয়া হল তাকে। কিন্তু এখন আর আগের মত আতঙ্কিত নয় মুসা। ফুসফুসে বাতাস ভর্তি, মনে দুর্জয় সাহস। এখন তাকে দেখলে ভাবতেই পারবে না কেউ, এই সেই মুসা আমান, ভূতের নাম শুনলেই যে ভয়ে কাবু হয়ে যায়। শরীর থেকে শুঁড় ছাড়ানোর জন্যে এখন আর ধস্তাধস্তি করছে না সে। কাজ হয় না, তাতে শক্তিই খরচ হয় অহেতুক।

ধীরে ধীরে তাকে কাছে টেনে নিচ্ছে অক্টোপাস। শয়তানি ভরা চোখ দুটোর কাছে, আরও কাছে। আফ্রিকায় রেগে যাওয়া গণ্ডার দেখেছে মুসা। গণ্ডারের কুতকুতে চোখের চাহনির সঙ্গে অক্টোপাসের চাহনির অনেক মিল।

এতক্ষণ বস্তা-শরীরের ভেতরে লুকিয়ে ছিল অক্টোপাসের চোয়াল দুটো। বেরিয়ে এল এখন। তোতাপাখির ঠোঁটের মত বাঁকা, কিন্তু অনেক অনেক বড়। প্রচণ্ড শক্তি ওই চোয়ালের, এক চাপ দিয়ে পাকা নারিকেল গুঁড়িয়ে ফেলতে পারে। মুসার মাথাটা গুঁড়ো করতেও এক চাপের বেশি লাগবে না।

তবু নড়ছে না মুসা।

এমন ভাব দেখাচ্ছে, দুর্বল হয়ে গিয়ে নড়াচড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে সে। দানবটাকে বোঝাতে হবে, হাল ছেড়ে দিয়েছে। ততো শক্ত করে আর তাকে ধরেনি অক্টোপাসটা, ধরার দরকার মনে করছে না। ভাবছে বোধহয় সহজ শিকার, এটার ওপর এত বল প্রয়োগ করে লাভ নেই। খাবারকে আস্তে আস্তে মুখের কাছে নিয়ে যাচ্ছে শুঁড়গুলো।

দম ফুরিয়ে এসেছে মুসার। বাতাসের জন্যে আকুলি বিকুলি করছে ফুসফুস। কিন্তু চুপ করে রইল সে। জায়গাটা কোথায়? কুমালো বলেছে, দু'চোখের মাঝখানে, শরীরের সমস্ত স্নায়ু ওখানে এক জায়গায় মিলিত হয়ে একটা গুটি তৈরি করেছে, মটরদানার সমান।

হ্যাঁ, আছে, ওই তো! উঁচু হয়ে আছে, ছোট্ট ফোঁড়ার মত। মন শক্ত করল মুসা। তার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে কুতকুতে চোখ দুটো। তার মনের কথা বুঝে ফেলছে না তো? পেশী ঢিল করে দিল সে।

অক্টোপাসটাও চাপ আরও কমাল। এইই সুযোগ। হঠাৎ সামনে ঝাঁপ দিল সে। দানবটার মাথা খামচে ধরে কামড় বসালো ফোঁড়াটায়।

যন্ত্রণায় মানুষের মত গুঙিয়ে উঠল অক্টোপাস। দুর্বল ভঙ্গিতে শরীর ঝাঁকিয়ে ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করল। কালি দিয়ে কালো করে ফেলল পানি। নিয়ন্ত্রণ হারাল সাকশন কাপগুলো। মুসার শরীর থেকে খসে পড়ল সব ক'টা শুঁড়।

কামড় ছাড়ল না মুসা। চাপ দিল আরেকটু জোরে। আবার গুঙিয়ে উঠল

অক্টোপাস। ধস্তাধস্তি একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

আর থাকতে পারছে না মুসা। এখুনি দম নিতে না পারলে ফেটে যাবে যেন ফুসফুস। অক্টোপাসটাকে ছেড়ে পানির ওপর ভেসে উঠল সে। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ ভেসে থেকে বিশ্রাম নিল। নিচে, পানিতে নিথর হয়ে ঝুলে রয়েছে দানবটা।

মরে গেল নাকি ব্যাটা! শঙ্কিত হল মুসা। কুমালো বলেছে, জোরে এক কামড় দিয়েই মেরে ফেলা যায় এতবড় দানবকেও। বিন্দুমাত্র নড়ছে না ওটা। মরেই গেছে বোধহয়!

দম নিয়ে ডুব দিল মুসা। একটা শুঁড় ধরে অক্টোপাসটাকে টেনে নিয়ে চলল গুহার বাইরে। শুঁড়-টুঁড় মিলিয়ে আকারে বিশাল হলেও ওজন ততটা নয়। তাছাড়া পানির নিচে হওয়ায় ভার আরও কমে গেছে। হাড়ও নেই শরীরে, শুধু ঠোঁটটা ছাড়া।

গুহার বাইরে বেরিয়ে তবে স্বস্তি। উজ্জ্বল রোদে আলোকিত পানি। পৃথিবীটাকে আর এত সুন্দর মনে হয়নি কখনও মুসার। আধ ঘন্টা আগে যা ছিল, তার চেয়ে অনেক জ্ঞানী মনে হচ্ছে এখন নিজেকে। কারণ খানিক আগে মৃত্যুর করাল রূপ দেখে এসেছে সে। বুঝেছে, মৃত্যু কত ভয়ঙ্কর, বেঁচে থাকা কতটা আনন্দের।

পানির ওপরে মাথা তুলল সে। ধারেকাছে কেউ নেই। সবাই দূরে। চেঁচিয়ে ডাকল সে। ফিরে তাকাল ওরা। দু'হাতে তুলে ধরে একটা শুঁড় নাচাল মুসা। থমকে দাঁড়াল সবাই, তারপরই দৌড় দিল এদিকে।

'সর্বনাশ!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'কাকে ধরেছ! মরা নাকি?'

'মনে হয় না। জাহাজে তোলা যায় কিভাবে?'

'তুলো না তুলো না,' তাড়াতাড়ি হাত নাড়ল কুমালো। 'পানির ওপরে তুললে রোদ লাগলেই মরে যাবে।'

নৌকা আনতে গেল কুমালো। এই সময়ে সবাইকে তার কাহিনী শোনাতে লাগল মুসা। শুনতে শুনতে ফ্যাকাসে হয়ে গেল কিশোর আর রবিনের চেহারা। আর জামবুর চোখ যেন ছিটকে বেরিয়ে আসবে কোটর থেকে।

'যাক, খুশি হলাম,' ক্যাপ্টেন কলিগ বলল। 'দুষ্টুমি করে বটে। সাহসও আছে। এরকম ছেলেই আমার পছন্দ।'

দাঁড় বেয়ে নৌকা নিয়ে হাজির হল কুমালো। বলল, 'শুঁড় ধরে বসে থাক নৌকায়। টেনে নিয়ে যাব। দেখ, পানির ওপরে না ভেসে ওঠে।'

জাহাজের কিনারে ভিড়ল নৌকা। দড়ি নামিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধা হল তুলতুলে

শরীরটা। তারপর যত তাড়াতাড়ি পারা গেল চালান করে দেয়া হল ট্যাংকে, যতটা সম্ভব রোদ বাঁচিয়ে।

ট্যাংকটা ছোট হয়ে গেল অক্টোপাসের জন্যে। শরীরটা ঠিকই আঁটে, শুঁড়গুলো বেশি লম্বা। সোজা করা যায় না ট্যাংকের ভেতরে। বারো ফুট লম্বা একেকটা।

কুমালো বলল, 'সোজা করার দরকার নেই। করে না সাধারণত। গুটিয়ে রাখতে পছন্দ করে।'

হুঁশ ফিরছে দানবের। আলো দেখা দিল চোখ দুটোয়। শুরু হল সারা শরীরে রঙের খেলা। কিলবিল করে উঠল শুঁড়গুলো।

পানি খেয়ে ফুলছে বস্তা-শরীর। হঠাৎ লাফ দিল ওটা, বাড়ি খেল গিয়ে আরেক পাশের দেয়ালে। আবার লাফ দিল আরেক পাশে, বাড়ি খেল এবারও। বুঝল আটকা পড়েছে। ট্যাংকের ভেতরে ছোটাছুটি শুরু করল পাগলের মত। প্রচণ্ড রাগে শেষে শুঁড় কামড়াতে শুরু করল।

'বেশি রেগে গেলে ওরকম করে ওরা,' কলিগ জানাল। 'ধরা পড়লে কামড়ে নিজের শুঁড়ই খেয়ে ফেলে। শুঁড়-ছাড়া-অক্টোপাস বেচতে পারবে কাস্টোমারের কাছে?'

শঙ্কিত হয়ে পড়ল কিশোর আর মুসা। এত কষ্ট করে ধরে এনে তাহলে লাভটা কি, শুঁড়ই যদি খেয়ে ফেলে?

সমস্যার সমাধান করে দিল কুমালো। বড় দেখে একটা লোহার ড্রাম এনে রাখল ট্যাংকের ভেতর, কাত করে। খোলা মুখটা রইল অক্টোপাসের দিকে।

নিমেষে রাগ দূর হয়ে গেল দানবটার। সুড়ুৎ করে গিয়ে ঢুকে পড়ল ড্রামের ভেতরে। শুঁড়গুলো ভেতরে গুটিয়ে নিল, যতটা জায়গা হল।

'সাগরের নিচে,' কুমালো বলল। 'অন্ধকার গর্তে বাস করে ওরা। গর্তে ঢুকলে নিরাপদ মনে করে। আর গণ্ডগোল করবে না। বাড়ি পেয়ে গেছে।'

আট

ভোর থেকেই উত্তেজিত হয়ে আছে শুকতারার যাত্রীরা। অস্বস্তিতে ভুগছে।

বিকিনি ছেড়েছে শুকতারা। এগিয়ে চলেছে পোনাপের দিকে। চমৎকার হাওয়া লাগছে পালে, সাগর শান্ত, অস্বস্তি বোধ করার কারণ নেই। তবুও করছে ওরা, কারণ, বাতাস গরম। অসহ্য। বাষ্প মিশে রয়েছে যেন বাতাসের সঙ্গে।

নিষ্প্রাণ এই বাতাসে শ্বাস নিয়েও শান্তি নেই। বমি বমি লাগে। আকাশও নীল নয়। কেমন যেন কালচে-সাদা।

একই সাথে একটা বিশেষ কিছুর রঙ কালো আর সাদা হতে পারে না, অথচ আকাশের বেলায় তাই হয়েছে। ফ্যাকাসে কালো অন্ধকার ধীরে ধীরে চেপে আসছে যেন জাহাজের ওপর, মলিন করে দিয়েছে সবার মুখ। বেলা বাজে বারোটা, অথচ দেখে মনে হয় কাকডাকা ভোর।

বিনাকলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। হাতে সেক্সট্যান্ট। দুপুরের রীডিং নেয়ার চেষ্টা করছে। তাহলে নটিক্যাল অ্যালম্যানাকের সাহায্য নিয়ে জাহাজের অবস্থান নির্ণয় করতে পারবে।

খুব আগ্রহ নিয়ে ক্যাপ্টেন কলিগের কাছে নেভিগেশন শিখছে কিশোর। যে-কোন কাজ জানা থাকলে অনেক সুবিধে। আর এটা জানা তো এখন তিন গোয়েন্দার জন্যে বিশেষ জরুরি, কারণ, প্রফেসর ইস্টউডের গোপন মুক্তার খামারে যেতে হবে। কখন কি ঘটে যায়, ঠিক আছে?

মনে যেন জ্বলজ্বলে অক্ষরে লেখা হয়ে আছে পজিশনটাঃ নর্থ ল্যাটিচিউড এগারো ডিগ্রি চৌত্রিশ মিনিট, ইস্ট লংগিচিউড একশো আটান্ন ডিগ্রি বারো মিনিট।

একটা সমস্যার সমাধান এখনও করতে পারেনি সে। আসল অবস্থানের কথা কাউকে না জানিয়ে কি করে সেখানে পৌছবে? সঙ্গে যে-ই যাক, জেনে যাবে, জামবু, কুমালো, কলিগ, তিনজনেই।

কুমালোকে বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু ক্যাপ্টেন আর জামবুকে? প্রফেসরকে হুমকি দিয়েছে যারা, চুরি করে ল্যাবরেটরিতে ঢুকেছে, তাদের সঙ্গে কি যোগাযোগ আছে দু'জনের? কি করে জানা যাবে? ওদের কিছু কিছু মন্তব্য সন্দেহ জাগিয়েছে তার মনে।

পার্ল অ্যাটলে ওরা তিন গোয়েন্দার সঙ্গে না গেলেই খুশি হত সে। কিন্তু ওদেরকে ছাড়া, কিংবা দক্ষ অন্য কোন নাবিকের সহায়তা ছাড়া যেতে পারবে না কিছুতেই।

পারবে, যদি সে নিজে নাবিক হতে পারে, নেভিগেশন শিখে নিতে পারে। সূর্য, তারা, আর ক্রনোমিটারের সাহায্যে জাহাজের গতিপথ নির্ধারণ করা জানতে হবে। হিসেবে সামান্যতম ভুল করা চলবে না। তাহলেই চলে যাবে একদিক থেকে আরেক দিকে, আসল জায়গায় যাওয়া আর হবে না।

বুদ্ধি আছে তার। চেষ্টা করলে শিখতে পারবে না তা নয়, বরং অন্য অনেকের চেয়ে দ্রুতই পারবে। কিন্তু আরও একটা সমস্যা রয়ে যায়, কলিগ আর জামবুকে কোথায় নামিয়ে রেখে যাবে? কিভাবে? কি বলে বোঝাবে···

ভাবনায় বাধা দিল কলিগ, 'কি ভাবছ?'

'সূর্যটা ধরতে পারছি না ঠিকমত।'

ওপরে তাকাল কলিগ। সূর্য যেখানে থাকার কথা, সেখানে শুধু একটা সাদাটে আভা। আকাশের কালো ভূতুড়ে মুখটা অন্ধকার হচ্ছে আরও।

ব্যারোমিটার দেখল ক্যাপ্টেন। সাধারণত তিরিশের ওপরে থাকে, এখন উনত্রিশের কাছাকাছি নেমে এসেছে।

'মনে হচ্ছে, বড় রকমের বাড়ি খাব,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কলিগ।

মন্তব্যটা অদ্ভুত লাগল কিশোরের কাছে। তার ধারণা ছিল বাতাস বাড়বে, তা না হয়ে কমছে। খুব সামান্য, ঝিরঝির করে আসে, যায়, আসে, যায়। ঝুলে পড়েছে পাল। প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে হাওয়া।

'ঘটনাটা কি?' কেবিন থেকে বেরিয়ে এসেছে মুসা। ঘুমাচ্ছিল। আগের দিন অক্টোপাসের সঙ্গে লড়াইয়ের পর বিশ্রাম দিচ্ছিল শরীরটাকে। সারা গায়ে চাকা চাকা দাগ, অক্টোপাসের সাকশন কাপের শোষণের স্বাক্ষর। 'শ্বাসই নিতে পারছি না!'

বিশাল এক কম্বল ছড়িয়ে দিয়ে যেন চেপে ধরা হয়েছে শুকতারার যাত্রীদের, শ্বাসরুদ্ধ করে মারার পাঁয়তারা চলছে।

'হারিক্যান!' ঘোষণা করল কলিগ। 'কুমালো, আলগা যা যা আছে, শক্ত করে বাঁধ। জামবু, পাল খোল।' প্রধান মাস্তুলের নিচে গিয়ে দাঁড়াল সে। 'আরে, বাবা, একটু জলদি কর না! হাত চালাও।' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সে, তিন গোয়েন্দার দিকে চেয়ে। 'এই তোমরাও এস, ধর, ধর! আর সময় নেই!'

তাড়াহুড়ো করে নামাতে গিয়ে, পুলিতে দড়ি পেঁচিয়ে আটকে গেল একটা পালের ওপরের দিকটা।

'ইস্‌সিরে, আর সময় পেল না আটকানোর! উঠে গিয়ে এখন খুলতে হবে,' উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে ক্যাপ্টেন। মাল্লাদের দিকে তাকাল। কুমালো আর জামবু দু'জনেই ব্যস্ত। সে নিজে বয়স্ক লোক, ভারি শরীর, মাস্তুল বেয়ে এত ওপরে উঠতে পারবে না। মুসা পারবে, কিন্তু ঘষা লাগলেই চাকা দাগগুলোতে ব্যথা পায়।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল রবিন। সারা দিনে কয়েকবার করে কাকের বাসায় উঠে উঠে মাস্তুল বাওয়া অভ্যাস হয়ে গেছে তার। বেয়ে উঠতে শুরু করল আরেকবার। নিচের দিকের ক্রস্‌ট্রীগুলো পেরিয়ে উঠল কাকের বাসায়। জিরানোর সময় নেই। উঠে গেল আগায়। পুলি থেকে দড়ির জট ছাড়িয়ে দিতেই হড় হড় করে নামতে শুরু করল পাল।

ডেকে তখন তুমুল ব্যস্ততা। দড়ি দিয়ে হ্যাচের মুখগুলো বেঁধে ফেলেছে কুমালো, ডিঙি বাঁধছে। অক্টোপাসের ট্যাংকটা জায়গামত আটকে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে জাহাজের দুলুনির সময় না নড়ে! ছোটবড় সব ক'টা ট্যাংকের

ঢাকনা শক্ত করে লাগাতে হবে। ইচ্ছে করলে খুবই দ্রুত কাজ করতে পারে জামবু, কিন্তু তাকে কেউ কিছু করার আদেশ দিলেই চিটাগুড়ের মত আঠা হয়ে যায় যেন তার শরীর, নড়তেই চায় না আর। কয়েকটা পাল গুটিয়ে নিয়ে নিচের তলায় রাখতে এল। স্টোররুমে ঢুকেই যেন আর কাজ পেল না, এই জরুরি মুহূর্তে মদ খাবার ইচ্ছে হল।

ইঞ্জিন স্টার্ট দিল ক্যাপ্টেন। বিপদের মুখোমুখি হওয়ার জন্যে সবরকমে তৈরি করছে জাহাজটাকে।

পালে হাওয়া লাগলে সহজেই সাড়া দেয় শুকতারা, কিন্তু ইঞ্জিনের সঙ্গে সমঝোতা হতে সময় লাগল। সাড়া দিতে সবে শুরু করেছে। ঠিক এই সময় এল ঝড়।

মাস্তুলের ওপরে থেকে আসতে দেখল প্রথমে রবিন। ডেকে নামার সুযোগ পেল না। কাকের বাসায় মাস্তুল আঁকড়ে বসে থাকতে বাধ্য হল সে।

বিশাল এক ঢেউ, তার মাথা ছাড়িয়ে উঠে গেছে অনেক ওপরে। একটা মাত্র ঢেউ, আসার কোন ইঙ্গিতই দেয়নি, জন্মাল কখন তা-ও বোঝা যায়নি। হঠাৎ চোখে পড়ল ঢেউটা, পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে গেছে। হাঁ করে তাকিয়ে রইল রবিন। ঢেউয়ের চূড়ায় সাদা ফেনা নাচছে। দেখে মনে হচ্ছে সাগরের সঙ্গেও কোন সম্পর্ক নেই ঢেউটার, পানি আর আকাশের মাঝে শূন্যে ঝুলে ঝুলে ছুটে আসছে শুকতারাকে গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্যে।

ঢেউয়ের দিকে পাশ ফিরিয়ে আছে জাহাজ। ধীরে ধীরে চড়তে শুরু করল পাহাড়ে। পানির ঢালে পড়ে কাত হয়ে যাচ্ছে। এত বেশি কাত হয়ে গেল মাস্তুল, নিচে তাকিয়ে ডেক দেখতে পেল না রবিন, চোখে পড়ল আয়নার মত চকচকে সাগর।

হাত ছেড়ে লাফিয়ে পড়বে পানিতে? তার মনে হল, এই ঢেউয়ের সঙ্গে পাল্লা দেয়ার সাধ্য দুনিয়ার কোন জাহাজের নেই, এখুনি উল্টে যাবে শুকতারা। তখন আর মুক্তির উপায় থাকবে না। পানির তলায় চলে যাবে সে।

কিন্তু কি ভেবে শেষ পর্যন্ত ছাড়ল না রবিন। কুঁচকে ফেলল নাকমুখ, যখন ঢেউয়ের চূড়াটাকে তার ওপর ভেঙে পড়তে দেখল। পনি এরকম আঘাত করতে পারে, জানতই না সে। মনে হল কঠিন কিছু দিয়ে বাড়ি মারা হয়েছে তাকে। পানির চাপে কাকের বাসার রেলিঙ আর মাস্তুলের সঙ্গে এমনভাবে আটকে গেল, চাইলেও এখন আর নিজেকে ছোটাতে পারবে না।

ফুসফুসের সমস্ত বাতাস নিঙড়ে বের করে নিয়ে গেছে যেন পানি। হাঁ করে দম টানতে গিয়ে নাকমুখ দিয়ে ঢুকল নোনা পানি। নিঃশেষ হয়ে আসছে শক্তি।

পুরো ব্যাপারটাই কেমন অবাস্তব লাগছে। ডেকের চল্লিশ ফুট ওপরে বসে থেকে পানিতে ডুবল কিভাবে?

কিশোর কই? আর মুসা? ডেক থেকে ধুয়ে নিয়ে গেছে ওদেরকে পানি? এই তাহলে হারিক্যান! মাস্তুলটা আবার সোজা হয়েছে বলে মনে হল। নিচে তাকাল সে। ডেকটা যেখানে থাকার কথা সেখানে শুধু পানির ঘূর্ণি।

সরে গেল পানি। লাফ দিয়ে আবার বেরিয়ে এল যেন ডেকটা। কিশোর আর মুসাকে দেখা গেল। দুই মাস্তুলের সঙ্গে যার যার শরীর বেঁধে নিয়েছে। মরে গেছে না বেঁচে আছে বোঝার জো নেই। তবে আছে জাহাজেই, সাগরে ভেসে যায়নি, এটুক নিশ্চিত হওয়া গেল। ককপিটের মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে ক্যাপ্টেন। মহাপ্লাবনের ভেতর থেকে যেন একটা সীলমাছের মত বেরিয়ে এল কুমালো। এগিয়ে গেল হালের দিকে, জখমী হালটাকে মেরামত করার জন্যে।

জামবুর ছায়াও চোখে পড়ল না।

কিন্তু জামবু আছে। মাত্র চুমুক দিয়েছে বোতলে। পানীয়টা পেটে গিয়েও সারতে পারেনি, মাথায় লাগল প্রচণ্ড বাড়ি। তুলে নিয়ে বাল্কহেডের গায়ে ছুঁড়ে মারল যেন তাকে কেউ। গায়ের ওপর এসে পড়ল, বাক্স, টিন, বস্তা আর আরও নানারকম জিনিস। একটা ময়দার বস্তা ছিঁড়ে গিয়ে ময়দায় মাখামাখি হয়ে গেল তার সমস্ত শরীর। জিনিসপত্রের স্তূপের নিচে, দেয়ালে উপুড় হয়ে পড়েছে সে, মাথা ঠেকে আছে ছাতের সঙ্গে। খানিক পরে গড়িয়ে সরে গেল জিনিসগুলো, মুহূর্ত পরেই ফিরে এল আবার দ্বিগুণ বেগে, বাড়ি মেরে, চাপ দিয়ে নীল করে দিল তাকে।

অনেক কষ্টে চার হাতপায়ে ভর দিয়ে টেনে তুলল শরীরটা। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। শক্ত হয়ে লেগে গেছে পাল্লা। খুলতে পারল না। তালা লাগেনি। তালা নেই-ই, লাগবে কি করে? কিন্তু তবু খুলতে পারল না। দরজার ওপাশে প্রচণ্ড গর্জন।

বাতাস তাহলে এল অবশেষে। এমনভাবে ঠেলে ধরে রেখেছে পাল্লা, যেন পেরেক দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে ওটাকে। কাত হয়ে আছে ঘরটা। দেয়ালে দাঁড়িয়ে দরজা খোলার আপ্রাণ চেষ্টা চালাল জামবু।

জিনিসপত্র ওড়াউড়ি থেমেছে। এখন বাইরে বেরোনো গাধামি হয়ে যাবে, ভাবল সে। এখানেই আরাম করে বসে থাকতে পারে, শুয়েও থাকতে পারে ইচ্ছে হলে। কাজ যা করার অন্যেরাই করুক না, সে কেন অযথা খাটতে যাবে? দরজাটা আটকে গেছে, বেরোতে পারেনি, এটা তার দোষ নয়। দরজা খোলার চেষ্টা বাদ দিয়ে এসে শুয়ে পড়ল দেয়ালে।

বাইরে তখন প্রচণ্ড ঝড়। মস্ত ঢেউটা সরে যাওয়ার পর, বাতাস আসার আগে, মাঝখানে একটু সময় পেয়েছে রবিন। নেমে চলে এসেছে কাকের বাসা থেকে। কাত হয়ে শুয়ে আছে যেন শুকতারা, বাতাসের দিকে পিঠ দিয়ে। কাত হয়ে আছে ডেক, টিনের ঘরে চালার মত। গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে না। যেন শক্তহাতে ধরে রাখা হয়েছে জাহাজটাকে। পানি আগের মতই মর্সণ। তবে বাতাস আসার পর থাকবে না এরকম। লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

প্রাণপণে লড়ে চলেছে দুর্বল ইঞ্জিন। ঢেউয়ের চূড়া পেরিয়ে এসে আরেক পাশের ঢালে রয়েছে এখন জাহাজ। নিচ দিয়ে ঢেউটা গড়িয়ে সরে যাওয়ার পর সোজা হল। কিন্তু হয়েও সারতে পারল না, ঝাপটা মারল বাতাস।

রবিনের মনে হল, বাতাস নয়, ইঁটের দেয়াল এসে ধাক্কা মারল তাকে। বাতাসের মুখোমুখি হয়ে আছে সে। আপনাআপনি বুজে গেছে চোখের পাতা, জোর করে বাতাস ঢুকে গেছে ফুসফুসে, ফোলাতে ফোলাতে যেন ফাটিয়ে ফেলবে। এখনই মাস্তুলের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে ফেলতে না পারলে একটা পাতার মত উড়িয়ে নিয়ে যাবে তাকে হাওয়া। শুধু হাত দিয়ে মাস্তুল আঁকড়ে ধরে রেখে বাঁচতে পারবে না।

ঝড় আরও দেখেছে সে, কিন্তু এমন অবস্থা দেখেনি। হারিক্যান নামটা কোথা থেকে এসেছে, জানে। বই পড়ে জেনেছে। নামটা এসেছে মধ্য আমেরিকার ইনডিয়ানদের বজ্র-বিদ্যুতের অপদেবতা হারাকান থেকে। এই একই ঝড়কে প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম অঞ্চলের লোকেরা বলে টাইফুন, নামটার উৎপত্তি চীনা শব্দ ট্যাইফুং, অর্থাৎ প্রচণ্ড বাতাস থেকে। আরও অনেক নাম আছে এই ঝড়ের। কেউ বলে চাব্যাসকো, কেউ সিক্লোন, কেউ হারাকান। বলে টরবেলিনো, টরমেনটা, কিংবা ট্রপিক্যাল। কিন্তু যে যে নামেই ডাকুক, একবার যে এর মধ্যে পড়েছে, জীবনে ভুলবে না আর।

মাস্তুলের একদিক থেকে ঘুরে আরেক দিকে চলে এল রবিন। শ্বাস নিতে কষ্ট হল এভাবেও।

জাহাজের সামনের পাটাতনে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল পানি। সেখান থেকে খানিকটা খাবলা মেরে তুলে পেছনে ছিটিয়ে দিল বাতাস। তালু ছড়িয়ে হাত বাড়িয়ে বাতাসের জোর পরীক্ষা করতে গিয়েছিল রবিন, প্রচণ্ড ঝটকায় হাত সরে গেল পেছনে। হাতের তালুতে পানির কণা সুচের মত এসে বিঁধে রক্তাক্ত করে ফেলল চামড়া। অবশ হয়ে গেল হাতটা, যেন ইলেকট্রিক শক খেয়েছে। আন্দাজ করল সে, ঘন্টায় দেড়শো মাইলের কম হবে না বাতাসের গতিবেগ।

বিশাল ঢেউটা যাওয়ার পর যে শান্ত হয়ে গিয়েছিল সাগর, এই বাতাসে সেটা

আর থাকতে দিল না। জ্যান্ত হয়ে উঠল যেন পানি। লাফিয়ে উঠতে লাগল বড় বড় ঢেউ। কপেক মুহূর্ত শান্ত হয়ে ছিল জাহাজটা, এখন পাগলের মত নাচতে শুরু করল ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে। ঢেউয়ের মাথায় ওঠার সময় ওঠে নাক উঁচু করে, নামার সময় নামে নিচু করে, বিপজ্জনক ভঙ্গিতে।

ভাগ্যিস সময়মত মাস্তুলের সঙ্গে শরীরটা পেঁচিয়ে বেঁধে ফেলেছিল পালের দড়ি দিয়ে! আরও দুটো মাস্তুলে বাঁধা অবস্থায় মুখ গুঁজে রয়েছে কিশোর আর মুসা। কুমালো মুক্তই রয়েছে, জাহাজের সঙ্গে তাল রেখে একবার এদিকে কাত হয়ে যাচ্ছে, একবার ওদিকে, বাতাসে ঝুলন্ত ডালে আঁকড়ে বানর যে-রকম করে ঠিক তেমনি। ককপিটের মেঝেতে শুয়ে আছে ক্যাপ্টেন, এক হাতে আঁকড়ে ধরে রেখেছে হুইলের নিচের দিকের একটা স্পোক। জামবু নেই। নিশ্চয় নিচের মালপত্র সামলাতে ব্যস্ত, ভাবল রবিন।

কিন্তু মাল নয়, নিজেকেই এখন আর সামলাতে পারছে না জামবু। ভেবেছিল আরাম করে শুয়ে থাকবে। ঝড় বাড়তেই ঝুঝল, মস্ত ভুল করে ফেলেছে। সাগর যেন বল খেলতে শুরু করল তাকে নিয়ে। দেয়াল থেকে একবার মেঝেতে ছুঁড়ে মারে, আবার মেঝে থেকে দেয়ালে। ঘরের একপাশে একটা বাংক আছে। কোনমতে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে গিয়ে উঠল ওটাতে। ধার খামচে ধরে উপুড় হল। ভাবল, যাক বাঁচা গেল। কিন্তু বাঁচতে পারল না। ওটাও ছুঁড়ে মারল তাকে। আরও দুঃখ যোগ হল তার কপালে, জীবন্ত হয়ে উঠল যেন মালপত্রগুলো। সে যেদিকে যায়, ওগুলোও ছুটে যায় সেদিকে, কে কত জোরে এসে তার গায়ে লাগতে পারে সেই প্রতিযোগিতায় মেতেছে যেন।

আতঙ্কে, ব্যথায় প্রায় মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার অবস্থা হল জামবুর। মেঝেটা আরেকবার সোজা হতেই ঝাঁপিয়ে এসে দরজায় পড়ল সে। পাল্লা খোলার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল। জোরে জোরে ধাক্কা মারতে লাগল কাঁধ দিয়ে। ব্যথাই পেল শুধু কাঁধে, পাল্লার কিছু করতে পারল না। আগের মতই অনড় রইল ওটা।

উড়ে এসে মাথায় লাগছে নানারকম বাক্স, টিন। পাগলের মত দরজায় কিল মারতে মারতে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে শুরু করল সে। ঝড়ের এই ভয়াবহ শব্দের মাঝে তার ডাক কারও কানে পৌছবে না, বুঝল। বড় একটা বাক্স তুলে গায়ের জোরে ছুঁড়ে মারল দরজায়। কিন্তু অন্যপাশে বাতাসের হাত আরও শক্ত, বিন্দুমাত্র নড়তে দিল না পাল্লাটাকে। ভাল জেলখানাতেই আটকে পড়েছে সে!

ভীষণ অনুশোচনা হল তার, কাঁদতে শুরু করল। জোরে জোরে বলতে লাগল, এখান থেকে যদি জীবন্ত বেরোতে পারে, মদ খাওয়া ছেড়ে দেবে, জীবনে আর বোতল ছুঁয়ে দেখবে না। আর কখনও কাজে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করবে না। খারাপ

কাজ করবে না। একেবারে ভাল হয়ে যাবে, দুধে ধোয়া, বিমল, পরিষ্কার।

যেন তার ডাক শুনতে পেলেন ঈশ্বর, করুণা করলেন ক্ষণিকের জন্যে। ঝটকা দিয়ে হঠাৎ খুলে গেল পাল্লা। ওটার ওপরই কাত হয়ে হেলান দিয়ে ছিল জামবু, পড়ে গেল করিডরে। জোর বাতাসে পেছনে আবার দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল পাল্লা। মালপত্রের মার খাওয়া থেকে বাঁচল অন্তত সে।

উপুড় হয়ে পড়ে থেকে খুব অল্প সময়েই প্রতিজ্ঞা ভুলে গেল জামবু। কাজ করে মরুকগে কুমালো, তার কি? সুবিধেমত একটা জায়গা বেছে নিয়ে কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে পড়ল। অনেক ধকল গেছে, জিরিয়ে নেয়া দরকার।

একটানা বাতাস বওয়া বন্ধ হল, থেকে থেকে আসছে এখন ঝাপটা। কমছে বাড়ছে, কমছে বাড়ছে, এরকম করতে করতে থেমেই গেল একেবারে। কানফাটা গর্জনের পর এই স্তব্ধ নীরবতা আরও ভয়ঙ্কর মনে হল রবিনের। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘগুলো অদৃশ্য হয়ে গিয়ে ফুটে বেরোলো নীল আকাশ।

'আল্লাহ্, বাঁচলাম!' চেঁচিয়ে বলল মুসা। 'গেছে মরার তুফান!'

রবিনের তা মনে হল না।

কলিগ বলল, 'অর্ধেকটা গেছে।'

পানির ঘূর্ণির মতই পাক খেয়ে খেয়ে চলে হারিক্যানের বাতাস। একশো থেকে দু'শো মাইল গতিতে। ঘোরার গতি প্রচণ্ড, কিন্তু সরার গতি খুব কম, বড় জোর ঘন্টায় বারো মাইল।

এই ঘূর্ণির মাঝখানে রয়েছে ঝড়ের 'চোখ', খুব শান্ত, বাতাস প্রায় থাকেই না কেন্দ্রবিন্দুতে।

'বেশি হলে আধ ঘন্টা,' ক্যাপ্টেন বলল। 'তারপরই অন্যপাশের দেখা পাব আমরা।'

যার যার বাঁধন খুলে কুমালোর কাজে সাহায্য করতে গেল তিন গোয়েন্দা। জাহাজের ভেতরে বাইরে সব তছনছ করে দিয়েছে ঝড়। আরেকটু হলেই দড়ি ছিঁড়ে সাগরে পড়ে যেত ডিঙিটা, কোনমতে আটকে আছে।

কাজ করতে করতে ঘামছে ওরা। বাতাস খুব পাতলা, গরম, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

ঝড় নেই, তবুও জাহাজটা এত দুলছে কেন প্রথমে বুঝতে পারল না কিশোর। ঝড় যখন ছিল, তখনকার চেয়ে বড় আর এলোমেলো ঢেউ এখন সাগরে। আসলে তখন বাতাসের গতি একটা বিশেষ দিকে ছিল, নিয়ন্ত্রণ ছিল পানির ওপর। এখন নেই। ফলে উত্তাল হয়ে উঠেছে পানি, যেন যা-ইচ্ছে-করার খেলায় মেতেছে। লাফিয়ে উঠছে ঢেউ, পঞ্চাশ ফুট, ষাট ফুট ওপরে গিয়ে ফাটছে, ঝরে পড়ছে

ফোয়ারার মত। যেন পানির নিচে জাহাজ বিধ্বংসী টর্পেডো ফাটানো হচ্ছে একের পর এক।

চারদিকে দাপাদাপি করছে পানি, ঢেউ আছড়ে ভাঙছে ঢেউয়ের ওপর, সৃষ্টি করছে হাজারো ফোয়ারা, অসংখ্য জলপ্রপাত।

পানির এই অস্থিরতার কারণও এখানে বাতাস নেই বলে। প্রচণ্ড গতিতে চরকির মত পাক খেয়ে বাতাস ঘুরতে ঘুরতে মাঝখানে সৃষ্টি করেছে ফাঁপা শূন্যতা। বাতাসের চক্র ভেদ করে বেরোতে পারছে না ঢেউ, ফলে সবদিক থেকে ধেয়ে আসছে কেন্দ্রের দিকে, মহা-অনর্থ বাধিয়েছে এসে এই শূন্যস্থানে।

বড় যাত্রীবাহী জাহাজ কিংবা মালবাহী স্টীমার হলে এই অত্যাচার সহ্য করতে পারত না, ঠাঁই নিত গিয়ে এতক্ষণে সাগর দেবতার ভাঁড়ারে। শুকতারা ছোট বলেই পারছে। এ-ধরনের আবহাওয়া সহ্য করার ক্ষমতা বড়গুলোর চেয়ে ছোট জলযানগুলোর বেশি।

প্রথম কারণ, স্কুনারটা কাঠের তৈরি। কাঠ পানিতে ভাসে, ইস্পাত ভাসে না। বড় যে-কোন একটা ঢেউয়ের মাথায় উঠে যেতে পারছে ছোট বলে। বড়গুলো পারে না, ওগুলোর নিচে পড়ে একাধিক ঢেউ। ঢেউয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মাথায় চড়ে বসতে পারে না, ফলে মার হজম করতে হয়। ভয়ঙ্কর চাপে বেঁকেচুরে ফেটে যায় খোল।

শাঁ করে একবার ঢেউ-পর্বতের চূড়ায় উঠে যাচ্ছে শুকতারা, তীব্র গতিতে আবার নামছে অন্ধকার উপত্যকায়। এদিকে কাত হচ্ছে, ওদিকে কাত হচ্ছে, দুলছে, গড়াচ্ছে, কিন্তু ডুবছে না, ভেসে রয়েছে কোনমতে।

শত শত পাখি এসে ঢুকেছে এই কেন্দ্রবিন্দুতে। নাগালের মধ্যে যতগুলোকে পেয়েছে, ঝেঁটিয়ে সব নিয়ে এসেছে যেন বাতাস। নুডি, বুবি, গাল, ডানা কাঁপাতে কাঁপাতে এসে বসছে ডেকে, ওপর থেকে খসে পড়ছে যেন। ডিঙির ওপরে এসে ঠাঁই নিল দুটো মস্ত ফ্রিগেট পাখি। শুধু পাখিই না, পাখাওয়ালা আরও জীব এসেছে, হাজারে হাজারে পতঙ্গ প্রজাপতি, মথ, মাছি, মৌমাছি, বোলতা, ঘাসফড়িং। ঝাঁকে ঝাঁকে এসে ছেয়ে ফেলছে মাস্তুল, পালের দড়ি। হাতে লাগছে, মুখে লাগছে, কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করছে বিচিত্র সুরে।

উত্তর-পুবমুখো এগোচ্ছে জাহাজ। হঠাৎ ওটার নাক দক্ষিণ-পশ্চিমে ঘুরিয়ে ফেলল ক্যাপ্টেন।

'এরকম করলেন কেন?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'করলাম, যাতে ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে এগোতে পারে।'

ঝড়টা এল আবার, আচমকা। আরেকটু হলেই উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল

কিশোরকে। আবার শুরু হল বাতাসের গর্জন। হাতে মুখে বিঁধছে পানির কণা। অদৃশ্য হয়ে গেছে নীল আকাশ, মাথার ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে যেন কালো ভূতুড়ে অন্ধকার।

আগের বারের চেয়ে ঢেউগুলো এখন ছোট, মাস্তুল ছাড়িয়ে যাচ্ছে না। ভয়ঙ্কর কোন উদ্দেশ্য নিয়েই বুঝি ছুটে চলেছে একদিকে ।

একটা ব্যাপার পরিষ্কার, হারিক্যানের প্রথম আঘাতের চেয়ে দ্বিতীয়টা খারাপ হবে। বাতাস এবং ঢেউ, দুটোরই জোর বেশি। উধাও হয়ে গেল পাখি আর পতঙ্গ, যেন ভেল্কিবাজি। টুকরো টুকরো হয়ে গেল মাস্তুল, পাল যে ক'টা ঝুলছিল, ছিঁড়ে ফালাফালা। বুমটা ভেঙে বিপজ্জনক ভঙ্গিতে ঝুলতে লাগল ডেকের ওপর।

ভাঙা মাস্তুলের গোড়ায় নিজেদেরকে বাঁধার সাহস আর হল না তিন গোয়েন্দার। কুমালোর পদ্ধতি অনুকরণ করে টিকে রইল কোনমতে। জামবু কোথায় ভেবে অবাক হচ্ছে।

জাহাজটাকে দু'দিক থেকে ধরে ভীষণ ভাবে ঝাঁকাচ্ছে যেন কোন দানব। মড়মড় করে শব্দ হল পেছনে, ঢিল হয়ে গেল ক্যাপ্টেনের হাতের হুইল।

'হালটা গেল!' চিৎকার করে বলল কলিগ।

বাতাসের দিকে পেছন করে আর থাকতে পারল না শুকতারা। নিজের নিয়ন্ত্রণ শেষ। বাতাস এখন যেদিকে ঘোরাচ্ছে সেদিকেই ঘুরতে বাধ্য হচ্ছে। ঢেউয়ের তা-থৈ নাচের মাঝে পড়ে বাদামের খোসার মত দুলতে লাগল, অসহায়।

প্রতিবার গড়ানোর সময় কয়েক টন করে পানি বয়ে যাচ্ছে ডেকের উপর দিয়ে, নিচে নামার পথ বেয়ে নেমে চলে যাচ্ছে খোলে।

পাম্প চালু করে দিয়েছে ক্যাপ্টেন, কিন্তু সেঁচে সারতে পারছে না। কুলিয়ে উঠতে পারছে না পাম্প, ফলে জমে যাচ্ছে পানি।

ঘুমিয়ে পড়েছিল জামবু। নাকে পানি ঢুকতে জাগল। দেখল, নোনা পানিতে ডুবে আছে সে, ফুসফুসে ঢুকতে শুরু করেছে পানি। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ছুটল। হাঁসফাঁস করছে, কাশছে। কত তাড়াতাড়ি এখন ডেকে উঠবে কেবল সেই চেষ্টা।

প্রকৃতিও যেন খেলতে আরম্ভ করেছে 'দুষ্ট জামবু'কে নিয়ে। ডেকে উঠেও সারতে পারল না সে, প্রচণ্ড এক ঢেউ এসে তাকে ভাসিয়ে নিল রেলিঙের দিকে।

'পড়ে গেল! পড়ে গেল!' চিৎকার করে উঠল ক্যাপ্টেন।

চিৎকারটা সবে বেরিয়েছে তার মুখ থেকে, এই সময় ফিরতি আরেকটা ঢেউ আবার জামবুকে এনে ডেকে আগের জায়গায় ফেলল। তার বোকা-হয়ে-যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল ছেলেরা।

'জলদি উঠে ধর কোন কিছু,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল ক্যাপ্টেন। 'নইলে আবার নিয়ে যাবে। সাগরে পড়লে আর উঠতে হবে না।'

জামবুর দিকে বেশিক্ষণ নজর দেয়ার সময় কারও নেই। খুনী বাতাস—পলিনেশিয়ানরা বলে হারিক্যানকে—শুকতারাকে খুন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে যেন।

ভীষণ ভাবে দুলে উঠল জাহাজ। গোড়া থেকে মড়মড় করে ভাঙল প্রধান মাস্তুল। দড়িদড়ায় আটকে থাকায় পানিতে পড়ল না, ওটার ভারে বাঁ পাশে কাত হয়ে গেল জাহাজ। কয়েক মুহূর্ত পরে সামনের মাস্তুলটা ভাঙল, ডিঙির ওপর পড়ে গুঁড়িয়ে দিল ডিঙিটাকে।

আনন্দ ভ্রমণ শেষ। এখন আর জাহাজ বলা যাবে না শুকতারাকে, জাহাজের ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে। যাত্রীরা প্রাণে বাঁচবে কিনা এখন তার আর বিন্দুমাত্র নিশ্চয়তা নেই।

'নোঙর ফেলো, নোঙর!' চেঁচিয়ে উঠল কলিগ।

খোলের মধ্যে পানি। প্রতিটি ঢেউ এখন গড়িয়ে যাচ্ছে জাহাজের ওপর দিয়ে। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মত যোগ হল এর সঙ্গে বৃষ্টি। এক ফোঁটা দু'ফোঁটা নয়, মুষলধারে। অবিশ্বাস্য রকমের বড় বড় ফোঁটা।

এতক্ষণে বিশ্বাস করল কিশোর, হারিক্যানের ভয়াবহতা আর বৃষ্টি সম্পর্কে যা শুনেছে, সব সত্যি। হারিক্যানের সময় ফিলিপাইনে মাত্র চারদিনে যা বৃষ্টিপাত হয়, তা ইউনাইটেড স্টেটস-এর পুরো এক বছরের বৃষ্টিপাতের সমান।

এই বৃষ্টির চেয়ে মাথার ওপর ঢেউ ভেঙে পড়া অনেক আরামের ছিল।

কোথাও গিয়ে মাথা গোঁজার সময় নেই, উপায়ও নেই। এক্ষুনি নোঙর ফেলতে না পারলে বাঁচানো যাবে না জাহাজটাকে। কিন্তু কিশোর বুঝতে পারল না এই গভীর পানিতে নোঙর ফেলবে কি করে?

বাতলে দিল ক্যাপ্টেন। কুমালোকে নিয়ে কাজে লেগে গেল ছেলেরা। ছোট মাস্তুলটাকে টেনে-হিঁচড়ে প্রধান মাস্তুলের কাছে নিয়ে গিয়ে এক করে পেঁচিয়ে বাঁধল। তারপর দুটোর মাঝামাঝি জায়গায় শক্ত দড়ি বেঁধে দড়ির আরেক মাথা বাঁধল গলুইয়ের কাছে নোঙর বাঁধার খুঁটিতে। যেসব দড়িতে মাস্তুলগুলো আটকে রয়েছে ওগুলো কেটে দিতেই পিছলে গিয়ে পানিতে পড়ল মাস্তুল দুটো। সোজা হয়ে গেল জাহাজ।

আরেকটা ব্যাপার ঘটল। ভারি মাস্তুলগুলো ডুবে ডুবে ভেসে রয়েছে পানিতে। বাতাস লাগছে না, ঘোরাতেও পারছে না ওগুলোকে, কিন্তু জাহাজটাকে ধাক্কা দিয়ে সহজেই ঘুরিয়ে ফেলছে। নোঙরের কাজ করছে এখন মাস্তুল দুটো। টান লেগে

জাহাজের মুখ ঘুরে গেল বাতাসের দিকে, ঢেউয়ের মুখোমুখি। ফলে বাতাসের চাপ যেমন কমল অনেকখানি, ঢেউয়ের আঘাতও। দু'পাশ দিয়ে কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে বাতাস আর ঢেউ দুটোই।

আরও একটি ঘন্টা ঝড়ের সঙ্গে প্রাণপণে ঝুঝলো ছোট্ট জাহাজটা। কোনমতে ভেসে রইল পানির ওপরে।

তারপর যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি গর্জন করতে করতে পেছনে সরে গেল ঝড়।

আবার দেখা দিল নীল আকাশ। বেরিয়ে এল সূর্য। বারো নট গতিতে পশ্চিমে সরে যাচ্ছে বাতাসের প্রচণ্ড ঘূর্ণি।

ঝড় সরে যাওয়ার পর আরও ফুঁসে উঠল সাগর, বাতাসের চাপ হঠাৎ কমে যাওয়ার প্রতিক্রিয়া। তারপর শান্ত হয়ে এল আস্তে আস্তে। ঢেউ আছে, তবে ছোট, ডেকের ওপরে আর উঠতে পারছে না, পানিও ঢুকছে না আর কোলে। জিততে শুরু করেছে পাম্প। আগেরমত ভেসে উঠছে জাহাজ।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল জাহাজের ছ'জন মানুষ। মনে মনে ধন্যবাদ দিল ঈশ্বরকে, যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী।

ট্যাংকগুলোর অবস্থা দেখতে গেল কিশোর। সব ক'টার ঢাকনা লাগানো রয়েছে। পানি কানায় কানায় ভরা। ফলে কোন ক্ষতি হয়নি ভেতরের অধিবাসীদের। আনন্দেই আছে, এতবড় একটা ঝড় যে গেল যেন বুঝতেই পারেনি।

'মাস্তুলগুলোর কি হবে?' ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'ফেলে দিয়ে যাব?'

'না। পোনাপেতে গিয়ে ঠিকঠাক করে আবার লাগাব।'

কাজ চালানোর মত মেরামত হল হালটা। কিন্তু পাল আর তোলা গেল না। ছোট্ট ইঞ্জিনের ক্ষমতা নিঙড়ে, ভারি দুটো মাস্তুল পেছনে টানতে টানতে, ধুঁকে ধুঁকে পোনাপের দিকে এগিয়ে চলল শুকতারা।

নয়

প্রায় অচেনা-সাগরে এসে পড়েছে এখন জাহাজ। ক্যাপ্টেন কলিগও এখানে আসেনি কখনও। কোন জাহাজ চোখে পড়ল না, জাহাজপথ এখান থেকে অনেক দূরে, উত্তরে এবং দক্ষিণে।

দুটো বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়টা এই অঞ্চল জাপানের দখলে ছিল। অন্য

কোন দেশের জাহাজকে ঢুকতে দিত না এখানে। জাপান ছাড়া বাইরের দুনিয়ার আর কারও সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না এখানকার আড়াই হাজার অধিবাসীর। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এখানে আসত অন্য দেশের অভিযাত্রীরা।

অবস্থা এখনও প্রায় সেই একই রকম রয়েছে, কর্তৃত্ব হাতবদল হয়েছে মাত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে, ইউনাইটেড নেশনসের হয়ে দ্বীপগুলো শাসন করছে এখন ইউনাইটেড স্টেটস।

আমেরিকান নৌবাহিনীর যেসব লোক কর্মরত রয়েছে এখানে, তাদের মনে হয়, পৃথিবীতে নয়, অন্য কোন গ্রহে বন্দি জীবনযাপন করছে। জীবনে কোন উত্তেজনা নেই, নতুনত্ব নেই, কাজেই ভাঙাচোরা শুকতারা আর এর অধিবাসীদের দেখে স্বাভাবিকভাবেই উত্তেজনা সৃষ্টি হল তাদের মাঝে। পোনাপেতে অতিথির আগমন!

অতিথিরাও উত্তেজিত, বিস্মিত। ভাঙা জাহাজ থেকে মাটিতে পা রাখার জন্যে যেন আর তর সইছে না। এত সুন্দর দ্বীপ আর দেখেনি ওরা।

'আরিব্বাবা, এত সুন্দর!' মুগ্ধ বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। সাদা সৈকত, নীল ল্যাগুন, আর সবুজে ছাওয়া আকাশচুম্বী পর্বত। মনে হয় ছবি। পর্বতের ঢালে সাজিয়ে রাখা হয়েছে যেন নারকেলগুচ্ছ, ডালা ছড়ানো আমগাছ, বিশাল বট আর অন্যান্য শত শত জাতের গাছপালা, ফলের ভারে নুয়ে পড়েছে, ছেয়ে আছে ফুলে ফুলে। ঠিকই নাম রেখেছিল প্রাচীন স্পেনের নাবিকেরা—বাগানদ্বীপ।

দক্ষিণ সাগরের নিচু প্রবাল অ্যাটল্‌গুলোতে বৃষ্টিপাত প্রায় হয়ই না, অথচ পোনাপের আবহাওয়া এর উল্টো। প্রচুর বৃষ্টি হয়। ঝড়বাদলকে স্বাগত জানিয়ে ডেকে আনে পর্বতের উঁচু উঁচু চূড়াগুলো। এই যে এখন, চারপাশে ঝকঝকে রোদ, এই এখনও টটলম্‌ নামের চূড়াটার ওপর জমে রয়েছে কালো মেঘ, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে থেকে থেকে।

'খাইছে!' ছিটকে বেরিয়ে আসবে যেন মুসার চোখ।

'খালি যে তাহিতি আর সামোয়ার কথা বলে লোকে,' রবিন বলল। 'এর চেয়ে ভাল?'

'ধারেকাছে আসতে পারবে না,' ক্যাপ্টেন বলল। ওই দুটো দ্বীপ দেখেছে সে।

'তাহলে এটার কথা বেশি শোনা যায় না কেন?'

'লোকে বেশি আসতে পারে না বলে।'

'আরি, একেবারে দেখি জিবরালটার!' বলে উঠল মুসা।

হ্যাঁ, একেবারে জিবরালটারের মতই। চার্ট বলছে, ওটার নাম রক অভ চোকাচ। বন্দরের ওপরে ন'শো ফুট উঁচু হয়ে আছে। ব্যাসল্টের পাহাড়, ঢাল এত

খাড়া, দুঃসাহসী পর্বতারোহীও ওঠার আগে দশবার দ্বিধা করবে।

প্রবাল প্রাচীরের একটা ফাঁকের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেল শুকতারা। দ্বীপের সৌন্দর্য যেন চুইয়ে এসে পড়েছে ল্যাগুনেও। তীরের খুব বেশি কাছে যাওয়া গেল না, বিপজ্জনক চড়ার জন্যে। দশ ফ্যাদম পানিতে নোঙর ফেলল ক্যাপ্টেন।

কিছু মাছধরা নৌকা আর নেভির বিশেষ জলযান ছাড়া কোন জাহাজ নেই বন্দরে। বিমান একটা দেখা গেল, ক্যাটালিনা বিমান, ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে যেন।

দ্বীপের একাংশে গড়ে উঠেছে শহর। সেদিক থেকে বেরিয়ে এগিয়ে এল একটা লঞ্চ। শুকতারার পাশে এসে থামল। লঞ্চ থেকে জাহাজের ডেকে নামল একজন সুদর্শন তরুণ নেভাল অফিসার। পরিচয় দিল, কমাণ্ডার ফেলিক্স ম্যাকগয়ার, পোনাপের ডেপুটি মিলিটারি গভর্নর।

'হারিক্যানের স্বাদ তাহলে ভালই পেয়েছেন,' বলল অফিসার।

'শেষ করে দিয়েছে একেবারে,' স্বীকার করল ক্যাপ্টেন। 'আপনাদের ওপর দিয়েই গেছে নাকি?'

'না, ভাগ্য ভাল, উত্তর দিয়ে সরে গেছে। কিন্তু আমাদের একটা সাপ্লাই শিপ পড়েছিল ওটার পথে।'

'তারপর?'

'ডুবে গেছে। পুরো পাঁচ হাজার টন। আপনাদের এই বাদামের খোসাটা বাঁচল কিভাবে? আশ্চর্য!'

গর্বিত ভঙ্গিতে শুকতারার ওপর চোখ বোলাল ক্যাপ্টেন। 'ছোট জাহাজ তো, তাই। তবে খুব মজবুত। এখানে মেরামত করানোর জায়গা আছে?'

'আছে। শিপইয়ার্ড।'

'নিশ্চয় কাগজপত্র দেখতে চাইবেন,' বলতে বলতে বের করল কলিগ। 'পোর্ট চার্জ কত?'

হেসে উঠল কমাণ্ডার। 'লাগবে না। লোকজন খুব একটা আসে না আমাদের এখানে, তাই পোর্ট চার্জ নিয়েও ভাবি না। ছ'মাসের মধ্যে বাইরের লোক এই আপনারাই এলেন। তা থাকবেন কদ্দিন?'

'ও বলতে পারবে,' কিশোরকে দেখিয়ে দিল কলিগ। 'কিশোর পাশা। এই অভিযানের লীডার।'

'বেশি দিন না,' কিশোর বলল। 'মিস্টার কলিগ তাঁর জাহাজ মেরামত করুন। আমরা শুধু শুধু বসে থেকে আর কি করব? একটা মোটর-বোট ভাড়া করে আশেপাশের যে কটা দ্বীপ পারি, ঘুরে দেখে আসব।'

এক মুহূর্ত নীরবতা। আরও বিস্তারিত শোনার জন্যে অপেক্ষা করছে ম্যাকগয়ার। কিন্তু প্রফেসরের মুক্তাদ্বীপের কথা সবার সামনে কমাণ্ডারকে বলার ইচ্ছে নেই কিশোরের।

'বেশ,' ম্যাকগয়ার বলল। 'বোট একটা ঠিক করে দেব। এখন নিশ্চয় তীরে যেতে চাও। উঠে পড়ো আমার লঞ্চে, কে কে যাবে।'

ক্যাপ্টেন, রবিন, মুসা আর কুমালো উঠল লঞ্চে। কিশোর উঠতে যাবে, এই সময় কলিগ বলে উঠল, 'জামবু কই?'

'দেখি, ডেকে আনি।'

ফোরক্যাসলে তাকে পেল না কিশোর। স্টোররুম খুঁজতে গেল। সেখানেও দেখল না। খসখস শব্দ কানে আসতে গিয়ে একটানে খুলল কেবিনের দরজা, যেটাতে ওরা তিনজন থাকে।

ওই তো জামবু। কিশোরের নোটবুক আর ফাইলপত্রের পাতা ওল্টাচ্ছে।

'এই, কি করছ?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না, কিছু না,' ভোঁতা গলায় জবাব দিয়ে, কিশোরকে প্রায় ঠেলে সরিয়ে কেবিন থেকে বেরোলো জামবু। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ডেকে। একটা কথা বলল না। চুপচাপ গিয়ে উঠল লঞ্চে।

চিন্তিত হয়ে পড়েছে কিশোর। নিশ্চয় মুক্তাদ্বীপের কথা জানে লোকটা, তার কাগজপত্র ঘেঁটে দেখতে চাইছিল কোন তথ্য আছে কিনা। তারমানে প্রফেসর ইস্টউডের প্রাণনাশের হুমকি যারা দিয়েছে, তাদেরই চর জামবু। শুকতারায় উঠেছে তথ্য জোগাড়ের উদ্দেশ্যে।

যা হবার হয়ে গেছে, লঞ্চে আর কিছু বলল না কিশোর। তবে মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে, মুক্তাদ্বীপে তাদের সঙ্গে আর যে-ই যাক, জামবু অন্তত যাচ্ছে না। এমনকি শুকতারা যখন আবার পাল তুলবে দেশে ফেরার জন্যে, তাতেও মাল্লা হিসেবে আর নেয়া হবে না লোকটাকে।

দ্বীপটাতে তিরিশ বছর রাজত্বের স্বাক্ষর ভালমতই রেখে গেছে জাপানীরা। পোনাপের বেশিরভাগ স্টোর আর বাড়িঘর তৈরি হয়েছে জাপানী কায়দায়, ওরাই তৈরি করে রেখে গিয়েছে। শহরের বাইরে পাতা দিয়ে কুঁড়ে তুলেছে স্থানীয় অধিবাসীরা।

একটা টিলার মাথায় চমৎকার একটা জাপানী বাংলোতে অভিযাত্রীদের নিয়ে এল কমাণ্ডার। টিলাটার একধার খাড়া নেমে গেছে সাগরে। বন্দর চোখে পড়ে ওখান থেকে, দেখা যায় বন্দরের ওপাশের বিশাল উঁচু রক অভ চোকাচ।

'এটা তোমাদের বাড়ি,' ম্যাকগয়ার বলল। 'যতদিন মন চায় থাক।'

হলুদ মাদুরে শুতে খুব আরাম। শুয়ে শুয়েই চোখে পড়ে নীল ল্যাগুনের এখানে ওখানে খুদে খুদে দ্বীপ, সাদা পালতোলা মাছ ধরা নৌকা। দেখা যায়, কয়েক হাজার ফুট উঁচু পর্বতের ওপর থেকে ঝরে পড়া রূপালি জলপ্রপাত।

'বেহেশতই এটা, কি বল, কিশোর?' মুসা বলল।

কিন্তু তার কথা কিশোরের কানে ঢুকল কিনা বোঝা গেল না। না বলে আবার কোথায় গায়েব হয়ে গেছে জামবু।

দশ

শহরে মাত্র একটা বিজনেস স্ট্রীট। কাজেই পোস্ট এক্সচেঞ্জটা খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না জামবুর।

ভেতরে ঢুকে এমন ভাব করল, যেন এখানে তার সঙ্গে কারও দেখা করার কথা। বিশালদহী এক লোক এগিয়ে এল, পিঠটা সামান্য কুঁজো। হাসল না। হাত বাড়িয়ে দিল না। রূঢ়কণ্ঠে বলল, 'এতক্ষণে এলে? জাহাজটা সেই কখন ঢুকতে দেখলাম। আধ ঘন্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি এখানে।' চোখে সন্দেহ নিয়ে আড়চোখে তাকাল একবার ক্লার্কের দিকে। 'বেরোও। এখানে কথা বলা যাবে না।'

মেইন রোড ধরে এগোল ওরা। পয়লা মোড়টাতেই ঘুরে নেমে পড়ল একটা গলিতে। এঁকেবেঁকে পাহাড়ের দিকে চলে গেছে পথটা, পাতার কুঁড়েগুলোর মাঝখান দিয়ে। প্রতিটি বাড়িতেই বাগান আছে। বাতাসে ফুলের সুবাস, জ্যাসমিন, ফ্র্যাঙ্গিপ্যানি, সিন্যামোন, আর আরও নানা জাতের ফুল। বিশাল একটা রুটিফল গাছের নিচ দিয়ে চলল দু'জনে, ফুটবলের সমান বড় বড় ফল ধরে আছে গাছটাতে। পথে ওরকম আরও ডজন খানেক গাছ পড়ল। আরও নানারকম উদ্ভিদ। একটা বোট্যানিকেল গার্ডেনে এসে হাজির হয়েছে যেন।

গাছপালার সঙ্গে পাল্লা দিয়েই যেন বাড়ে এখানকার মানুষগুলো। পুরুষেরা ছয় ফুটের বেশি লম্বা, পেশিবহুল শরীর, বাদামি চামড়া। মেয়েরাও কম লম্বা নয়। খোঁপায় সাদা ফুল গোঁজা, কিংবা মালা জড়ানো। হাসিখুশি মোটাসোটা শিশু তাদের কোলে। রাস্তার ওপর বসে আছে একটা সুন্দর বাচ্চা। বিশালদেহী লোকটার দিকে চেয়ে ফোকলা হাসি হাসল।

পা দিয়ে ঠেলে, প্রায় লাথি মেরেই বাচ্চাটাকে পাশের ঝোপে ফেলে দিল লোকটা। চিৎকার করে কেঁদে উঠল বাচ্চাটা।

অস্বস্তি বোধ করছে জামবু। লোকটা ভীষণ বদমেজাজী। ভয়ই পাচ্ছে এখন। যা বলতে এসেছে, সেটা শুনে মোটেই খুশি হবে না ও। কারণ খুশি করার মত

কোন তথ্য জানতে পারেনি সে।

ইউরোপিয়ান স্টাইলে তৈরি একটা বাড়ির বাগানে ঢুকল ওরা। লেবু, কমলা, ডালিম, ম্যাংগোস্টীন আর পিকক পাম নামে একজাতের তাল জাতীয় গাছ প্রচুর জন্মে আছে।

ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলল লোকটা। জামবুকে নিয়ে এল একটা ঘরে। ছাতা পড়া দেয়াল। তাড়াহুড়ো করে এসে ঢুকল দু'জন পোনাপিয়ান চাকর। চেয়ার সাজিয়ে দিল মেয়েটা। পুরুষটা ভাঙা ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, প্রভু কি খেতে ইচ্ছে করেন।

'বেরো এখান থেকে!' গর্জে উঠল লোকটা। 'দু'জনেই যা!' বলেই ঘাড় ধরে ধাক্কা মারল মেয়েটাকে। হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়ল সে তার সঙ্গীর পিঠে। পেছন ফিরেও তাকাল না আর ওরা। দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল লোকটা।

'নোঙরা ছুঁচোর দল!' খেপা কুকুরের মত দাঁত খিঁচাল সে। 'বাদামী চামড়ার নিকুচি করি! আমাকে দায়িত্ব দিলে কবে দ্বীপ থেকে ঝেঁটিয়ে খেদাতাম ব্যাটাদের!'

একটা চেয়ারে জামুবকে বসার ইঙ্গিত করে তার মুখোমুখি আরেক চেয়ারে বসল লোকটা। সামনে ঝুঁকল। দু'জনের চোখের দূরত্ব এখন মাত্র দুই ফুট। তার বাঁকা পিঠ দেখে মনে হয়, শিকারের ওপর ঝাঁপ দিতে তৈরি হচ্ছে সিংহ।

'অল রাইট। বলে ফেলো এবার!' খেঁকিয়ে উঠল লোকটা। 'অবস্থান জানতে পেরেছ?'

শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে যেন জামবুর। যত দেরি করে বলা যায়, ততই ভাল। 'বড় শক্ত কাজ দিয়েছেন আমাকে। কত চেষ্টা করলাম। যখনি ওরা কথা বলেছে, আড়ি পেতেছি। দ্বীপটা সম্পর্কে একটা কথা বলেনি। ওদের জিনিসপত্র...'

'অতো কথা শুনতে চাই না। দ্বীপটা কোথায় জেনেছ?'

'জেনেছি বলব না, তবে...'

কথা শেষ করতে পারল না জামবু। বিশাল মুঠোর এক ঘুসি এসে লাগল মুখে। ঝটকা দিয়ে ঘুরে গেল মাথা, চেয়ার উল্টে ধুড়ুম করে মেঝেতে পড়ল সে। কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসল, রক্তাক্ত নাক চেপে ধরেছে।

'এর জন্যে...এর জন্যে ভুগতে হবে তোমাকে ডেংগু...'

'ভয় দেখাচ্ছিস?' কাছে এসে দাঁড়াল ডেংগু। জামবুর মনে হল বিশাল এক পাহাড় এসে দাঁড়িয়েছে তার মাথার ওপর। পাহাড়টার হাত রিভলভারের বাঁটে।

'আমি...আমি কিছু ভেবে বলিনি, মিস্টার পারভি!'

খটাস করে জামবুর কানে পিস্তলের বাঁটের বাড়ি পড়ল। 'চুপ, ব্যাটা! খবরদার, আর কখনও আমার নাম মুখে আনবি না। আমি চাই না, এখানে কেউ

আমাকে চিনে ফেলুক।'

'চিনবে না? সবাই তো জানে আপনি অনেক বড় মুক্তা ব্যবসায়ী, সুলু সাগরের থারসডে আইল্যাণ্ড থেকে এসেছেন।'

'ওখানে জানে, এখানে না। মুক্তার কথা ভাবেই না কেউ এখানে।'

'বেশ, ডেংগু পারভি নন আপনি। বিষুব অঞ্চলের দক্ষিণ থেকে আসেননি, মুক্তা ব্যবসায়ী নন। তাহলে কে আপনি?'

সোজা হল লোকটা। ধূর্ত এক চিলতে হাসি ঠোঁটে ফুটেই মিলিয়ে গেল। 'আমি? কিছু যদি মনে না কর, তাহলে আমি রেভারেণ্ড হেনরি রাইডার ভিশন। আমেরিকায় গো-ইয়ে-ফোর্থ গির্জার পাদ্রী ছিলাম। এখন মিশনারি। সুদূর এই দ্বীপে উড়ে এসেছি এখানকার অসভ্য মানুষগুলোর মনে ঈশ্বরের আলো জ্বালাতে।'

গুঙিয়ে উঠল জামবু। 'আপনার যা ভাবসাব, কি করে বিশ্বাস করাবেন আপনি মিশনারি? দু'দুটো খুনের অপরাধে আপনাকে খুঁজছে পুলিশ। ধরতে পারলেই আবার নিয়ে গিয়ে জেলে ঢোকাবে।'

'ধরতে পারলে তবে তো। আর বিশ্বাস কিভাবে করাব বলছ? শুনলে অবাক হবে, দোস্ত, আমার বাবা সত্যিই পাদ্রী ছিল। সানডে ইস্কুলে পড়ালেখা করতে বাধ্য করা হয়েছে আমাকে। বাইবেল আমার মুখস্থ, গড়গড় করে বলে যেতে পারি। মাঝে মাঝে উচ্চারণে গোলমাল করে ফেলি বটে, কিন্তু এখানে কে সেটা বুঝবে? জেলখানার পাদ্রীই ধরতে পারেনি।'

'কিন্তু এই ছদ্মবেশ কেন?'

ডেংগুর হাসি দূর হয়ে গেল। 'কেন সেটা আবার জিজ্ঞেস করছ?' গর্জে উঠল সে। 'গোড়া থেকেই আমার সন্দেহ ছিল, তোমাকে দিয়ে হবে না এই কাজ। মনে মনে তৈরিই ছিলাম, কি করতে হবে।'

'ছেলেগুলোকে ফাঁকি দেবেন?'

'নিশ্চয়ই। কয়েকটা বাচ্চা ছেলে, আমার মত একজন ভদ্রলোককে পেলে খুশিই হবে। ভুলিয়ে ভালিয়ে কথা ঠিকই আদায় করে ফেলব। ইতিমধ্যেই অবশ্য অনেক কিছু জেনে গেছি। বাগ লুকিয়ে রেখেছিলাম প্রফেসরের ল্যাবরেটরিতে। প্রত্যেকটা কথা শুনেছি। প্রফেসর ব্যাটা খুব চালাক। দ্বীপটার অবস্থানের কথা মুখে কিছু বলেনি। ছেলেগুলো বেরিয়ে যাওয়ার পর ওদের পিছু নিয়ে স্যালভিজ ইয়ার্ডটাও চিনে এসেছি। তবে তাতে তেমন কোন কাজ হয়নি।' এক মুহূর্ত থামল সে। 'কাজ করতে পারার কথা ছিল তোমার। এত পথ একসঙ্গে এসেছ। কিন্তু বুদ্ধু তো, পারবে কি করে।'

রিভলভারটা আবার শোল্ডার হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল ডেংগু। জামবুকে দরজা

দেখিয়ে বলল, 'যেতে পার এবার। আমার অনেক সময় নষ্ট করেছ।'

কিন্তু জামবু নড়ল না। 'কথা ভুলে যাচ্ছেন না আপনি?'

'কথা? কিসের কথা?'

'আমার টাকা?'

কুকুরের মত ঠোঁট ভেঙচাল ডেংগু। 'আবার টাকা! কাজটা কি করেছ শুনি? কিছুই জানতে পারোনি, উল্টো ছেলেগুলোর সন্দেহ জাগিয়ে দিয়ে এসেছ। তোমার বরং এখন আমাকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার কথা। যাও ভাগো। নইলে ঘাড় মটকে দেব।'

'যাচ্ছি,' নাকী সুরে বলে দরজার দিকে এগোল জামবু। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে অনেকটা নিরাপদ বোধ করল, বলল, 'এর জন্যে ভুগতে হবে তোমাকে, ডেংগু, কপালে দুঃখ আছে। তোমার সমস্ত জারিজুরি ফাঁস না করে দিয়েছি তো আমার নাম জামবু নয়। এখুনি আমি ছেলেগুলোকে গিয়ে সব বলে দেব।'

কালো হয়ে গেল ডেংগুর মুখ। হাত চলে গেল রিভলভারের বাঁটে। কিন্তু বের করতে গিয়েও করল না। দ্রুত ভাবনা চলেছে মাথায়। জামবু ঠিকই বলেছে, তার সমস্ত জারিজুরি খতম করে দিতে পারে। ওকে থামাতে হবে। কিন্তু কিভাবে? এই দিনের বেলা খুন করা চলবে না। গুলির শব্দ অনেকের কানে যাবে এখানে গুলি করলে। টাকা দিয়ে দেবে? তাহলেও শয়তানটার মুখ বন্ধ করা যাবে কিনা সন্দেহ। আরও টাকার জন্যে চাপ দেবে, শুরু করবে ব্ল্যাকমেইল। না, অন্য কোন ভাল ব্যবস্থা করতে হবে।

চেহারাটা স্বাভাবিক রাখল ডেংগু। 'শোনো, এদিকে এস। বুঝতে পেরেছি, দুর্ব্যবহার করে ফেলেছি তোমার সঙ্গে। তোমার সাধ্যমত করেছ, ছেলেগুলো মুখ না খুললে তুমি কি করবে? এরচে বেশি অন্য কেউ হলেও করতে পারত না। ঠিক আছে, টাকা আমি তোমাকে দেব। গলাটা শুকিয়ে গেছে। চল, কোথাও বসে ভিজিয়ে নেয়া যাক।'

ডেংগুর এই হঠাৎ পবিবর্তনে সন্দেহ হল জামবুর। কিন্তু টাকা আর মদের লোভও সামলাতে পারল না। লোকটার সঙ্গে চলল সে।

আবার মেইন স্ট্রীটে ফিরে এল ওরা। টিলাটার দিকে এগোচ্ছে ডেংগু, যেটাতে ছেলেরা উঠেছে। অস্বস্তি বোধ করতে লাগল জামবু।

কিন্তু বাংলো পর্যন্ত গেল না ডেংগু। তার আগেই রাস্তা পেরিয়ে ছোট একটা লিকার শপের দিকে এগোল।

একটা গাছের নিচে জটলা করছে কয়েকজন পোনাপিয়ান জেলে, মাছ ধরে ক্লান্ত হয়ে এখন বিশ্রাম নিতে এসেছে। তাদের ঠেলে সরিয়ে দোকানের দরজার

দিকে এগোল ডেংগু। জামবুকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল। রোগাটে একজন শ্বেতাঙ্গ বসে আছে কাউন্টারের ওপাশে।

তাকে বলল ডেংগু, 'বিল, ও আমার বন্ধু,' জামবুকে দেখাল সে। 'এইমাত্র এল। গলা ভেজানো দরকার। বেশি করে দিতে হবে।'

'নিশ্চয়,' বিল বলল। 'হতচ্ছাড়া এই দেশে তো কেউ আসে না। বন্ধু এসেছে, তোমার কেমন খুশি লাগছে, বুঝতেই পারছি। দেব, যত চাও।'

'আনন্দ করতে চাই আজ,' জানালার বাইরে তাকাল ডেংগু। 'মন খুলে। আর পার্টি ছাড়া আনন্দ হয় না। লোক আর পাব কোথায়? জামবু, ওই ব্যাটাদেরই গিয়ে ডেকে আনো।'

'না না, ওদের নয়,' তাড়াতাড়ি বাধা দিল বিল। 'বাদামিদের মদ খাওয় এখানে বেআইনী।'

'আরে রাখ তোমার আইন!' পকেট থেকে একতাড়া নোট বের করে বিলের নাকের কাছে নাড়ল। 'এই যে আইন। জামবু, যাও, ডেকে আনো।'

'কানাকাগুলোকে' মদ খাওয়ানোর কোন ইচ্ছেই নেই জামবুর। কিন্তু ডেংগুর যদি পয়সা বেশি হয়ে যায় তার কি? দরজায় বেরিয়ে হাত তুলে ডাকল লোকগুলোকে। অদৃশ্য গেলাস ঠোঁটের কাছে নিয়ে মদ খাওয়ার ভঙ্গি করল। একবারই যথেষ্ট। হুল্লোড় করে ছুটে এল জেলেরা।

মদ তো নয়, পোনাপিয়ানদের জন্যে ডিনামাইট। ওসব ছাড়াই ওদের শান্ত রাখা মুশকিল, যোদ্ধার রক্ত ওদের শরীরে, পূর্বপুরুষেরা ছিল দারুণ লড়ুয়ে, কথায় কথায় লেগে যেত। মদ পেটে পড়লে যেন উন্মাদ হয়ে যায়। এই জন্যেই ওদের কাছে মদ বিক্রি নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে।

'একটা কাজ করতে পারি আমি,' বিল বলল। 'মদ তোমার কাছে বিক্রি করব। তোমার জিনিস তুমি কাকে দেবে, সেটা তোমার ব্যাপার।'

'ঠিক আছে। খুব কড়া দেখে দাও।...জামবু, এই নাও টাকা,' বিশ ডলার তার হাতে গুঁজে দিল ডেংগু। 'যত খুশি মদ কিনে খাওয়াও বন্ধুদের। টাকা লাগে আরও দেব।'

টাকাটা বিলকে দিল জামবু।

'ও-কে। এই রসিদটা সই করো,' মেমোবুকটা ঠেলে দিল বিল।

'কেন?'

'নিয়ম। এখানে মদ কিনলে সই করতে হয়। কার কাছে বিক্রি করলাম পুলিশ জানতে চাইবে।'

মদ খাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে গেছে জামবু। কিছুই না ভেবে সই করে দিল।

ফিরে চেয়ে দেখল, ডেংগু নেই, কোন্ ফাঁকে চলে গেছে।

ঘন্টা দুয়েক পর তুমুল হই-হট্টগোল কানে এল তিন গোয়েন্দার। প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখায় ব্যাঘাত ঘটল ওদের।

ক্যাপ্টেন কলিগ জাহাজে ফিরে গেছে। কুমালো রান্নাঘরে ব্যস্ত।

'কুমালো,' ডেকে বলল কিশোর। 'বাইরে গিয়ে দেখ তো কি হয়েছে।'

বেরিয়ে গেল কুমালো। খানিক পরেই হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল। 'দাঙ্গা লেগেছে···জামবুকে পুলিসে ধরেছে···'

হুড়াহুড়ি করে রাস্তায় বেরোল তিন গোয়েন্দা।

এদিক ওদিক দৌড় দিয়েছে জনাবারো পোনাপিয়ান, মাতাল বোঝাই যায়। ছুরি মারামারি করেছে দু'জনে, শরীর জখম, রক্ত ঝরছে। রাস্তার অনেক নিচে জামবুকে ধরেছে দু'জন নেভাল পুলিশ।

পথের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা এক লোক, পিঠ সামান্য কুঁজো। হাতে কাল একটা বই।

ছেলেরা এগোল। তাদেরকে দেখে এগিয়ে এল লোকটা। 'দুর্ভাগ্য,' বলল সে। 'ভারি দুর্ভাগ্য ওদের।' করুণার দৃষ্টিতে তাকাল মাতালগুলোর দিকে।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ওই জাহাজীটা মদ খাইয়েছে ওদের। বেআইনী, ভীষণ বেআইনী! ঈশ্বর তো নিষিদ্ধ করেছেনই, মানুষও করেছে এখানে। বাইরে থেকে আসে শয়তান, এখানকার নিষ্পাপ সরল লোকগুলোর সর্বনাশ করে।'

জামবুর দিকে তাকাল কিশোর। 'পুলিশে খবর দিল কে?'

'আমি দিয়েছি। এখানকার নাগরিক এবং মিশনারি হিসেবে এটাকে আমার কর্তব্য মনে করেছি।'

কিশোর লক্ষ্য করল, লোকটার হাতের ছোট বইটা বাইবেল। ভাবল, পোনাপিয়ানদের সৌভাগ্য, এরকম একজন মানুষ পেয়েছে তাদের মাঝে।

'কি শাস্তি হবে?'

'বেশি না,' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল মিশনারি। 'এই বড় জোর মাস দুই জেল। তারপর বের করে দেবে দ্বীপ থেকে। দেশে পাঠিয়ে দেবে।'

জামবুর জন্যে সুপারিশ করতে যাবে কিনা ভাবল কিশোর। শেষে ভাবল, থাক, এই ভাল হয়েছে। শয়তানির শাস্তি হয়েছে; তার পথের কাঁটাও দূর হয়েছে। জাহাজে তুললে আবার লাগত ওর বিরুদ্ধে, প্রফেসরের গোপন দ্বীপের খবর জানার চেষ্টা চালাত। আরও কি কি করত কে জানে! জেনেশুনে বিপদ সঙ্গে নেয়ার কোন

মানে হয় না। জেলে আটকে থাকলে তার আর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। সৌভাগ্যই বলতে হবে।

'জেলটা কি খুব খারাপ?'

'মোটেই না। খাবে আর ঘুমাবে, ব্যস। ওরকম একটা শয়তানের জন্যে বরং বেশি ভাল।'

হাত বাড়িয়ে দিল কিশোর। 'আমি কিশোর পাশা। ও আমার বন্ধু মুসা আমান, আর ও রবিন মিলফোর্ড। আজই এলাম, একটা জাহাজ নিয়ে। গুক···মর্নিং স্টার। হারিক্যান একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়েছে জাহাজটাকে।'

'তাই! আহ্হা!' আফসোস করল আগন্তুক। ধরল কিশোরের হাত। 'আমি হেনরি। রেভারেণ্ড হেনরি রাইডার ভিশন।' রবিন আর মুসার সঙ্গেও হাত মেলাল সে।

'পোনাপেতে কোন গির্জায় আছেন?'

'না। আমিও এসেছি এই ক'দিন আগে। এসে দেখি-গির্জা, পাদ্রী সবই আছে এখানে। ছোট এলাকা। কত আর পাদ্রী লাগে? ভাবছি, আশেপাশের অন্যান্য দ্বীপগুলোতে ঘুরব। ঈশ্বরের নাম যারা শোনেনি, সেইসব হতভাগ্যদের শোনাব তাঁর কথা। যাব কিভাবে সেটা ভাবছি এখন।'

'বোট ভাড়া করবেন?'

'না। অত টাকা নেই আমার কাছে। দেখি, ওদিকে কোন বোট যায় কিনা। যাত্রী হয়ে যাব। আশা করি আমার অনুরোধ ফেলতে পারবে না কোন ভদ্রলোকের ছেলে।'

'কোন দিকে যাওয়ার ইচ্ছে?'

'উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম, যেদিকে খুশি। দ্বীপ আর তাতে মানুষ থাকলেই হল, যারা ঈশ্বরের নাম শোনেনি।···ও, আমার কথাই তো শুধু বকবক করে যাচ্ছি। তোমাদের কথা বল। পোনাপেতেই থাকবে?'

'না,' বলল কিশোর। 'আশেপাশের দ্বীপ দেখার ইচ্ছে আমারও আছে। সুযোগ যখন পেয়েছি, ঘুরে দেখব। আবার কখন সুযোগ হয় না হয়, আদৌ হবে কিনা তাই বা কে জানে।' মিশনারিকে যাত্রী হিসেবে নেয়ার আমন্ত্রণ জানাতে গিয়েও জানাল না সে, থেমে গেল ঠিক মুহূর্তে। সাবধান করল তার খুঁতখুঁতে সতর্ক মন। অচেনা একজন লোক···ভাবল, দেখাই যাক না লোকটা নিজে থেকে কিছু বলে কিনা?

কিন্তু বলল না মিশনারি। বরং চূড়ান্ত ভদ্রতা আর সৌজন্য বোধেরই পরিচয় দিল। 'ঈশ্বর তোমাদের সহায় হোন। দোয়া করি, ভালভাবে, সুস্থ শরীরে ফিরে

আস আবার পোনাপেতে। ওহ্‌হো, আমার দেরি হয়ে গেল। অসহায় একটা লোককে বিছানায় ফেলে এসেছি। বড় গরিব বেচারা। কঠিন অসুখ হয়েছে।' একে একে তিনজনের সঙ্গে হাত মেলাল সে। ঘুরে রওনা হয়ে গেল।

নাহ্‌, লোকটা ভালই, ভাবল কিশোর। আমরা সেদিকেই যাব শুনেও কিছু বললেন না, ইনিয়ে বিনিয়েও একবার জানালেন না তিনি যেতে আগ্রহী। আর কথাবার্তায় বেশ শিক্ষিত লোক মনে হল। সত্যিকার মিশনারিদের মতই কথা বলেন, অভিনয় বলে মনে হল না। যথেষ্ট স্মার্ট। তবে মানুষটার চোখ দুটো পছন্দ হয়নি তার, মনে হয় কি যেন গোপন করতে চায় ওই চোখ! তবে সেটা তেমন অস্বাভাবিক নয়। কত লোকের সঙ্গে মিশতে হয় মিশনারিদের, কত রকম জায়গায় যেতে হয়, বুদ্ধিমান না হলে চলবে কেন? সে শুনেছে, অনেক মিশনারিই ঘর তৈরি করতে জানে, চাষ করে ফসল ফলাতে পারে, ভাল ব্যবসা-বাণিজ্য জানে, ইঞ্জিন আর চিকিৎসাবিদ্যায়ও গভীর জ্ঞান আছে। এই ভদ্রলোককে দেখে মনে হল, ওসব তো জানেনই, আরও বেশি কিছু জানেন। এমন একজন মানুষকে সঙ্গে নিতে পারলে খুশিই হত সে। দেখা যাক, সময় তো আছে। ভদ্রলোক সম্পর্কে আরও ভালমত খোঁজখবর নিতে হবে।

হাঁটতে হাঁটতে ডেংগু ভাবছে, ছেলেটা সাংঘাতিক চালাক। ওকে টোপ গেলানো কঠিন হবে। ওর মনে সামান্যতম সন্দেহ জাগালেই ভেস্তে যাবে সব। জামবু নয় ও। জামবুকে তো সহজেই জায়গা মত পাঠিয়ে দেয়া গেছে, আর কোন গোলমাল করতে পারবে না। এক সমস্যা তো গেছে, দেখা দিয়েছে আরেক সমস্যা, কিশোর ছেলেটাকে কি করে পটানো যায়?

ডেংগু ভাবছে, ওই ছেলের কাছ থেকে মুক্তাদ্বীপের অবস্থান জানতে পারবে না। পেটে বোমা মারলেও মুখ খুলবে না সে। জানতে হলে তার সঙ্গে ওই দ্বীপে যেতে হবে। তারপর কোনভাবে ছেলেগুলোকেও সরিয়ে দিতে হবে পথ থেকে। কিছু একটা ঘটাতে হবে ওদের। পুলিশ যাতে সন্দেহ করতে না পারে, ভাবে নিছক দুর্ঘটনা। তারপর মুক্তা তোলার একটা জাহাজ নিয়ে মুক্তাদ্বীপে চলে যাবে সে, তুলে আনবে সমস্ত ঝিনুক, মুক্তাগুলো বিক্রি করবে নিউ ইয়র্ক আর লণ্ডনের মুক্তা ব্যবসায়ীদের কাছে। ওই দুই শহরের অনেক জুয়েলারকে সে চেনে। দক্ষিণ সাগর থেকে মুক্তা এনে ওদের কাছেই বিক্রি করত, যখন মুক্তার ব্যবসা করত সে। অনেক আগেই প্রফেসর ইস্টউড়ের মুক্তার খামারের কথা কানে এসেছে তার, যখন সে সেলিবিসে ছিল। তখন পোনাপে যাবার পথে রসদ জোগাড়ের জন্যে ওখানে থেমেছিল প্রফেসরের জাহাজ। তাতে পারশিয়ান গালফ থেকে আনা নমুনাগুলো ছিল। সবই জানা আছে তার, শুধু একটা কথা ছাড়া. একটা তথ্য—পার্ল ল্যাগুনের

অবস্থান।

সেটাও জানতে পারবে, যদি কিশোর পাশা তাকে সঙ্গে নিতে রাজি হয়। জোর করে কিছু করা যাবে না। তাকে কি সহায়তা করবে ছেলেটা? না করার কোন কারণ নেই। শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত একজন মিশনারিকে সঙ্গে নিতে অরাজি হবে কেন?

এগারো

'একটা বোট জোগাড় করেছি তোমাদের জন্যে।'

পরদিন সকালে দেখা করতে এসে ছেলেদেরকে সুসংবাদটা জানাল কমাণ্ডার ম্যাকগয়ার। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে আরও দু'জন তরুণ অফিসারকে। পরিচয় করিয়ে দিল, লেফটেন্যান্ট ওলসেন আর লেফটেন্যান্ট ফিশার।

'বোটটা বেশি বড় না,' কমাণ্ডার বলল। 'তিরিশ ফুট।'

'যথেষ্ট বড়,' কিশোর বলল। 'চলবে। কি ইঞ্জিন?'

'ইঞ্জিন খুব ভাল। হ্যাকাটা মোটর, জাপানী। অনেক পুরানো জিনিস যদিও, তবে খুব নির্ভরশীল। জাপানীরা এনেছিল বোটটা, বোনিটো মাছ ধরার জন্যে। এখন আমেরিকান নেভির দখলে। অনেক বছর ধরে পড়ে আছে। খুব অল্প দামেই পেয়ে যাবে।'

'জায়গা-টায়গা কেমন আছে?'

'চার বাংকের কেবিন আছে একটা। গ্যালি আছে। আর আছে প্রচুর বোঁটকা গন্ধ।'

হাসল কিশোর। 'নেব ওটা।'

'ক্যাপ্টেন হয়ে কে যাচ্ছে?' কলিগকে জিজ্ঞেস করল ম্যাকগয়ার। 'আপনিই নিশ্চয়?'

'না, আমাকে এখানে থাকতে হবে। সামনে না থাকলে ঠিকমত ঠিক হবে না শুকতারা। কিশোর ভাল নাবিক হয়ে গেছে, একাই যেতে পারবে।'

নতুন দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকাল ম্যাকগয়ার। 'অভিযাত্রী...জীববিজ্ঞানী ...এখন নাবিক। এই বয়েসেই এত কিছু শিখে ফেলেছ...হবে, তোমার উন্নতি হবে জীবনে।'

লাল হয়ে গেল কিশোর। খোলাখুলি প্রশংসায় খুশিও হয়, অস্বস্তিও বোধ করে। বলল, 'আপনার যা বয়েস, স্যার, কমাণ্ডার হয়ে বসে আছেন। নিশ্চয় আমার চেয়ে কম বয়েসেই সাগরে ভেসেছিলেন?'

হাহ্ হাহ্ করে হাসল কমাণ্ডার। 'ধরেছ ঠিকই। বারো বছর বয়েসেই নৌকা নিয়ে পাড়ি দিয়েছি পাঁচশো মাইল, একা।'

'সেই তুলনায় আমি তো অনেক বড়। ক্যাপ্টেন কলিগ আমার ওস্তাদ, নেভিগেশন ভালই শিখিয়েছেন। সুযোগ যখন পাওয়া গেল, দেখি একবার বেরিয়ে, একা কতটা কি করতে পারি।'

'পারবে পারবে,' সাহস দিল কমাণ্ডার। 'কাজটা মোটেই কঠিন না। কেবল সাহস দরকার। আর মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে।' থুতনি চুলকালো সে। 'পুলিশ তোমার একটা ক্ষতিই করে দিল। একজন মাল্লা কমিয়ে দিল।'

কিশোর বুঝল, জামবুর কথা বলছে ম্যাকগয়ার। বলল, 'না, না, তাতে কিছু না। এমনিতেও ওকে আমি নিতাম না। ওকে দিয়ে কোন কাজ হয় না।'

'আমিও আর নেব না,' ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলল কলিগ। 'কেন যে ব্যাটাকে নিয়েছিলাম, সেটাই বুঝতে পারছি না এখন। জোরাল সুপারিশ নিয়ে হাজির হল। পরে বুঝলাম ব্যাটা একটা আস্ত শয়তান। কাজকর্ম কিচ্ছু করতে চায় না, মহা ফাঁকিবাজ। আর খালি থাকে গোলমাল পাকানোর তালে।'

'তাই?' ম্যাকগয়ার বলল, 'শোধরানোর ভাল জায়গায়ই গিয়েছে তাহলে। এখানে নেমেই শুরু করেছিল গোলমাল। নেটিভদের ডেকে মদ খাইয়েছে। মারামারি বাধিয়েছে। মদের ব্যাপারে এখানে খুব কড়াকড়ি আইন…মিশনারি যখন আমাদেরকে ব্যাপারটা জানালেন…'

রহস্যময় পাদ্রীর ব্যাপারে খোঁজ নেয়ার এই সুযোগ হাতছাড়া করল না কিশোর। 'মিস্টার ভিশনের কথা বলছেন? পাদ্রী বললেন, অল্পদিন হল এসেছেন পোনাপেতে। আপনারা কতখানি জানেন তাঁর সম্পর্কে?'

'খুব বেশি কিছু না। আমেরিকা থেকে প্লেনে করে এসেছে এই হপ্তাখানেক আগে। ক্যালিফোর্নিয়ার কি এক সংস্থার প্রতিনিধি। দক্ষিণ সাগরের অনেক অঞ্চলই খুব ভাল চেনেন। পোনাপের আশেপাশের দ্বীপগুলোতে যাওয়ার জন্যে একটা বোট খুঁজছেন। ভাড়া নেয়ার সামর্থ্য নেই, যাত্রী হিসেবে যেতে চান, আই মীন, ফ্রি রাইড। মানুষকে খুব ভালবাসেন। স্থানীয় অধিবাসীদের ভালর জন্যে জীবন দিতে রাজি।'

একমত হল কলিগ। 'ঠিকই বলেছেন। কাল যা করেছেন, সেটাই তো এর প্রমাণ। নইলে কোন কানাকা কোথায় মদ খেয়ে মরছে, তার বলার কি দরকার?'

'ইচ্ছে করলে পোনাপেতেই থাকতে পারতেন,' ওলসেন বলল। 'ভাল জায়গা। তবু থাকতে চাইছেন না। তিনি যেতে চান এমন সব দ্বীপে, যেখানে খুব কষ্টে আছে লোকে। তাদের ভাল করতে চান। না, এমন যাঁর মন, তিনি খারাপ হতেই

পারেন না। খুব ভাল মানুষ।'

'ওরকম লোক আমাদের এখানেও দরকার,' ফিশার বলল।

ভাবল কিশোর, যদি বানিয়েই থাকেন, শুধু তাকেই বোকা বানাননি রেভারেন্ট হেনরি রাইডার ভিশন, বানিয়েছেন আরও তিনজন বুদ্ধিমান লোককে। মিশনারি হয় অসাধারণ ধূর্ত, তাদের চারজনের চেয়ে বুদ্ধিমান, নয়ত সত্যিই তিনি পাদ্রী—অভিনয় করেননি। লোকটাকে সন্দেহ করছে বলে খারাপই লাগছে তার।

ম্যাকগয়ার বলল, 'নেটিভদের ওলসেন আর ফিশারও খুব ভালবাসে। সাধারণ লোক নয় ওরা, সরাসরি নেভিতে চলে আসেনি। ওলসেন ছিল স্কুল টিচার, ফিশার ডাক্তার। ওরা এসেছেই এখানে নেটিভদের সাহায্য করতে। যাতে শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান হয়ে গড়ে ওঠে পোনাপিয়ানদের পরের জেনারেশনটা।'

'রাক্ষসের মত গিলছে ওরা,' ওলসেন বলল। 'লেখাপড়ার কথা বলছি। শেখার জন্যে যেন হাঁ করে আছে।'

'রোগশোক কেমন এখানে?' ফিশারকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আছে মন্দ না। আগে অত ছিল না। বিদেশীরা, বিশেষ করে শ্বেতাঙ্গরা এনে ছড়িয়েছে।'

'হুঁ, বহুদেশে গিয়েই এই সর্বনাশ করেছে শ্বেতাঙ্গরা,' কিশোর বলল।

মাথা ঝাঁকাল ডাক্তার। 'হ্যাঁ, আমিও শ্বেতাঙ্গ, কিন্তু সত্যি কথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই। প্রায় দেড়শো বছর আগে এখানে যক্ষ্মার জীবাণু নিয়ে এসেছিল স্প্যানিশরা। আশি বছর আগে ইয়্যাপে কুষ্ঠ আমদানী করেছিল এক জার্মান রেডিও অপারেটর। পালাউতে আমাশার বীজ নিয়ে গিয়েছিল ইংরেজ বণিকেরা। আমেরিকানরা এনেছে হাম, বসন্ত আর আরও মারাত্মক কিছু রোগ। এসব রোগে ভোগেনি কখনও এখানকার অধিবাসীরা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নেই শরীরের। ফলে মশামাছির মত মরতে লাগল। দেখতে দেখতে ইয়্যাপের জনসংখ্যা তেরো থেকে চার হাজারে নেমে গেল। কুসাই দ্বীপে ছিল দু'জাহার লোক। এল আমেরিকান তিমি শিকারিরা, দিল রোগ ছড়িয়ে। লোকসংখ্যা দু'হাজার থেকে নামিয়ে দিল দু'শোতে। ম্যারিনা দ্বীপপুঞ্জে ছিল এক লাখ, হয়ে গেল তিন হাজার।'

'এখনও মরছে?'

'না। উপকারটা জাপানীরাই করেছে, মৃত্যু রোধ করেছে। ওদেরকে ধন্যবাদ জানাতে কার্পণ্য করব না আমি। ভাল ভাল ডাক্তার নিয়ে এসে হাসপাতাল গড়েছিল। তবে এখন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অনেক ভাল, অনেক উন্নতি করেছি আমরা। প্রতিটি দ্বীপেই এখন আস্তে আস্তে লোকসংখ্যা বাড়ছে।'

দ্বীপের মানুষগুলোর জন্যে দুঃখ হল কিশোরের। ওদের জন্যে কিছু করতে

ইচ্ছে হল। কিন্তু কি করতে পারবে সে? কি ক্ষমতা আছে? আছে, অতি সামান্য হলেও আছে, পরোক্ষভাবে। মিশনারি ভদ্রলোককে তার বোটে যাত্রী হিসেবে নিতে পারে, নামিয়ে দিতে পারে তিনি যে দ্বীপে নামতে চান। মনস্থির করে ফেলল গোয়েন্দাপ্রধান, সঙ্গে নেবে পাদ্রী সাহেবকে।

বারো

অনেক পেছনে পড়ে থাকল পোনাপে। মেঘে ঘেরা উঁচু টটলম চূড়াটাও চোখে পড়ছে না আর এখন।

যেদিকেই তাকানো যায়, আকাশ নীল। সাগর শান্ত। ভাল এগোচ্ছে মোটরবোট। আশেপাশে খেলে বেড়াচ্ছে ডলফিন। উড়ুক্কু মাছের ছড়ানো ডানায় রোদের চমক।

এই বোটটার নাম রেখেছে কিশোর 'মেঘনা'। আগে জাপানী নাম ছিল কিকু, জাপানী এই শব্দটার মানে ক্রিসেনথিমাম। কেনার পর নামটা বদলে ফেলেছে সে।

জন্মের সময় নিশ্চয় ফুলের মতই সুন্দর ছিল বোটটা, এখনও তার কিছুটা অবশিষ্ট রয়েছে। তবে নতুনের সেই সুগন্ধ আর নেই। এখন আছে বোঁটকা গন্ধ, সামুদ্রিক মাছের তীব্র আঁশটে গন্ধ যা কখনও কোন কিছুতেই দূর হবার নয়। এর ডেক আর কিনারে অসংখ্য বোনিটোর কাঁটার দাগ। আর রয়েছে তলোয়ার মাছের তলোয়ার, ব্যারাকুডার দাঁত আর হাঙরের সিরিশ কাগজের মত খসখসে চামড়ার স্বাক্ষর।

বোটের সবাই সুখী। গ্যালিতে দাঁড়িয়ে পলিনেশিয়ান গানের সুর গুন গুন করছে কুমালো। গলুইয়ের কাছে খালি হাতে উড়ুক্কু মাছ ধরার চেষ্টা করছে মুসা। রেলিঙের কাছে গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে সাগর দেখছে রবিন। হুইল ধরেছে কিশোর। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের কড়া রোদ অনেকখানি মোলায়েম হয়েছে সাগরের শীতল বাতাসের পরশে।

বোটে সব চেয়ে সুখী ব্যক্তি এখন রেবারেণ্ড হেনরি রাইডার ভিশন। কোন কারণ ছাড়াই একটু পর পর হেসে উঠছেন দরাজ গলায়।

'ভালই আছেন, স্যার, আপনি,' কিশোর বলল। 'চিন্তা নাই ভাবনা নাই...'

কি সাংঘাতিক এক রসিকতা যেন করে ফেলেছে কিশোর। হাসতে আরম্ভ করল মিশনারি। হাসতে হাসতে পানি চলে এল চোখে। 'হাসব না...হাসব না বলছ...কল্পনা করতে পার? যেখানে যেতে চাই ঠিক সেখানে নিয়ে চলেছ...' থেমে গেল সময়মত। 'তোমার জন্যেই পারলাম...'

'না না, এ-আর এমন কি?' বাধা দিয়ে বলল কিশোর।

'এমন কি মানে! তুমি বুঝতে পারছ না ইয়াং ম্যান, আমার জন্যে এটা কতখানি। কোন ধারণাই নেই তোমার, হাহ্, হাহ্। অবশেষে যাচ্ছি সেখানে, বাদামি ভেড়াদের এলাকায়…খুশি হব না? এর চেয়ে বেশি আর কি চাওয়ার আছে ঈশ্বরের কাছে?'

লোকটার কথাবার্তা অদ্ভুত লাগল কিশোরের। কোথায় যেন একটা অমিল রয়ে গেছে! পাদ্রীর হাসিটাও যেন কেমন! ভাল লাগে না।

না লাগুক। ভাবনাটা দূর করে দিতে চাইল কিশোর। সবার হাসিই যে সবার ভাল লাগতে হবে এমন কোন কথা নেই।

পাদ্রী সাহেব কি করে হাসেন, কথা বলেন, সেসব নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই তার। ওর কাজ, তাঁকে এমন কোন দ্বীপে নামিয়ে দেয়া, যেখানে তিনি দ্বীপবাসীদের সাহায্য করতে পারবেন। চার্টে দেখা যাচ্ছে ওরকম দুটো দ্বীপ, পার্ল ল্যাগুনে যাবার পথেই পড়ে।

দুপুর। চারপাশে কোথাও ডাঙার চিহ্ন চোখে পড়ছে না। পাল নেই, জাহাজ নেই, এমনকি স্টীমারের ধোঁয়াও নেই কোনখানে। যেদিকে চোখ যায় শুধু পানি আর পানি। সূর্য ঠিক মাথার ওপরে। কোন দিক থেকে এসেছে ওরা, কোন দিকে চলেছে, কিছুই বোঝার উপায় নেই এখন কম্পাস ছাড়া।

'তোমার হিসেবে ভুল না হলেই বাঁচি,' কিশোরকে বলল মুসা। 'একটু এদিক ওদিক হলেই এখন সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে।'

সেটা কিশোরও বুঝতে পারছে। সেক্সট্যান্ট আর ক্রোনোমিটার বের করল। লগবুকের রীডিং দেখল, উত্তর-পশ্চিমে চলেছে। এখন যেভাবে চলেছে, সেরকম চলতে পারলে সহজেই পার্ল ল্যাগুনে পৌছানো যাবে।

কিন্তু কিশোর জানে, ব্যাপারটা অত সোজা নয়। পথভ্রষ্ট করে দিতে পারে বাতাস। তাছাড়া উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের কাছাকাছি হচ্ছে এখন ওরা। আগে থেকে বোঝার উপায় নেই ওই স্রোতের শক্তি কতখানি। কোন দিকে যে বইছে, সেটাও সঠিক বলা যায় না। মোটামুটি জানা আছে, ঝোঁকটা পশ্চিমমুখী।

বিশাল এই জলরাশির মাঝে খুদে একটা দ্বীপ খুঁজে বের করা খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার চেয়েও কঠিন মনে হচ্ছে এখন কিশোরের কাছে। মহাসাগর আর আকাশের অসীমতার মাঝে নিজেদেরকে বড় ক্ষুদ্র আর নগণ্য লাগছে। চার্ট বলছে, পানির গভীরতা ওখানে তিন মাইল। সাগরের তলায় ওখানে রয়েছে অসংখ্য ডুবো-পাহাড় আর উপত্যকা।

লগবুক দেখে বারবার হিসেব মিলাল কিশোর। দেখল, কোথাও ভুল হল

কিনা।

রাতের বেলা সেদিন ভালই থাকল আবহাওয়া। আকাশ পরিষ্কার। তারা দেখা যায়, কাজেই যাত্রাপথ ঠিক করতে অসুবিধে হল না। কিশোর, মুসা আর কুমালো পালা করে হুইল ধরছে। রবিন বোট চালাতে জানে না, কাজেই তার হাতে হুইল ছাড়তে ভরসা পেল না কেউ। অনেকক্ষণ ডেকে বসে থেকে, গল্প করে মাঝরাতের দিকে ঘুমাতে গেল সে। মিশনারি বলল, নৌ-বিদ্যার কিছুই জানে না। বসে থেকে আর কি করবে? সারাটা রাত কেবিনের বাংকে কাটাল সে।

পরদিন সূর্য ওঠার পর কিছুটা অশান্ত হল সাগর। বোটও স্থির থাকতে পারল না স্বাভাবিকভাবেই, দুলছে, গড়াচ্ছে। নাস্তা তেরি করে আনল কুমালো। ডেকে খেতে বসল সবাই। মিস্টার ভিশন জানাল, শরীর খারাপ লাগছে তার, সী-সিকনেস। কাজেই তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে আবার গিয়ে ঢুকল কেবিনে।

কিছুক্ষণ পর লগবুকটা নিতে কেবিনে এল কিশোর। দেখে, বইটা খুলে তার ওপর ঝুঁকে রয়েছে মিশনারি। রীডিং টুকে নিচ্ছে একটা কাগজে।

এদিকে পেছন করে আছে লোকটা। পিঠটা বেঁকে রয়েছে, যেন একটা পিপা। হঠাৎ টের পেল, ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ। তাড়াতাড়ি পিঠটাকে আরও কুঁজো করে আড়াল করতে চাইল তার কাজ, কাগজের টুকরোটা রেখে দিল পকেটে।

ফিরে চেয়ে হাসল লোকটা। 'লগবুকটা দেখছিলাম। ভারি ইনটারেসটিং। না বলেই হাত দিলাম, কিছু মনে করেছ?'

'না না, মনে করার কি আছে,' বলল কিশোর। তাকিয়ে রয়েছে বাঁকা পিঠটার দিকে। কি যেন লুকিয়ে রেখেছে ওই কুঁজ! কোথায় দেখেছে ওই পিঠ?

মনে পড়ল। ঠিক এই রকম একটা পিঠ দেখেছে, প্রফেসরের বাড়ি থেকে সেদিন বেরিয়ে আসার সময়। কালো গাড়িতে চড়েছিল যে লোকটা। তারপর ট্রাকের পিছে পিছে আসতে দেখেছে, লোকটাকে স্পষ্ট দেখেনি, তবে গাড়িটা দেখেছে।

এরকম কুঁজ আরও মানুষের থাকতে পারে। শুধু এই একটা কারণ নিয়ে সন্দেহ করার কিছু নেই, করতও না কিশোর, কাকতলীয় বলেই ধরে নিত। কিন্তু চুরি করে লগবুকের রীডিং দেখা, নকল করা, কাগজের টুকরো লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা, সন্দেহ বাড়িয়ে দিল তার। প্রফেসরের ভয় ছিল তাঁর ঘরে বাগ লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তাঁদের কথা কেউ আড়িপেতে শুনে ফেলছে। আশঙ্কা অমূলক ছিল না তাঁর। সত্যি শুনেছে। সব শুনেছে, শুধু জানতে পারেনি মুক্তাদ্বীপের অবস্থান। তার পর সেই লোক, কিংবা তার কোন সহকারী মিশনারির ছদ্মবেশে উড়ে এসেছে পোনাপেতে। চালাকি করে উঠে পড়েছে বোটে, তাদের সঙ্গে চলেছে এখন। লগ

দেখে জেনে নেবে, দ্বীপটা কোথায়। তারপর যখন খুশি চলে আসতে পারবে এখানে।

ডেকে ফিরে এল কিশোর। মুসাকে সরিয়ে দিয়ে হুইল ধরল। এত সহজে মিশনারির ফাঁদে পড়ল বলে লাথি মারতে ইচ্ছে করছে নিজেকে। মিশনারি! নেটিভদের সাহায্য করতে যাচ্ছে! শয়তান কোথাকার! ভুল যা করার তো করে ফেলেছে, এখন এটাকে শোধরানোর চেষ্টা করতে হবে।

বুঝতে পারছে, পাকা অপরাধীর কবলে পড়েছে। বলা যায় না, স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে খুন করতেও হয়ত দ্বিধা করবে না লোকটা। এসেছে যখন, মুক্তাদ্বীপের অবস্থান জানার চেষ্টা করবেই, যেভাবেই হোক।

'কি হয়েছে, কিশোর?' রবিন জিজ্ঞেস করল। 'ঘামছ কেন? গরম তো তেমন নেই।'

ঠাণ্ডা রয়েছে রবিন আর মুসা, ঠাণ্ডাই থাক, ভাবল কিশোর। এখন সব বলে ওদেরকেও দুশ্চিন্তায় ফেলে লাভ নেই। এমনও হতে পারে, মিশনারি সত্যি মিশনারি। কৌতূহলের বশেই দেখেছে লগবুকটা।

যদিও সেটা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তাহলে জানাজানি হয়ে গেলে আরও খারাপ হবে। লোকটা যদি বুঝে ফেলে তাকে সন্দেহ করা হয়েছে, তাহলে আরও সতর্ক হয়ে যাবে। হয়ত নির্দিষ্ট সময়ের আগেই চূড়ান্ত কিছু করে বসবে। তাতে ক্ষতি ছাড়া ভাল হবে না। তার চেয়ে বরং ওকে ভাবতে দেয়া উচিত, তার কাজ পরিকল্পনা মাফিকই এগোচ্ছে। কুমালো, মুসা আর রবিনকে জানালে ওরা কিশোরের মত শান্ত থাকতে পারবে না। এমন কিছু করে বসবে, যাতে মিশনারি টের পেয়ে যাবে, তার ছদ্মবেশ ফাঁস হয়ে গেছে।

'আমাকেই ওর ওপর চোখ রাখতে হবে,' ভাবল কিশোর। 'কিছুতেই ভাবতে দেয়া চলবে না যে আমি ওকে সন্দেহ করেছি। আর ওকে ফাঁকি দেয়ার একটা উপায় খুঁজে বের করতে হবে।'

ঘন্টার পর ঘন্টা সমস্যাটা নিয়ে ভাবল আর ঘামল কিশোর। তারপর, পরের নতুন রীডিংটা ঠিক করার আগেই চট করে সমাধানটা এসে গেল মাথায়।

বোটের পজিশন ঠিক করল একরকম, লগে লিখল আরেক রকম। দশ মিনিট করে বাদ দিয়ে দিল।

পরের বার রীডিং ঠিক করার সময় বাদ দিল বিশ মিনিট, তার পরের বার তিরিশ মিনিট, এবং তার পরের বার চল্লিশ মিনিট। এভাবেই বাদ দিতে থাকল, যতবার পজিশন ঠিক করল নতুন করে। লগবুকে বাড়তেই থাকল ভুলের মাত্রা। কিন্তু কিশোরের জানা আছে, কতটা বাদ দিয়েছে, কাজেই সঠিক পথ নির্ণয় করতে

তার কোন অসুবিধে হল না।

কেবিনেই ফেলে রাখল লগবুক। দেখে দেখে রীডিং নকল করার প্রচুর সুযোগ এবং সময় দিল ভিশনকে।

এক মিনিট ল্যাটিচিউড সমান এক সামুদ্রিক মাইল ধরা হয়। দশ মিনিট মানে দশ মাইল। কিশোর যতটা সরিয়েছে, তাতে করে আবার এসে ওই রীডিং দিয়ে দ্বীপটা কিছুতেই খুঁজে পাবে না মিশনারি।

লোকটা যদি মুক্তাচোরই হয়ে থাকে, কোন সন্দেহ নেই, ফিরে গিয়ে মুক্তা তোলার জন্যে বড়সড় জাহাজ আর ডুবুরি নিয়ে ফিরে আসবে। তখন যেন কিছুতেই দ্বীপটা খুঁজে না পায়, সেই ব্যবস্থাই করেছে কিশোর। আসল রীডিং দিয়েই দ্বীপটা খুঁজে পাওয়া কঠিন, আর এত বড় ভুল দিয়ে তো অসম্ভব।

পরদিন দিগন্তে কয়েকটা নারকেল গাছের মাথা চোখে পড়ল। ধীরে ধীরে ফুটে উঠল একটা দ্বীপের অবয়ব। কিশোর জানে, ওটা মুক্তাদ্বীপ নয়। কাজেই শান্ত রইল সে। কিন্তু বড় বড় হয়ে উঠল নকল মিশনারির চোখ।

'এখানেই নামবে?' জিজ্ঞেস করল মিশনারি।

'না,' কিশোর বলল। 'আপনি নামবেন নিশ্চয়? অনেক নৌকা দেখছি। নিশ্চয় অনেক মানুষ আছে এখানে, ঈশ্বরের বাণী শোনাতে পারবেন।'

কিন্তু আগ্রহী হল না মিশনারি। বলল, 'না, আরও সামনে যেতে চাই। পোনাপে থেকে এ-জায়গা বেশি দূরে নয়, হয়ত ওখানকার মিশনারিরাই চলে আসে এখানে। আমি যেতে চাই এমন জায়গায়, সভ্য মানুষের নামও শোনেনি যারা।'

বিকেলে আরেকটা দ্বীপ দেখা গেল। মিশনারি যখন শুনল, কিশোররা এখানেও থামবে না, নামতে রাজি হল না সে। আরও সামনে যেতে চায়।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করল কিশোর, পোনাপে থেকে যতই দূরে সরে আসছে, চার্ট ততই গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে। অনেক কিছুই মিলছে না। কোন কোন দ্বীপের চিহ্নের পাশে লেখা রয়েছে পি. ডি. অর্থাৎ, পজিশন ডাউটফুল (অবস্থান সন্দেহজনক)। খুদে খুদে অনেক দ্বীপ দেখা গেল, যেগুলো দেখানই হয়নি চার্টে। কিংবা চার্টে আছে, এমন অনেক দ্বীপ খুঁজে পাওয়া গেল না। বোঝা গেল, অনেকটা আন্দাজের ওপরই তৈরি হয়েছে চার্টটা। যে করেছে তার কাছেও প্রশান্ত মহাসাগরের এই অচেনা অঞ্চল অচেনাই থেকে গেছে। এ-যেন এক হারানো পৃথিবী।

নানারকম সমস্যায় না ভুগলে এখানে কিছুদিনের জন্যে হারিয়ে যেতে আপত্তি ছিল না কিশোরের। তার মাথা জুড়ে রয়েছে এখন জটিল সব অঙ্ক। মিশনারির

ভয়ে কাগজ-কলমের সাহায্য নিতে পারছে না। একটু ভুলচুক হয়ে গেলে কি সর্বনাশ হয়ে যাবে আন্দাজ করতে পারছে। কঠিন হিসেব আর জ্যামিতির বোঝায় এখন ভারাক্রান্ত হয়ে আছে তার মগজ। এইভাবে মনে মনে হিসেব করে কতটা কি করতে পারবে? ভুল ইতিমধ্যেই হয়ে যায়নি তো? পারবে ঠিক জায়গায় পৌঁছাতে? তার মনে হল, পারলে, সেটা অলৌকিক ব্যাপার হয়ে যাবে।

সারাক্ষণ মনে বাজছে একশো আটান্ন ডিগ্রি বারো মিনিট পুব, এগারো ডিগ্রি চৌত্রিশ মিনিট উত্তর। তার ভয় হচ্ছে, ঘুমের ঘোরে না জোরে জোরে বলে ফেলে। মাত্র চারফুট দূরে বাংকে ঘুমায় ভিশন। তার কানে কথাগুলো চলে যাবেই। তাহলেই সব শেষ, এত কষ্টের কোন মানে থাকবে না আর।

উজ্জ্বল তারার আলোয় আরেকটা রাত বোট চালানো হল। পরদিন সকালে সূর্য উঠল। হুইল ধরে আছে মুসা। গলুইয়ের কাছ থেকে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'ডাঙাআ, ডাঙা দেখা যাচ্ছে!'

'হয়েছে,' কেবিনে থেকে ভাবল কিশোর। 'দেখে ফেলেছে!' তাড়াতাড়ি বাংক থেকে নেমে ডেকে বেরিয়ে এল সে। তার পিছে পিছেই বেরোল মিশনারি।

সামনে, সাগরের মাঝে যেন শুয়ে রয়েছে প্রবাল প্রাচীরের একটা আঙটি। একটা সবুজ ল্যাগুনকে ঘিরে রেখেছে। দুটো জায়গায় চওড়া হয়ে গিয়ে দ্বীপ সৃষ্টি করেছে প্রাচীরটা, তবে ওগুলোতে উদ্ভিদ প্রায় নেই। ছিল, এখন নেই। এরকম দৃশ্য আসার সময় আরও কয়েকটা দ্বীপে দেখে এসেছে ওরা। এর জন্যে দায়ী হারিক্যান। নষ্ট করে দিয়েছে সব। আর এই দ্বীপ দুটোকে যেন একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে। মুচড়ে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে নারকেল গাছের মাথা, গোড়া থেকে আট-দশ ফুট উঁচু কাণ্ডগুলো শুধু রেখে গেছে।

উত্তেজনায় কাঁপছে কিশোরের বুক। ঠিক জায়গাতেই এসেছে? ভুল করেনি তো? যন্ত্রপাতি নিয়ে বসল। ভালমত দেখেটেখে হিসেব বের করল। না, ঠিকই তো আছে। মগজে যা লেখা হয়ে আছে সেই একই রীডিং, একশো আটান্ন ডিগ্রি বারো মিনিট পুব, এগারো ডিগ্রি চৌত্রিশ মিনিট উত্তর।

তাহলে এটাই সেই পার্ল ল্যাগুন! মুক্তাদ্বীপ!

নব্বই মিনিট করে বাদ দিয়ে লগবুকে রীডিং লিখল সে: পার্ল ল্যাগুন পাওয়া গেল। একশো ছাপ্পান্ন ডিগ্রি বেয়াল্লিশ মিনিট পুব, দশ ডিগ্রি চার মিনিট উত্তর।

যাও ব্যাটা, এবার লিখে নাও গিয়ে কাগজে, মনে মনে হাসল কিশোর। আবার যদি আস, দেখবে দ্বীপটা নেই। কিংবা যদি কোনটা থাকেও সেটা এই দ্বীপ নয়। পশ্চিমে সরবে নব্বই মাইল, দক্ষিণেও সরবে নব্বই মাইল। তুমি তো তুমি, ব্যাটা, দুনিয়ার অভিজ্ঞতম নাবিকও এই রীডিং দিয়ে পার্ল ল্যাগুন খুঁজে বের করতে

পারবে না।

ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল কিশোর, ভিশন যে নাবিক নয় এই জন্যে। ডেকের ওপরে চলাফেরার ভঙ্গিই বুঝিয়ে দেয় লোকটা জাহাজী নয়। সাগরে বড় ঢেউ উঠলে, জাহাজ বেশি দুললে ক্ষুধা নষ্ট হয়ে যায় তার। ইঞ্জিন চালাতে আর হুইল ধরতে পারে বটে, কয়েকবার দেখলে আনাড়ি লোকও সেটা পারবে। এমন কোন কঠিন ব্যাপার নয়। সেক্সট্যান্ট বোজার চেষ্টা করেছিল একবার, উল্টো করে ধরেছিল যন্ত্রটাকে, দেখেছে কিশোর। নটিক্যাল অ্যালমানাকে হাত দেয়নি একবারও। পুরোপুরি নির্ভর করে বসে আছে কিশোরের করা হিসেবের ওপর।

'যাও, ভালমত দেখে নাও পার্ল ল্যাগুন,' মনে মনে ভিশনকে বলল কিশোর। 'জীবনে আর দেখার সুযোগ তো পাবে না।'

'ল্যাগুনটাকে চক্কর দাও,' হুইল ধরে থাকা মুসাকে বলল কিশোর। 'দেয়ালের বেশি কাছে যেয়ো না।'

মাইলখানেকের বেশি হবে অ্যাটল্‌টার বেড়। পশ্চিম দিক দিয়ে ল্যাগুনে ঢোকার বেশ সুন্দর একটা পথ আছে। পুরো এক চক্কর ঘুরে এসে ওখান দিয়ে ঢুকতে শুরু করল মুসা। বেশ কায়দা করে ঢেউয়ের মাথায় চড়ে চড়ে বোটটাকে ঢুকিয়ে ফেলল ভেতরে। ওখানটায় পানি খুব কম। ছয় থেকে বারো ফুটের মধ্যে। পরিষ্কার সবুজ পানির ভেতর দিয়ে তলা দেখা যাচ্ছে। প্রবালের স্বর্গ যেন জায়গাটা। রামধনুর সাত রঙ নিয়ে তৈরি হয়েছে নানা ধরনের নানা আকারের প্রবাল-দুর্গ।

পানির নিচে পরীর রাজ্য, প্রাচীরের ওপরে হারিক্যানের ধ্বংসলীলা, একটার সঙ্গে আরেকটার কোন মিল নেই। বড় বেশি চোখে বাজে। খুদে দ্বীপ দুটোর দিকে তাকালেই একটা ধাক্কা খেতে হয়।

'খাইছে! এখানে আটকা পড়তে চাই না আমি কিছুতেই!' গায়ে কাঁটা দিল মুসার। 'তুফানে করেছে কি দেখ! আমার তো মনে হয় ইঁদুরও বাঁচেনি। পার্ল ল্যাগুন, না? মুক্তাদ্বীপ? তার চেয়ে বল মৃত্যু দ্বীপ কিংবা ক্ষুধার দ্বীপ।'

কিশোরের নির্দেশে নোঙর ফেলল কুমালো। ভালমত দেখে জায়গা নির্বাচন করেছে গোয়েন্দাপ্রধান। উঁচু হয়ে এখানে উঠে গেছে প্রাচীরের কাঁধ, ফলে ল্যাগুনের উত্তর অংশটা চোখে পড়ে না। ভেসে ভেসে দেয়ালের কয়েক ফুটের মধ্যে চলে এল বোট, তারপর শেকলে টান লেগে আটকে গেল, আর সরতে পারবে না, ঘষাও লাগবে না ধারাল প্রবালের গায়ে।

'তীরে নামব আমরা,' ভিশনকে বলল কিশোর। 'আপনি নিশ্চয় নামবেন না। মানুষ নেই। ঈশ্বরের বাণী কাকে শোনাবেন? বোটেই থাকুন। নাকি মাছকে

শোনানোর ইচ্ছে আছে?'

কিশোরের রসিকতায় হাসল মিশনারি। বলল, 'না না, আমি থাকি। তোমর যাও। এখানে নেমে কোন লাভ নেই এখন আমার।'

তার শেষ কথাটা রহস্যময়। কিশোর বুঝলেও, অন্য তিনজন এর মানে বুঝল না।

বোট থেকে আগে নামল কুমালো। ওখানে পানি এক ফুটেরও কম। ছপাৎ ছপাৎ করে পানি ভেঙে শুকনোয় উঠল ওরা। এগিয়ে চলল উত্তরে। খুব তাড়াতাড়িই বোটটাকে ওদের দৃষ্টির আড়াল করে দিল দেয়াল।

পশ্চিমের দেয়াল ধরে ধরে চলে এল ওরা একটা চওড়া জায়গায়, যেখানে সৃষ্টি হয়েছে দুটো দ্বীপের একটা, ল্যাগুনের উত্তর-পশ্চিম কোণ এটা। তারপর বোতলের গলার মত সরু হয়ে গেছে দেয়ালটা, গিয়ে মিশেছে আরেকটা দ্বীপের সঙ্গে। ওটা উত্তর-পূর্ব কোণে।

'ওখানেই কোথাও আছে,' কিশোর বলল। 'প্রফেসর বলেছিলেন দ্বীপের উত্তর-পূর্ব কোণে।'

দ্বিতীয় দ্বীপটা চওড়ায় কয়েকশো গজ। ঝোপঝাড় ছিল একসময়, ছিঁড়ে, উপড়ে নিয়ে গেছে ঝড়। পুরো দ্বীপটাই বোধহয় পানির নিচে চলে গিয়েছিল। নারকেলের কাণ্ডগুলো দেখে মনে হয় কবরের ওপর স্মৃতিস্তম্ভ। উপড়ানো কিছু কাণ্ড পড়ে আছে এখনও, তবে বেশিরভাগই ভেসে গেছে।

হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে। দেয়ালের ওপর জমে রয়েছে প্রবালের স্তূপ, কোন কোনটা দশ ফুট উঁচু। হোঁচট খেয়ে পড়লে চিরে ফালাফালা হয়ে যাবে হাঁটু আর হাতের চামড়া, এত ধার ওসব প্রবাল।

দ্বীপের পাশে ল্যাগুনে গভীর একটা খাঁড়ি রয়েছে, তিনদিক থেকে এমনভাবে ঘেরা মনে হয় একটা খুদে উপসাগর। তলা অস্পষ্ট, কারণ পানি ওখানে দশ ফ্যাদমের বেশি। চওড়ায় প্রায় একশো গজ। দেখলেই মনে হয় কি যেন এক রহস্য লুকিয়ে রেখেছে গভীর এই খাঁড়িটা।

'ভাগ্যিস কুমালোকে সঙ্গে এনেছিলাম,' মুসা বলল। 'এত নিচে নামতে পারব না আমি। কিশোর, তুমি?'

'কি যে বল না ছাই। তুমি না পারলে আমি পারব?'

নামার জন্যে কাপড় খুলতে গেল কুমালো, তাকে থামাল কিশোর, 'রাখ, কথা আছে। এই, বস এখানে সবাই।'

মিশনারিকে সন্দেহ করছে, একথা সঙ্গীদেরকে জানাল কিশোর।

'সন্দেহ আমারও হয়েছে,' কুমালো বলল। 'অনেক মিশনারি দেখেছি আমি।

কারও স্বভাবই ওর মত ছিল না। লোকটাকে একটুও পছন্দ হয় না আমার।

'আমারও না,' রবিন বলল। 'চল, গিয়ে তাকে চ্যালেঞ্জ করি। খোলাখুলি জিজ্ঞেস করি, আসলে সে কে?'

'না, উচিত হবে না,' কিশোর বলল। 'পিস্তল-টিস্তল থাকতে পারে।'

'থাকুক। আমাদেরকে খুন করার সাহস নিশ্চয় হবে না।'

'কিছুই বলা যায় না। হয়ত অনেক টাকার মুক্তো রয়েছে এই উপ···হ্যাঁ, উপসাগরই বলি, খাঁড়ি শুনতে ভাল্লাগে না। লক্ষ, হয়ত কোটি টাকারও হতে পারে। এত টাকার জিনিস পাওয়ার জন্যে খুন করতে দ্বিধা করবে না অনেকেই। আর মনে রেখ, এটা রকি বীচ নয়, পথের মোড়ে মোড়ে পুলিশ নেই। বেআইনী কাজ চলছে কিনা দেখতে আসছে না কেউ। এখানে অন্যায় করে পার পেয়ে যাওয়া সহজ। কাজেই, লোকটাকে খেপানো উচিত হবে না।' এক এক করে সবার মুখের দিকে তাকাল কিশোর। 'যেমন ভাবে চলছি আমরা, তেমনি চলব। বুঝতে দেব না যে ওকে সন্দেহ করেছি। এমন কোন আচরণ করবে না, যাতে ব্যাপারটা তার কাছে ফাঁস হয়ে যায়। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল তিনজনেই।

'গুড। কুমালো, এবার নামতে পার। দেখা যাক, কি আছে উপসাগরের তলায়।'

(দ্বিতীয় খণ্ডে সমাপ্য)